ভারতের সাধক

(৫ম খণ্ড)

শঙ্করনাথ রায়

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন ১৩৬৬
দ্বিতীয় সংস্করণ :
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

●

প্রকাশনা :
শ্রীসুধীর মুখার্জী
রাইটার্স সিণ্ডিকেট
৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

●

মুদ্রণ :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

●

প্রচ্ছদপট :
সুপ্রকাশ সেন

●

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স
৫৪, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

●

বাঁধাই :
ন্যাশান্যাল কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট
৯৩/১এম, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

'ভারতের সাধক'-এর পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এই মহান গ্রন্থের পূর্ব্ববর্তী খণ্ডগুলি বিশিষ্ট সমালোচক ও সংবাদপত্রের অভিনন্দন লাভ করেছে। পাঠক সাধারণও জ্ঞাপন করেছেন তাঁদের আন্তরিক সমর্থন।

ইতিমধ্যেই 'ভারতের সাধক'-এর ১ম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। কিছুদিন পূর্ব্বে ২য় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত আর কোন একক বাংলা গ্রন্থ সাম্প্রতিক কালে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বলে আমরা জানিনে।

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণরস যুগিয়ে আসছেন আমাদের সাধকেরা—অধ্যাত্মজীবনের মহাশিল্পীরা। এঁদের ভেতর রয়েছেন যোগী, বৈদান্তিক, তান্ত্রিক ও মরমিয়া সাধক-গোষ্ঠী। বিচিত্র সাধনা ও বিচিত্র মতবাদের ভেতর দিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন মানবধর্ম্মের ঐক্যতান। এই সাধকদেরই পরম রম্য জীবনী রচনা করেছেন গ্রন্থকার, আর সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ভারত-সাধনার পরিচয়। বলা বাহুল্য, এই পরিচয়ের ভেতরেই নিহিত রয়েছে আমাদের আত্মপরিচয়।

মনীষা, আত্মিক বিশ্লেষণ ও সাহিত্যিক প্রতিভার দীপ্তিতে এ-গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনা হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত, লোকোত্তর মহাপুরুষেরা এসে ধরা দিয়েছেন আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে। এজন্যই 'ভারতের সাধক' হয়ে উঠেছে এমন অনন্যসাধারণ, বাংলা সাহিত্যে অধিকার করেছে এক চিরস্থায়ী আসন।

এই কল্যাণকর গ্রন্থের বর্ত্তমান খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশের সুযোগ পেয়ে প্রকাশক হিসেবে আজ আমরা গৌরব বোধ করছি।

—প্রকাশক

harater Sadhak (Vol. V)
by
Sankar Nath Roy
Rs. 6·50

জ্ঞান দেব

মহারাষ্ট্রের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহকরূপে ভক্তবীর জ্ঞানদেব আবির্ভূত হন। আত্মিক সাধনার যে পবিত্র ধারা এই মহাপুরুষের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হয়, সমাজের সর্ব্বস্তরে তাহা ছড়াইয়া পড়ে, আনিয়া দেয় অপূর্ব্ব উজ্জীবন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। মারাঠার নাথপন্থী সাধনার এক বিশিষ্ট সংবাহকরূপে যোগী গহিনীনাথের অভ্যুদয় এ সময়ে ঘটিতে দেখা যায়। আবার ইহারই পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করে পংধরপুরের ভক্তিবাদী সম্প্রদায়, বিঠ্ঠলদেবের পূজা অর্চ্চনা ও নাম কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহারা মুক্তি-পথের সন্ধান খুঁজিয়া ফিরে।

যোগপন্থা আর ভক্তিবাদ, এই দুয়েরই মিলনবাণী একদিন বাজিয়া উঠে মহাসাধক জ্ঞানদেবের কণ্ঠে। তাঁহার অলৌকিক শক্তি, প্রতিভা ও ভাবুকতার মধ্য দিয়া রূপায়িত হয় এক সমন্বয়ধর্ম্মী সাধনা। উন্মুক্ত হয় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ধারাস্রোত। তাঁহার শ্রেষ্ঠ মানস অবদানরূপে সেদিন দেখা দেয় ধর্ম্মসাহিত্যের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি—জ্ঞানেশ্বরী, অনুভবামৃত অভঙ্ রাজী।

জ্ঞানদেবের ভক্তিসাধনার ধারাটি বাহিয়াই মারাঠার জনজীবনে একের পর এক আত্মপ্রকাশ করেন নামদেব, একনাথ ও তুকারামের মত অসামান্য সাধকের দল। ভক্তিরসের অমৃত বর্ষণে শুধু মারাঠীরাই নয়, সারা দাক্ষিণাত্যবাসী তৃপ্ত হয়, ধন্য হয়।

পৈঠণার কাছে, গোদাবরীর উত্তর তীরে অবস্থিত আপেগাঁও। এই গ্রামেরই কুলকর্ণি বা 'প্রধান' হইতেছেন বিঠ্ঠলপন্ত। গৃহের অবস্থা

তাঁহার বেশ স্বচ্ছল, মানসম্ভ্রম, প্রতিপত্তিও কম নাই। কিন্তু বিঠ্ঠলপন্তের মনে কোন সুখ নাই, সংসারের নাই কোন আকর্ষণ। জমিজমা টাকা-কড়ির অভাব কিছু নাই, বয়সও যথেষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু আজ অবধি পুত্রমুখ দর্শন করা তাঁহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠিল না।

পত্নী রখুমাবাঈর মনেও এই একই দুঃখ। কত সাধুসন্তের কাছে তো এ যাবৎ শরণ নিলেন। পংধরপুরের বিঠোবাজী এক পরম জাগ্রত বিগ্রহ, তাঁহার চরণেও কম মাথা কুটিয়া আসেন নাই। কিন্তু ভগবান আশা পুরণ করিলেন কই?

বিঠ্ঠলপন্ত দিন দিন বড় উদাসীন, বড় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছেন। কোন কাজেই আজকাল তাঁহার মন লাগে না। শুধু একান্তে বসিলে পত্নীর কাছে মাঝে মাঝে মনের কথা খুলিয়া বলেন, "না গো, শুধু শুধু ভূতের বেগার খাটা আর যেন ভাল লাগছে না। এক একবার মনে হয়, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কাশীতে চলে যাই। সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়ে শেষ-পারানির কড়ি কিছু যোগাড় করি।"

রখুমাবাঈ নীরবে সব শোনেন। একথার কি উত্তরই-বা তিনি দিবেন? অজানিতে শুধু বাহির হইয়া পড়ে করুণ দীর্ঘশ্বাস, চোখদুটি হঠাৎ কখন অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

কিছুদিনের মধ্যেই বিঠ্ঠলপন্তের বৃদ্ধ পিতা দেহরক্ষা করিলেন। পুত্রের সংসার বিরাগ এবার হইতে আরো বাড়িয়া গেল।

রখুমাবাঈর পিতা সিধোপন্ত ছিলেন আড়ন্দি গ্রামের কুলকর্ণি। অনেকদিন পর কন্যার খোঁজ নিতে সেদিন আপেগাঁও-এ আসিয়াছেন। একথা সেকথার পর বৃদ্ধ শ্বশুর জামাতা বাবাজী বিঠ্ঠলপন্তকে ধরিয়া বসিলেন,—"বাবা, আমিতো দিন দিনই হয়ে পড়ছি বুড়ো, অশক্ত। আর কটা দিনই বা বাঁচবো। যা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, সেতো ভোগ করবে তোমরাই। এ দিকে তোমার বাবাও আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। আমি বলছি কি, তোমরা দুজনে আড়ন্দিতে আমার

বাড়ীতেই উঠে চলে এসো। যে কটা দিন বাঁচি, মেয়ের হাতের সেবা পেয়ে যাই। সে যে আমার একমাত্র সন্তান।”

বিঠ্‌ঠলপন্ত মনে মনে ভাবিলেন, মন্দ কি? তাঁহার নিজের আর সংসারের আকর্ষণ নাই, সন্ন্যাস নিবার ইচ্ছা দিন দিন কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে। শ্বশুরালয়ে থাকার প্রস্তাবটা একেবারে উড়াইয়া দিবার মত নয়। পত্নীকে স্থায়ীভাবে ওখানকার তত্ত্বাবধানেই রাখা যাইবে। তারপর নিজে একদিন সুযোগমত বাহির হইয়া পড়িবেন অভীষ্ট সাধনের পথে।

আপেগাঁও-এর বসবাস তুলিয়া দিয়া স্বামী-স্ত্রী একদিন আড়ন্দিতে উঠিয়া আসিলেন।

সংসারবিরাগী বিঠ্‌ঠলপন্তের পক্ষে আর বেশীদিন গৃহে থাকা সম্ভব হয় নাই। পত্নীকে কোনমতে বুঝাইয়া সুঝাইয়া, তাঁহার কাছে অনুমতি নিয়া, একদিন তিনি কাশীধামে চলিয়া গেলেন। সদ্‌গুরুর নিকট হইতে নিলেন সন্ন্যাস-দীক্ষা।

দুই-তিন বৎসর পরের কথা। আড়ন্দির সিধোপন্তের বাড়ীতে সেদিন গ্রামের লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা রামানন্দস্বামী পরিব্রাজনের পথে এ অঞ্চল দিয়া যাইতেছিলেন। কৃপা করিয়া এই গ্রামের কুলকর্ণি সিধোপন্তের অঙ্গনে তিনি পদার্পণ করিলেন।

চারিচিকে দর্শনার্থীর ভীড়। একে একে সকলেই মহাত্মাকে প্রণাম নিবেদন করিতেছে। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে রখুমাবাঈও আগাইয়া আসিলেন। হাতের ডালায় একরাশ ফুল-ফল। পরণে লালপাড় গরদের শাড়ি, সিঁথিতে জ্বল জ্বল করিতেছে সিঁদূরের দাগ। অপরূপ কল্যাণী মূর্ত্তি। ভক্তিভরে ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম জানাইলেন।

মহাত্মার নয়ন দুইটি প্রসন্নতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করিলেন—“মাঈ, তুমি পুত্রবতী হও, সৎ ও সাধুর পুত্র লাভ কর, আনন্দে থাকো।”

রখুমাবাঈ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এ আশীর্ব্বাদ আজ যেন কাঁটার মত তাঁহার বুকে বিঁধিতেছে। দুই নয়ন বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল অশ্রুর ধারা, কাঁদিতে কাঁদিতে মহাত্মার পদপ্রান্তে তিনি বসিয়া পড়িলেন। পাড়া-পড়শীরা করুণনেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। সকলেই নীরব বিস্ময়ে দণ্ডায়মান, কাহারো মুখে একটি কথা নাই।

একি অদ্ভুত আচরণ এই নারীর? যে আশীর্ব্বাদ মহাত্মা আজ তাহাকে করিয়াছেন, তাহাতে যে কেউ নিজেকে মহা ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু সে এমন কাঁদিয়া আকুল কেন?

বাড়ীর একজন আগাইয়া আসিল। কর-জোড়ে কহিল, "মহারাজ, আপনি পরম দয়াল, বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ, কিন্তু দুঃখের কথা কি বলবো, আমাদের রখুমা বড় দুর্ভাগিনী। স্বামী তার থেকেও নেই। আজ প্রায় দুবৎসর যাবৎ সে সংসার ত্যাগ করেছে। নিয়েছে সন্ন্যাস। তাই, মহারাজ, এজন্মে সন্তানলাভ আর এর ভাগ্যে নেই।"

স্বামীজী মহারাজ স্নেহভরা কণ্ঠে রখুমাবাঈকে কহিলেন, "মা, তুমি কেঁদো না, মনে সংশয় বা দুশ্চিন্তাও কিছু রেখো না। আমার মুখ দিয়ে কথা যখন বেরিয়েছে সন্তান তোমার হবেই। শুধু তাই নয়, আমি দেখতে পাচ্ছি, কয়েকটি পুত্রকন্যাই তোমার হবে। সারা মারাঠা দেশে তারা চমক লাগিয়ে দেবে। মা, আমার কথা কখনো মিথ্যে হয় না।"

এবার বাড়ীর লোকদের ডাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, তোমরা আমায় বলতো, এই মাঈর স্বামীর কি নাম? কোথায় সে গিয়েছে? কোথায়ই বা হয়েছে গুরুকরণ?"

"মহারাজ, তার নাম হচ্ছে বিঠ্‌ঠলপন্ত। শুনেছি, কাশীর কোন এক মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা নিয়েছে।"

"আরে, রসো। এযে দেখছি আমারই শিষ্য। আমিই তাকে দিয়েছি সন্ন্যাস। তারপর পাঠিয়েছি পরিব্রাজনে।"

রখুমাবাঈর শিরে কল্যাণহস্তটি রাখিয়া মহাত্মা কহিলেন, "মাঈ, আনন্দে থাকো। কোন ভয় নেই। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার স্বামী

কাশীতে ফিরে এলেই আমি তাকে দেশে পাঠিয়ে দেবো। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আরো কিছুদিন তাকে সংসারধর্ম্ম করতে হবে।"

সদলবলে পরদিন রামানন্দ স্বামীজী আড়ন্দি ত্যাগ করিলেন।

কয়েক মাস গত হইয়াছে। বিঠ্‌ঠলপন্ত একদিন কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া গুরুজীর পাদবন্দনা করিলেন। নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিলেন আড়ন্দির ঘটনার কথা, গুরুজীর প্রতিশ্রুতি দানের কথা।

মহা পরীক্ষা আজ তাঁহার সম্মুখে। কাতর স্বরে কহিলেন, "বাবা, তা কি করে সম্ভব হবে? আবার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলে, পুত্র-কন্যা নিয়ে ঘর করলে আমি যে ধর্ম্মে পতিত হবো।"

"বেটা, তুমি কি বুঝতে পারছো না, এ সবই প্রভুজীর ইচ্ছা? আমার মুখ দিয়ে তাঁরই ইচ্ছা সেদিন প্রকটিত হয়েছে। আসলে আমি ছিলাম নিমিত্ত-মাত্র। কেন তুমি এতো ভাবছো? ঐশী প্রয়োজনে মানুষের গড়া আইন-কানুন কত সময় বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়। জান তো, ব্যাসদেবকেও পুত্রোৎপাদন করতে হয়েছিল। তুমি ব্যাস নও, সাধারণ জীব। তাই তোমায় পুত্রোৎপাদনের সঙ্গে আরো কিছুকাল গৃহস্থীও করতে হবে। তুমি ঘরে ফিরে যাও। এর দায়িত্ব আমার।"

সজল নয়নে গুরুর কাছে বিদায় নিয়া বিঠ্‌ঠলপন্ত দেশে ফিরিয়া আসিলেন। শ্বশুরালয় হইতে পত্নীকে নিয়া আসিয়া আবার ঘর বাঁধিলেন আপেগাঁও-এ, তাঁহার পৈতৃক ভিটায়।

নূতন করিয়া গড়া এই গার্হস্থ্য জীবনে পর পর তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মলাভ করে।

ধর্ম্মপ্রাণ বিঠ্‌ঠলপন্তের সব কয়টি পুত্রকন্যার জীবনই হইয়া উঠে আধ্যাত্মিক রসে রসায়িত। আর ইঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানদেবের মধ্যেই ঘটে আধ্যাত্মিকতার অসামান্য প্রকাশ। ভক্তিরসের এক অপূর্ব্ব প্লাবন তিনি বহাইয়া দিয়া যান।

১২৭১ খৃষ্টাব্দের এক শুভলগ্নে পিতার দ্বিতীয় পুত্ররূপে জ্ঞানদেব ভূমিষ্ঠ হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তিনাথ অপেক্ষা তিনি প্রায় তিন বৎসরের ছোট। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোপান ও ভগিনী মুক্তাবাঈ-এর জন্ম হয় প্রায় এই রকম সময়েরই ব্যবধানে।

বালককাল হইতেই জ্ঞানদেবের মধ্যে দেখা যায় বিস্ময়কর মেধা ও প্রতিভার বিকাশ। একবার যাহা কিছু শোনেন বা দেখেন, আর কখনো তাহা বিস্মৃত হইবার উপায় নাই। বিঠ্ঠলপন্ত নিজে ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, তাই জ্ঞানদেবের এই অসাধারণ ধীশক্তি দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না। শুধু প্রতিভাধর দ্বিতীয় পুত্রেরই নয়, সব কয়টি সন্তানেরই শিক্ষার সুবন্দোবস্ত তিনি করিয়া দিলেন।

ঘরে সাধুসন্ত ও পণ্ডিতজনের আনাগোনা প্রায়ই লাগিয়া আছে। নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানদেব উভয়েই তাঁহাদের সেবাযত্ন করেন, উন্মুখ হইয়া শোনেন তাঁহাদের মুখের নানা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ।

শ্রুতিধর জ্ঞানদেবকে নিয়া সকলের কৌতূহলের অন্ত নাই। প্রশ্ন করিলেই দেখা যায়, বালক অবলীলায় সদ্যশ্রুত বেদপুরাণের শ্লোকরাশি হুবহু আবৃত্তি করিতেছে। সাধু ও পণ্ডিতদের ব্যাখা বিশ্লেষণের একটি কথাও সে বিস্মৃত হয় নাই। শুধু এই অসামান্য মেধা ও প্রতিভাই নয়, জন্মজন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়াও সে জন্মিয়াছে।

পুত্রেরা বড় হইয়া উঠিতেছে। এবার তাহাদের উপনয়নের ব্যবস্থা করা দরকার। বিঠ্ঠলপন্ত মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু শুভ কাজে এক বাধা পড়িয়া গেল। গ্রামের একদল গোঁড়া পণ্ডিত বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছেন, জ্ঞানদেব ও তাঁহার ভ্রাতাদের উপনয়নে তাঁহারা যোগ দিবেন না। বিঠ্ঠলপন্ত তাঁহাদের চোখে ধর্ম্মচ্যুত। কারণ, সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আবার গার্হস্থ্য জীবনে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন। তাই এ কাজে তাঁহারা যোগ দিতে পারেন না।

স্পষ্টই বুঝা গেল, আড়ন্দি গ্রামে বসিয়া উপনয়ন দেওয়া চলিবে না।

অগত্যা জ্ঞানদেবের পিতা সপরিবারে নাসিক-এ চলিয়া গেলেন। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সেখানে নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

নিকটেই পুণ্যতীর্থ ত্র্যম্বকেশ্বর ও ব্রহ্মগিরি পাহাড়। বিঠ্ঠলপন্ত সঙ্কল্প করিলেন—যে কয়দিন এ অঞ্চলে থাকিবেন, ভক্তিভরে ব্রহ্মগিরির পরিক্রমণ হইবে তাঁহার নিত্যকার কর্ম্ম।

সেদিন গিরি-প্রদক্ষিণ করিতেছেন। সঙ্গে রহিয়াছে পুত্রকন্যা। নানা কারণে পথে বড় দেরী হইয়া গিয়াছে।

এদিকে রাত্রিও প্রায় সমাগত। অরণ্যের বৃক্ষশিরে, ঝোপে-ঝাড়ে অন্ধকার ক্রমেই জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে।

বিঠ্ঠলপন্ত শুনিয়াছেন, এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে মাঝে মাঝে নাকি বাঘের উপদ্রব ঘটে। পথঘাট একেবারে নির্জ্জন, জনমানবের চিহ্নও কোথাও এ সময়ে নাই। অজানা আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া পুত্রকন্যাদের কহিলেন, "শুনছো! জায়গাটা কিন্তু তেমন সুবিধের নয়। তোমরা জোরে পা চালিয়ে এসো।"

সবাই দ্রুতপদে আগাইয়া চলিয়াছেন। সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড বাঁক। জ্ঞানদেব হঠাৎ পিতার হাতটি চাপিয়া ধরেন। সভয়ে মৃদুকণ্ঠে কহেন, "বাবা, ঐ শোন। ওকি বাঘের ডাক বলে মনে হচ্ছে না?"

পিতা উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন। সত্যিই তো। এ যে স্পষ্টই বাঘের গোঙ্রানি। কিন্তু কোন দিক হইতে শব্দটা আসিতেছে তাহা তো ঠিক ধরা যাইতেছে না।

সবাইকে সাহস দিয়া বিঠ্ঠলপন্ত কহিলেন, "ভয় পেয়ো না। ভগবানের নাম নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলো।"

পাহাড়ের মোড়টা ঘুরিতেই এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তুমুল গর্জ্জনে বনভূমি কম্পিত করিয়া দেখা দিল এক প্রকাণ্ড বাঘ। অনতিদূরে নির্জ্জন পথে আগাইয়া চলিয়াছে একটা মহিষ, সবেমাত্র সে দলছাড়া হইয়াছে। হিংস্র বাঘ তখনি উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পুত্রকন্যাদের নিয়া বিঠ্ঠলপন্ত প্রাণভয়ে ঢুকিয়া পড়িলেন পাশের

এক নিবিড় অরণ্যে। তারপর ঘুরপথ দিয়া নিজদের গন্তব্য স্থলের দিকে ধাবিত হইলেন।

জঙ্গলময় পার্ব্বত্য পথের মধ্য দিয়া সকলে অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছেন। অনতিদূরে দেখা যাইতেছে লোকালয়ের আলো। যাক তবে তাঁহাদের বাসস্থান আর বেশী দূরে নয়।

হঠাৎ জ্ঞানদেবের হুঁস হইল। তাইতো, তাঁহার দাদা কোথায় গেল? দৌড়ঝাঁপের পথে নিবৃত্তিনাথকে অনেকক্ষণ দেখিতে পান নাই। তখনি ব্যাকুল হইয়া পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

বিঠ্ঠলপন্ত আর এক মহা দুর্ভাবনায় পড়িলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র তবে কোন দিকে গেল? বাঘের মুখে সে পড়ে নাই, তাঁহাদের সঙ্গেই তো অনেকটা বনপথ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছে। তবে কি আগে দৌড়াইয়া গিয়া ইতিমধ্যে গৃহে পৌছিল?

দ্রুতপদে সকলে গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিবৃত্তিনাথ কই? সে তো প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই!

সেখানে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, খোঁজাখুজিও অনেক হইল। কিন্তু নিবৃত্তিনাথকে আর পাওয়া গেল না।

জ্যেষ্ঠের বিহনে জ্ঞানদেব যেন মৃতকল্প হইয়া আছেন। নিবৃত্তিনাথ তাঁহার বড় প্রিয়, একদণ্ডও তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। শুধু প্রিয়ই নয়, দাদাকে তিনি শ্রদ্ধাও করেন যথেষ্ট। বয়সে মাত্র তিন বৎসরের বড় হইলে কি হয়—ধীর গম্ভীর, পরম ধার্ম্মিক নিবৃত্তিনাথের পরামর্শ না নিয়া জ্ঞানদেব কোন কাজই করিতে পারেন না। আজ তাঁহাকে হারাইয়া শূন্য হৃদয় কেবলই খাঁ-খাঁ করিতেছে।

প্রায় সপ্তাহখানেক পর হঠাৎ একদিন নিবৃত্তিনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগ্নীদের আনন্দের অবধি রহিল না। কলরব তুলিয়া সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

এবার দাদাকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া শুরু হইল জ্ঞানদেবের প্রশ্ন

বর্ষণ—"কখন তুমি আমাদের সঙ্গ থেকে ছিট্‌কে পড়লে? কোথায় পেলে আশ্রয়? এ কয়দিন কি করে কাটিয়েছো? সব কথা আমাদের এবার খুলে বলো।"

নিবৃত্তিনাথ শান্তস্বরে বলিয়া চলিলেন, "সেদিন ছুটতে ছুটতে তোমাদের সঙ্গ হারিয়ে ফেললাম। চারদিকে একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। সাহসে ভর করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ দূরে দেখতে পেলাম প্রদীপের আলো। এগিয়ে গিয়ে দেখি, পাহাড়ের এক দুর্গম স্থানে, গুহার ভেতর আসন করে বসে আছেন এক বৃদ্ধ যোগী। ইঙ্গিতে আমায় বিশ্রাম করতে বললেন। তারপরে স্নেহভরে সামনে রাখলেন কিছু ফলমূল। শ্রান্তদেহে সেদিন আর কোন কথা হয়নি, একটু পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন প্রত্যুষে প্রকাশিত হলো যোগীবরের এক করুণাঘন মূর্ত্তি। গুহার এক কোণে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন। দিলেন যোগ সাধনার দীক্ষা।"

ঔৎসুক্যভরে জ্ঞানদেব প্রশ্ন করেন, "সে কি! বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ তোমায় তিনি দীক্ষা দিয়ে বসলেন? তারপর, তারপর আর কি ঘটলো, বলো।"

"সব কথা বলতে পারছিনে, বারণ আছে। তবে এটুকু তোমাদের বলতে পারি যে, সেই দীক্ষাবীজ পাবার পরক্ষণ থেকেই আমার ভেতরকার সব কিছু যেন ওলট-পালোট হয়ে গেছে। জেগে উঠেছে এক নতুন জীবনের জোয়ার। তারপর মহাত্মা কৃপা করে বহু নিগূঢ় সাধনক্রিয়া আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন। নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সে সব আমার ভেতর আজ ঘটে যাচ্ছে।"

"কিন্তু দাদা, তোমার এই গুরুজীর নাম কি, তা তো বললে না।"

"যোগী গহিনীনাথ।"

পিতা বিঠ্‌ঠলপন্ত বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। এবার ধীরে স্বরে কহিলেন, "বাবা, তুমি মহা ভাগ্যবান, তুমি ধন্য। আর ধন্য তোমার কুল। গহিনীনাথজী এক মহাশক্তিধর যোগী। তাঁর দুর্ল্ভ-

কৃপা তুমি পেয়েছো। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এই গুরুকৃপার উপযুক্ত হও।”

“বাবা, শুনে সুখী হবে, গুরু মহারাজ জ্ঞানদেবের ওপরও কৃপাদৃষ্টি রেখেছেন। বলেছেন,—তাকে দিয়ে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে, তার দিকে দৃষ্টি রেখো, তার দীক্ষার ভার রইলো তোমার ওপর, উপযুক্ত সময় এলে নিজেই তুমি পাবে নির্দ্দেশ।”

পিতা বিঠ্‌ঠলপন্তের চোখে মুখে তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে তৃপ্তি ও গৌরবের হাসি। অধ্যাত্মজীবনের যে পরম সার্থকতা খুঁজিতে গিয়া নিজে সেদিন ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন, ঐশী কৃপা আজ তাহাই পৌঁছাইয়া দিতেছে তাঁহার দ্বারে, তাঁহারই আত্মজনের জীবনে। মনে পড়িল তাঁহার গুরুজী রামানন্দ স্বামীর পূর্ব্বেকার সেই উক্তি, সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী—তাঁহার পুত্রকন্যার অধ্যাত্মজীবনের আলো সারা মহারাষ্ট্রে একদিন চমক লাগাইয়া দিবে। কৃপালু গুরুজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাভরে তিনি মস্তক অবনত করিলেন।”

জ্ঞানদেবের পিতা অতঃপর আর বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই। শান্ত চিত্তে শ্রীভগবানের নাম করিতে করিতে এক পুণ্য লগ্নে তিনি লোকান্তরে চলিয়া গেলেন।

পিতার তিরোধানের কিছুদিন পরে, এক শুভ লগ্ন দেখিয়া নিবৃত্তিনাথ জ্ঞানদেবকে দীক্ষা দান করেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের নিগূঢ় সাধনার বীজ যোগী গহিনীনাথের অধ্যাত্মজীবনে একদিন রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। নিবৃত্তিনাথের মাধ্যমে তাহাই আজ রোপিত হইল জ্ঞানদেবের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে এই কিশোর সাধকের জীবনে উদ্‌গত হইতে লাগিল পূর্ব্বজন্মের সাত্বিক সংস্কাররাশি। সাধনা ও সিদ্ধির স্তরগুলি দিনের পর দিন অবলীলায় তিনি অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন।

সাধক নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানদেবকে এবার কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়। গ্রামের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা আগে হইতেই ক্রুদ্ধ হইয়া আছেন। এবার তাঁহারা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া বসেন, শুরু হয় নানা সামাজিক

নির্য্যাতন। বিঠ্‌ঠলপন্তের পুত্রদের তাঁহারা সহজে ছাড়িবেন না।

মাতা রখুমাবাঈর অন্তরে একটুও শান্তি নাই। দুষ্টদের এইসব সামাজিক উৎপীড়ন আর কত কাল সহ্য করিতে হইবে কে জানে? সব চাইতে বড় প্রশ্ন, কন্যা মুক্তাবাঈর বিবাহ। সমাজে একঘরে হইয়া থাকিলে যে তাহার বিবাহ দেওয়াই আর ঘটিয়া উঠিবে না।

মায়ের দীর্ঘশ্বাস ও চোখের জল আর সহ্য করা যায় না। জ্ঞানদেব সেদিন আশ্বাস দিলেন, "মা, তুমি এমন করে ভেঙে পড়ো না। গাঁয়ের দুষ্টদের যাতে দমন হয়, সে ব্যবস্থাই এবার করছি।"

"সে কি বাবা, ওদের ঘাঁটিয়ে আবার কোন নতুন বিপদ তোরা ডেকে আনতে যাচ্ছিস?"

"তুমি ভেবো না। দাদা আর আমি দুজনায় মিলে এবার পৈঠণায় যাচ্ছি। সেখানে রয়েছেন হেমাড়পন্ত আর বোপদেবের মত দিক্‌পাল পণ্ডিত। আমরা তাঁদের বোঝাতে পারবো, বাবা তাঁর গুরুর আদেশ পালন করে এমন কিছু নীচ কাজ করেন নি যেজন্য সমাজ আমাদের নির্য্যাতন করবে। বড় পণ্ডিতদের পাঁতি আমরা নিয়ে আসছি।"

দুই ভ্রাতা পৈঠণায় গিয়া প্রধান পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হইলেন। অপূর্ব্ব প্রতিভাধর এই দুই তরুণ। যেমন গভীর ইঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান, তেমনি আবার সাধনার দিক দিয়াও অধিষ্ঠিত রহিয়াছে অতি উচ্চ স্তরে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা প্রার্থিত পাঁতি দিয়া দিলেন। অতঃপর আড়ন্দি গ্রামের ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানদেবের পরিবারকে আর ঘাঁটাইতে সাহস করেন নাই।

জননী রখুমাবাঈ আর বেশী দিন ইহলোকে অবস্থান করেন নাই। পুত্র-কন্যাদের শিরে একদিন কল্যাণহস্তটি বুলাইয়া সাধ্বী নারী তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সে-বার পৈঠণা হইতে জ্ঞানদেব সবাইকে নিয়া গ্রামে ফিরিতেছেন। পথে নেভাসে নামক স্থানে তাঁহারা বিশ্রাম করার জন্য থামিলেন। স্থির

করিলেন, আজ রাত্রিটা এখানেই কোথাও কাটানো যাক। তারপর কাল ভোর বেলায় আবার যাত্রা শুরু করা যাইবে।

পথের পাশেই দণ্ডায়মান এক ক্ষুদ্র মঠ। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিয়া জ্ঞানদেব সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই মঠের মোহান্ত হইতেছেন প্রবীণ পণ্ডিত ও সাধক সচ্চিদানন্দ-বাবা। এক দুঃসাধ্য প্রাণান্তকর রোগে তিনি তখন ভুগিতেছেন। ভক্ত ও সেবকেরা নানা চিকিৎসাই করাইয়াছেন কিন্তু কোন কিছুতেই ফল হয় নাই। রোগী এ সময়ে এক সঙ্কটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কক্ষের একপ্রান্তে মুমূর্ষু বৃদ্ধ সাধক শায়িত। অক্ষিতারকা দুটি স্থির, কণ্ঠ দিয়া কোন স্বর নির্গত হইতেছেন না। অসহায়ভাবে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া সেবকেরা অন্তিম মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া হঠাৎ জ্ঞানদেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া তিনি রোগীর শিয়রে দাঁড়াইলেন।

কিছুক্ষণ তাঁহার মস্তকটি স্পর্শ করিয়া থাকার পর জ্ঞানদেব অস্ফুট স্বরে শুরু করিলেন মন্ত্রপাঠ। রোগীর সঙ্কট সে রাত্রিতে কাটিয়া গেল। পরদিন সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন সচ্চিদানন্দ-বাবা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন, রোগের কোন চিহ্নই তাঁহার দেহে আর নাই।

নিবৃত্তিনাথ বুঝিলেন, এবার হইতে তাঁহাকে সতর্ক হইতে হইবে। যোগসাধনার ফলে শিষ্য জ্ঞানদেবের জীবনে ধীরে ধীরে ঘটিতেছে শক্তির বিকাশ। কিন্তু এ শক্তি তো এভাবে ক্ষয় করার জন্য নয়!

নিরালায় তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার ভেতর শক্তির স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভাই, যোগী গহিনীনাথের সাধনার ঐশ্বর্য্যকে কি এমনি ভাবেই তুমি অপচয় করতে থাকবে?"

জ্ঞানদেব সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আর্ত্তের সেবায়, মানবের কল্যাণে তা হলে কি এগিয়ে আসা যাবে না?"

"দু-দশটা রোগীর রোগ সারিয়ে, প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে মানুষের কল্যাণ

করবে তুমি ? একি ভ্রান্ত বুদ্ধি। লোকমঙ্গলের জন্য চাই ঈশ্বরের আদেশ, চাই আদিষ্ট পন্থা। তোমার জন্য আগে থেকেই তা দেওয়া রয়েছে। আর. শোন। যে শক্তি তোমার মধ্যে আজ অমিতবেগে স্ফুরিত হয়ে উঠছে, তাকে নিয়োজিত কর ব্যাপকতর ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে। তোমার স্পর্শে, তোমার বাণীতে জেগে উঠুক হাজার হাজার মুক্তিকামী সাধক, লাভ করুক অমৃতের আস্বাদ। তাছাড়া, আমার ইচ্ছে, একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব তুমি গ্রহণ কর, ভক্তিরসে রসায়িত করে রচনা কর ভগবদ্‌গীতার এক প্রাণবন্ত ভাষ্য। মহারাষ্ট্রের জীবনের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে দাও সর্ব্বজনের প্রাণমনগলানো এই অধ্যাত্মসাহিত্য। জ্ঞানদেব! ঈশ্বরদত্ত মহাপ্রতিভা তোমাতে রয়েছে, তার উপর পেয়েছ সদ্‌গুরু-পরম্পরার সাধনার বীজ। আশীর্ব্বাদ করি, একাজে তুমি সফল হবে, অগণিত লোক তোমা দ্বারা উপকৃত হবে।”

গুরু নিবৃত্তিনাথের এ আদেশ জ্ঞানদেব তখনি শিরোধার্য্য করিলেন। ঘোষণা করিলেন তাঁহার নূতন দায়িত্বভারের কথা।

নেভাসে-গ্রামে থাকা কালেই জ্ঞানদেবের মধ্যে দেখা দিল রচনা শক্তির এক অলৌকিক প্রকাশ। অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন কেবলি ঠেলিয়া দিতেছে রাশি রাশি অধ্যাত্মসাহিত্যের উপকরণ। অপূর্ব্ব ভাষ্য, উপমা, তাত্ত্বিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ধারা বন্যার মত হু-হু করিয়া এবার ছুটিয়া আসিতেছে।

নূতন পরিকল্পনা ও কর্ম্মপ্রয়াসের কথা সচ্চিদানন্দ-বাবার কানেও পৌঁছিয়াছে। জ্ঞানদেবের কাছে তিনি নিবেদন করিলেন, “বাবা, নিজগুণে তুমি আমার জীবনরক্ষা করেছ। এর প্রতিদানে দেবার আমার কিছুই নেই। তবে আমার একান্ত ইচ্ছে, ‘জ্ঞানেশ্বরী’ রচনার পবিত্র কাজে আমার এ ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে কিছু সেবা করতে দাও। তুমি এই মহাভাষ্য মুখে বলে যাবে, আর আমি করবো তার শ্রুতিলিখন।”

সোৎসাহে জ্ঞানদেব এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

নেভাসেতে থাকিয়াই ১২৯০ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদেব তাঁহার এই মহাগ্রন্থ সমাপ্ত করেন। মনীষী সাধনপরায়ণ রচয়িতার বয়স তখন মাত্র উনিশ বৎসর। এই গৌরবময় রচনার মধ্য দিয়া সারা মারাঠায় তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠেন।

ইহার পর গুরু নিবৃত্তিনাথের আদেশে জ্ঞানদেব সমাপ্ত করেন তাঁহার অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'অমৃতানুভব', পর পর রচনা করেন বহুতর ভক্তিরস-সমৃদ্ধ অভঙ্ পদ।

'জ্ঞানেশ্বরী' তাঁহার এমন এক মহান রচনা যাহা, শুধু ভারতেরই নয়, বিশ্বের অধ্যাত্মসাহিত্যেও চিরঞ্জীব হইয়া থাকিবে। ভগবদ্‌গীতার তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া এই ভাষ্যগ্রন্থ রচিত, তাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই ইহার প্রধান উপজীব্য। বিরল দার্শনিকতা, নিপুণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, মনোরম উপমা এবং ভাব ও ভাষার অতুলনীয় বৈচিত্র্যে 'জ্ঞানেশ্বরী' সমৃদ্ধ। অদ্বৈত-জ্ঞানের সহিত ভক্তিবাদের অপরূপ সমন্বয় ইহাতে সাধিত হইয়াছে।

'অমৃতানুভব' জ্ঞানদেবের এক মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ। শিবসূত্রের প্রতিপাদিত দার্শনিকতাই হইতেছে ইহার ভিত্তি। জ্ঞানদেবের উপর নাথযোগীদের সাধনা কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা তাঁহার এই রচনা হইতে অনুমান করা যায়।

অভঙ্ বা ভক্তিরসাশ্রিত মনোরম পদাবলীর মধ্য দিয়াই উত্তরকালে ফুটিয়া উঠে তাঁহার সাধনা এবং ভক্তিবাদের পরিণত ও রসময় রূপ। জ্ঞানদেবের জীবন, সাধনতত্ত্ব ও অধ্যাত্মসাহিত্যের গবেষকগণ এই অভঙ্-এর মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিসত্তা ও অন্তর্জ্জীবনের সত্যকার রূপ দেখিতে পাইয়াছেন।

শ্রী আর. ডি. রাণাডে লিখিতেছেন, "এই অভঙ্-পদে জ্ঞানদেবের হৃদয়-বাণী স্ফুরিত হইতে দেখা যায়। তাঁহার ভক্তিরসাশ্রিত আবেগধর্ম্মিতা ইহাতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, আর 'জ্ঞানেশ্বরী' ধরিয়াছে তাঁহার মননধর্ম্মী জীবনের রূপ। তাই দেখি, 'জ্ঞানেশ্বরী অপেক্ষা অভঙ্

পদগুলির মাধ্যমেই জ্ঞানদেবের হৃদয় অধিকতররূপে উদঘাটিত হয়, তাঁহার অন্তরের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং বহির্জ্জগৎ সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়াও ইহাতে অনেক বেশী প্রতিফলিত হইয়া উঠে।"

সদা প্রশান্ত অন্তর্ম্মুখী নিবৃত্তিনাথ এবার ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইতে থাকেন যোগসাধনার গভীরতর স্তরে। সাধারণ মানুষের সহিত চলাফেরা করা ও যোগাযোগ রাখা অতঃপর আর বেশী দিন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

অপর দিকে শিষ্য জ্ঞানদেবের উপর পতিত হয় জীবহিতৈষণার গুরু দায়িত্বভার। তাই এবার হইতে জনজীবনের পুরোভাগে আসিয়া তিনি দাঁড়ান—জীবন সাধনা, সিদ্ধি ও অধ্যাত্মরচনার মধ্য দিয়া ঈশ্বরমুখীন মানুষের সম্মুখে আনিয়া দেন নিগূঢ় সাধনার সঙ্কেত, তুলিয়া ধরেন আলোকবর্ত্তিকা। তাঁহার অভঙ্ পদাবলী ও কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া জনগণের হৃদয়ে ভক্তিরসের প্রবাহ ছড়াইয়া পড়ে।

জ্ঞানদেবের সাধনা ও অধ্যাত্ম-সাহিত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্য, তাঁহার সমকালীন পরিবেশ ও ধর্ম্ম আন্দোলনের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

প্রাচীন তামিল আড়্বারদের ভক্তি-সাধনার ঢেউ বারবার মারাঠা-দেশের বুকে আসিয়া লাগিয়াছে। তারপর উত্তরভারতের নাথযোগীদের সাধনার প্রভাবও এখানে কম বিস্তারিত হয় নাই।

একাদশ শতকের মধ্যভাগে এই অঞ্চলে আবির্ভূত হন মারাঠী সাধক ও অধ্যাত্মসাহিত্যের নিপুণ ভাষ্যকার মুকুন্দরাজ। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'পরমামৃত' ও 'বিবেকসিন্ধু' সেদিনকার সমাজের সম্মুখে অধ্যাত্ম-জীবনের নূতন আদর্শ তুলিয়া ধরে। পরবর্ত্তী যুগে মারাঠী ভাষার মহানুভব গ্রন্থগুলিও আত্মিক জীবন সম্পর্কে প্রবল ঔৎসুক্য জাগ্রত করিয়াছে। এই ঐতিহ্যের ধারা বহিয়াই ত্রয়োদশ শতকে মহাভক্ত জ্ঞানদেবের আবির্ভাব ঘটে।

জ্ঞানদেবের সময় তাঁহার জন্মভূমি ছিল স্বাধীন। রাজা রামদেব রাও তখন প্রবল প্রতাপে মহারাষ্ট্রের দেবগিরিতে রাজত্ব করিতেছেন। আলাউদ্দীন খিলিজির দেবগিরি আক্রমণের আগে পর্য্যন্ত তাঁহার এই প্রতাপ কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সৎ ও ধর্ম্মপ্রাণ নরপতি বলিয়া রামদেব রাও-এর খ্যাতি ছিল, পংধরপুরের বিখ্যাত ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হইত। দেশেও সর্ব্বত্র তখন সুখ সমৃদ্ধি বিরাজিত, রাজ্যশাসনের উদার নীতিও ছিল ধর্ম্মজীবনের অনুকূল। রাষ্ট্র ও সমাজের এই পরিবেশে জ্ঞানদেব আত্মপ্রকাশ করেন।

জ্ঞানদেবের সাধনজীবনে শক্তি, ভক্তি ও জ্ঞান এই ত্রিধারার মিলন দেখা গিয়াছিল। এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে গিয়া 'মিষ্টিসিজম্-ইন মহারাষ্ট্র' গ্রন্থে শ্রীরাণাডে লিখিয়াছেন,—

"মহারাষ্ট্রের ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃত প্রবর্ত্তকরূপে জ্ঞানদেব আবির্ভূত হন। অনুমিত হয় যে, তাঁহার পিতার গুরু ছিলেন বারাণসীর শ্রীপাদ রামানন্দ ; হয়তো তিনিই হইবেন আসল বৈষ্ণবগুরু রামানন্দ। যদি তাহাই হয়, তবে দেখা যায় যে রামানন্দের উৎস হইতে শুধু কবীর ও তুলসীদাসের আধ্যাত্মিক ধারাই উৎসারিত হয় নাই, মারাঠী ভক্তি-সাধকদের উদ্ভবও সেখান হইতে ঘটিয়াছে। আর যাহাই হোক, ইহা নিশ্চিত যে, নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানদেব মহাযোগী গহিনীনাথের সাধন-ধারা হইতেই আসিয়াছেন! তাঁহাদের নিজেদের রচনা হইতেই এ তথ্য প্রমাণিত হয়।

"একথা বোধহয় নূতন করিয়া না বলিলেও চলে যে, নিবৃত্তিনাথ যোগী গহিনীনাথের নিকট হইতে সাধনপ্রাপ্ত হন, আর গহিনীনাথ তাঁহার অধ্যাত্মসম্পদ লাভ করেন গোরক্ষনাথ হইতে—আর এই গোরক্ষনাথজীর গুরু ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। এই সাধকেরা সবাই ছিলেন নাথযোগী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কখন এবং কিভাবে মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথ আবির্ভূত হইয়াছেন, কি ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন আজ আর

তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করার উপায় নাই। কিন্তু একথা স্পষ্টরূপেই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের নাম অনৈতিহাসিক নয়। অবশ্য মৎস্যেন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কথা জানিতে হইলে পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্য না নিয়া উপায় নাই। কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস রহিয়াছে। আর ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, জ্ঞানেশ্বর সেই নাথ-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত যাঁহারা তামিল দেশের আড়্বার এবং লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের সিদ্ধদের মত মহারাষ্ট্রে ভক্তি আন্দোলনের এক নূতনতর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, আর তাঁহাদের আরব্ধ এই মহান্ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে জ্ঞানদেবেরই মাধ্যমে। এই কারণেই পরবর্ত্তীকালের মারাঠী ভক্তি-সাধকদের অনেকে বলিয়াছেন—ভক্তি-ধর্ম্মের যে ভিত্তি জ্ঞানদেব রচনা করেন, তাহার উপর দেউল নির্ম্মাণ করেন নামদেব ও অন্যান্য ভক্ত সাধকেরা, আর উত্তরকালে স্বনামধন্য তুকারাম আবির্ভূত হন এই দেব-দেউলের নয়নমনোহর চূড়ারূপে।"

নিজের সমস্ত কিছু সাধনা ও সিদ্ধির গৌরব সাধক জ্ঞানদেব অর্পণ করিয়াছেন তাঁহার গুরুদেবের চরণতলে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিবৃত্তিনাথকে তিনি বরণ করিয়াছেন গুরুরূপে, আর এই গুরুই হইয়াছেন তাঁহার কাণ্ডারী, পৌঁছাইয়া দিয়াছেন তাঁহাকে তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সাধন-সাগরের পরপারে। জ্ঞানদেবের বহু রচনায় এই গুরুপ্রশস্তি উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি বলিতেছেন, "আমার প্রভু, নিবৃত্তিনাথ এমনিতেই পরম কৃপালু, তদুপরি নিজের অধ্যাত্মজীবনের আলোক-দিশারীদের কাছ থেকে তিনি নিয়েছেন জ্ঞানালোক বিতরণের দায়িত্ব, তাই তো এগিয়ে এসেছিলেন তিনি বর্ষার জলভরা মেঘের মত, ত্রিতাপ তাপিত মানবের হৃদয়জ্বালা নিবারণের জন্য ঢেলেছিলেন শীতল বারি। জ্ঞানেশ্বর তৃষিত চাতকের মত সেই কৃপাঘন রস-বর্ষণের কয়েক ফোঁটা করেছিল পান; তারই নিদর্শন রয়েছে আমার রচিত এই ভাষ্যগ্রন্থে।"—জ্ঞানেশ্বরী ১৮(১৭৫১)

জ্ঞানদেবের সাধনার ইতিহাস, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার নানা তথ্য, তাঁহার মনোরম অভঙ্ এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহে ছড়ানো রহিয়াছে।

প্রাণপ্রিয় ঈশ্বরের বিরহে সাধক সেদিন কাতর। তাই তাঁহার বিরহ অঙ্গের এক অভঙ্-এ বলিতেছেন, "মেঘে মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে, অবিরত শুনছি তাদের গর্জ্জন আর হাওয়ার শন্‌শন্ শব্দ। চাঁদ আর চম্পক হারিয়েছে তাদের স্নিগ্ধতার আমেজ, কারণ, আমার প্রভুকে আমি যে আর খুঁজে পাচ্চিনে! চন্দনের প্রলেপ আজ শুধু আমার দেহে এনে দেয় দহন-জ্বালা। লোকে বলে—ফুলের শয্যা বড় স্নিগ্ধ কোমল, কিন্তু আমার কাছে তা হয়ে উঠেছে জলন্ত কয়লার মতন। ভুবনভোলানো গানের জন্য চিরকালই রয়েছে কোকিলের খ্যাতি, কিন্তু জ্ঞানদেব বলছে,—তার বেলায় এই মধুর গান বাড়িয়ে তুলছে কেবল বিরহের বেদনা। দর্পণের দিকে নিজের মুখ দেখতে চাই, কিন্তু সে মুখের দিকে আজ আর আমি তাকাতেও পারিনে। এমনি দুর্দ্দশায় প্রভু আমায় ঠেলে ফেলেছেন।" —অভঙ্ ৩৪০।

প্রিয়-বিরহের এই জ্বালা অচিরে নিভিয়া গিয়াছিল। জ্ঞানদেবের একনিষ্ঠ সাধনার সহিত যুক্ত হইয়াছিল শক্তিধর যোগীগুরু নিবৃত্তিনাথের কৃপা। এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়াছেন,—

"আমি ছিলাম অন্ধ, ছিলাম খঞ্জ। চারদিক থেকে আমায় ঘিরে ধরেছিল বিভ্রান্তি। আমার হাত-পা কর্ম্মে হয়েছিল একেবারে অশক্ত। এমন সময়ে ভাগ্যবলে পেলাম প্রভু নিবৃত্তিনাথকে। তরু-ছায়া তলে আমায় বসিয়ে অধ্যাত্ম-জ্ঞানের আলো তিনি ঢেলে দিলেন আমার এই আধারে, দূর হলো আমার অজ্ঞানের পুঞ্জীভূত অন্ধকার। জয় হোক মহাযোগী নিবৃত্তিনাথের অধ্যাত্মজ্ঞানের। জয় হোক্ শ্রীভগবানের নামের। কর্ম্ম আমার আজ হয়েছে ক্ষয়, নিরসন হয়েছে আমার সর্ব্ব সংশয়ের—অভীষ্ট হয়েছে পূর্ণ।

"এখন থেকে আর আমায় চলতে হবে না পঞ্চেন্দ্রিয়ের পথরেখা ধরে। আমি কেবল গেয়ে চলবো জীবন-প্রভুর গান। আমার সর্ব্ব অভিলাষের হয়েছে অবসান। কারণ, আমি যে বাস করছি কল্প-বৃক্ষেরই মূলে। আমার সকল চিন্তা গিয়েছে দূরে, কারণ, আমি যে পান করেছি

অমৃতধারা। ঐশী আনন্দে মন আমার হয়েছে নিমজ্জিত—সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব পাপ হয়েছে নিশ্চিহ্ন।

"…আত্মজ্ঞান হয়েছে আজ উদ্ভাসিত। বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে আমার প্রাণে। ভাণ্ডের বহিরাবরণ আজ ভেঙেছে—সর্ব্ব বন্ধন গিয়েছে ছুটে। গুরুর প্রসাদে অহং ভাবনা আমার আর নেই। বুদ্ধি আর বোধ হয়ে গিয়েছে একাকার!…নয়নের ভেতর গজিয়েছে নয়ন, এই জীবদেহ হয়ে উঠেছে স্বর্গীয়। আজ যেদিকে তাকাই, সে দিকেই অধ্যাত্মজীবনের পরম প্রশান্তি। সর্ব্ব বস্তু আমার দৃষ্টিতে হয়ে উঠেছে ব্রহ্মময়। আমার গুরু নিবৃত্তিনাথের কৃপায় মোচন হয়েছে নয়নের অন্ধত্ব, করেছেন তিনি দৃষ্টিদান। ভাগবত-অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছেন আমার নয়নে, জ্ঞানগঙ্গার ধারায় দিয়েছেন ডুবিয়ে।" —অভঙ্, ৪৩।

উপলব্ধির এক চরম স্তরে পৌঁছিয়া সাধকপ্রবর জ্ঞানদেব বলিতেছেন, "ঈশ্বর দর্শনের জন্য এগিয়ে গিয়ে হলো এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। আমার সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত ধী-শক্তি হয়ে গেল নিষ্ক্রিয়, তাঁকে দর্শন করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে আমি হয়ে গেলাম 'তিনি'। মূক যেমন পারে না প্রকাশ করতে অমৃতের আস্বাদ, তেমনি আমি পারিনে মুখ ফুটে বলতে আমার আত্মিক আনন্দ ও অনুভূতির কথা।" —অভঙ্, ৭৯।

জ্ঞানদেবের দার্শনিক মতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার রচিত 'অমৃতানুভব' গ্রন্থ হইতে এই মতবাদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টি-লীলার তত্ত্ব প্রসঙ্গে তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন তাঁহার স্ফুর্ত্তিবাদ। এই দৃশ্যমান সৃষ্টিকে তিনি অদ্বিতীয় সত্তা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করেন না। এই সৃষ্টি যে পরম সত্তারই এক প্রকাশ। জ্ঞানময় পরমাত্মারই ইহা এক লীলা! এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, একমাত্র এই ব্রহ্মই রহিয়াছেন জগৎ-রূপে উদ্ভাসিত। জ্ঞানদেব বলেন,—"নিজেকে দর্শনের জন্য পরমাত্মার যখন ইচ্ছা জাগে, তিনি নিজেই তখন রূপ পরিগ্রহ করেন এই বিশ্বজগতের, দর্শন করেন নিজেকে।" (অমৃতানুভব, ১২৯, ১৩১, ১৫৬)

এই দার্শনিকতার জের টানিয়া আর একস্থানে তিনি বলিতেছেন,—

"যদিও ব্রহ্ম নিজে এই দৃশ্যমান জগতে হন রূপান্তরিত, নিজেকে করেন দর্শন ও উপভোগ, তবুও তাঁহার একত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব কখনো নষ্ট হয় না, এ যেন ঠিক নিজেকে আয়নার ভেতরে দেখার মত—বাস্তব মুখমণ্ডলটি থাকে একেবারে অপরিবর্ত্তিত। ঘুমন্ত বা জাগ্রত যাহাই থাকুক না কেন, অশ্বের দণ্ডায়মান ভঙ্গীর যেমন কোন পার্থক্য হয় না, এও ঠিক তেমনই। জল যেমন তরঙ্গ হইয়া আপনাতে আপনি খেলা করে, তেমনি অদ্বিতীয় সত্তা নিজের সঙ্গেই খেলা করিতেছেন নিজে এই জগৎ-রূপ ধারণ করিয়া। আগুন কি কোন পৃথক বস্তু হইয়া দাঁড়ায় যখন উহা শিখার মালা পরিধান করে? সূর্য্য যখন কিরণ মালায় পরিবেষ্টিত থাকে, তখন সূর্য্য আর সূর্য্যকিরণে দ্বৈতসত্তা কিছু থাকে না। চাঁদের একত্বের কি হানি হয় যখন সে থাকে চন্দ্রকরে পরিবেষ্টিত? সহস্র দলে বিকশিত হইয়া উঠিলেও কমলের একত্ব তো কখনো হয় না খণ্ডিত।" —অমৃতানুভব, ৭, (১৩২—১৪৯)।

ঈশ্বরপ্রেরিত এক শক্তিধর মহাপুরুষ এই জ্ঞানদেব। লোকমঙ্গল ও জীবহিতৈষণার মহান ভূমিকা নিয়া তাঁহার আগমন, মহারাষ্ট্রের অধ্যাত্ম-জীবনের এক চিহ্নিত নায়ক তিনি। ভক্তি আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান উৎসরূপে তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে, জন-জীবনের সর্ব্ব-স্তরে বিস্তারিত করিতে হইবে ভক্তির উজ্জীবনকারী প্রাণ-রসধারা। তাই ঐশী বিধানে তাঁহার জীবনে এযাবৎ প্রস্তুতিপর্ব্ব কম চলে নাই। প্রথম বয়সে পিতার বৈষ্ণব-জীবনের প্রভাব তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে। তারপর শুরু হইয়াছে তাঁহার নিগূঢ় যোগসাধনা। জ্ঞানময় উপলব্ধির মধ্য দিয়া সে সাধনা ক্রমে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বশেষে এই শক্তিমান, জ্ঞানবান মহাসাধকের আধারে পরমপ্রভু ঢালিয়া দিলেন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অমৃতরস। এ রসধারায় অবগাহন করিয়া লক্ষ লক্ষ ঈশ্বরমুখীন মানুষ তৃপ্ত হইল।

উত্তরজীবনে তাঁহার এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পরিণত হয় শুদ্ধা ভক্তির সাধনায়। মহাসাধক ধীরে ধীরে লীলাবীদ, শরণাগতি ও একৈকনিষ্ঠার পথে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। জ্ঞানদেবের অভঙ্-এ ইহার প্রমাণ আছে—

"কে পারে পরম প্রভুকে উপলব্ধি করতে? এক টুকরা কাপড়ে নিংড়ে নিলে কি স্নিগ্ধ শীতল দখিণা সমীর কখনো ফোঁটা ফোঁটা করে গড়িয়ে পড়ে? ফুলের সুবাসকে কখনো তো বাঁধা যায় না রজ্জু দিয়ে। সর্ব্বেশ্বর কি মহান্ না ক্ষুদ্র? কে জানতে পারে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ? ওগো, মুক্তার দ্যুতি দিয়ে কি জলের কলসী পূর্ণ করা যায়? নিঃসীম আকাশকে আবৃত করা যে অসম্ভব। চোখের মণি থেকে তার আলোক-বিচ্ছুরক বন্ধনীকে কি করে করবে বিচ্ছিন্ন?...প্রভু ও তাঁর দয়িতার প্রেমকলহের তো কখনো ঘটে না সমাপ্তি। তাই নিরুপায় হয়ে জ্ঞানদেব নিজেকে লুটিয়ে দিচ্ছে প্রভুর ইচ্ছার সামনে।" —অভঙ্ ৯৩।

আত্মনিবেদন ও একৈকনিষ্ঠার যে সুর এখানে ধ্বনিত হয়, তাহাই পংধরপুরে গিয়া পূর্ণতর পরিণতি লাভ করে।

জ্ঞানদেবের ভক্তিগ্রন্থ ও তাঁহার সাধনার খ্যাতি তখন মারাঠার সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে। এই সময়ে একদিন ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে তিনি পংধরপুরে শ্রীবিঠোবার চরণতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তিসিদ্ধ এই তরুণ মহাপুরুষকে পাইয়া ভক্তসমাজ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। জাগিয়া উঠিল এক নূতন প্রাণচাঞ্চল্য।

পংধরপুরের প্রাচীন বিঠ্ঠল সম্প্রদায় সেদিন সোৎসাহে জ্ঞানদেবকে নেতারূপে বরণ করিয়া নেয়।* নাম-গান ও কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া তিনি উৎসারিত করেন এক অভূতপূর্ব্ব ভাব-তরঙ্গ।

---

* "পংধরপুরের বিঠ্ঠল সম্প্রদায় জ্ঞানদেব ও নামদেবের পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। এই সম্প্রদায়ের নেতা ও শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন আচার্য্য পুংদলিক, তাঁহার পরবর্ত্তীকালে নেতৃত্ব করেন জ্ঞানদেব ও নামদেব। গুজরাট, কর্ণাট, তেলেগু ও তামিলভাষী অঞ্চল এবং মারাঠার নানাস্থান হইতে এ সময়ে দলে দলে তীর্থযাত্রীরা সমবেত হইত পংধরপুরে। এই ভক্ত যাত্রীদের কাছে

ভক্তবীর গোরা ছিলেন জাতিতে কুম্ভকার, কৃষ্ণভক্তির রসায়নে সমগ্র জীবন তাঁহার রসায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। বিঠোবাজীর অঙ্গনে এই গোরা কুম্‌হারের নৃত্য ছিল এক দর্শনীয় বস্তু। প্রভুর নাম কীর্ত্তন একবার শুরু হইলেই আর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। ভাবপ্রমত্ত হইয়া প্রহরের পর প্রহর তিনি নৃত্য করিতেন, সমবেত জনগণের মধ্যে ভক্তি ও দিব্য আনন্দের ধারা উচ্ছলিত হইয়া উঠিত। এ সময়ে বিঠোবা-ভক্তদের মধ্যে গোরা কুম্‌হারের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ।

স্বগ্রাম তেরাধোকি হইতে গোরা সেদিন বিঠোবার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ভক্ত-চূড়ামণি জ্ঞানদেবের খ্যাতি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছে, তাই মন্দিরের দর্শন প্রণাম সারিয়া নবাগত সাধককে দেখিতে আসিয়াছেন। জ্ঞানদেবের মধ্যে গোরা কুম্‌হার কি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন। সেদিন হইতেই তিনি বাঁধা পড়িলেন এক অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনে। বয়সে গোরা ছিলেন জ্ঞানদেব ও অন্যান্য সাধকদের অপেক্ষা বড়, তাই সকলে এই প্রবীণ ভক্ত সাধককে গোরা-চাচা বলিয়া ডাকিতেন।

চাংগদেব এক প্রবীণ হঠযোগী। দীর্ঘদিন একনিষ্ঠার সহিত আপন সাধনা নিয়া তিনি পড়িয়া আছেন, যোগবিভূতিও কিছু কিছু অর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু জীবনে আজিও তাঁহার মিলে নাই শান্তি, হয় নাই অধ্যাত্মজীবনের স্থিতি।

নানা তীর্থ ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন তিনি পংধরপুরে পৌঁছিয়াছেন। বিঠোবাজীর মন্দির চত্বরে লোকের মহা ভীড়। ভক্ত এবং শিষ্যগণসহ

এখানকার ভক্ত সাধকদের বাণী তুলিয়া ধরা প্রয়োজন, সর্ব্বজনবোধ্যভাবে ইহার পরিবেশন প্রয়োজন, তাই এ কাজে সাহায্য নেওয়া হইতে থাকে কীর্ত্তন গানের। অনুমিত হয় যে, কীর্ত্তন রচনা ও কীর্ত্তন গানের প্রাথমিক গৌরব অনেকাংশে জ্ঞানদেব ও নামদেবেরই প্রাপ্য।" [মিস্টিজম্ ইন্ মহারাষ্ট্র : এস. কে. বেলওয়ালকর ; আর. ডি. রাণাডে।]

জ্ঞানদেব কীর্ত্তন করিতেছেন। মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি, সুমধুর সঙ্গীত আর নৃত্যের তালে তালে জাগিয়া উঠিয়াছে দিব্য ভাবতরঙ্গ, আর এই ভাবতরঙ্গে উদ্বেল হইয়া ভক্তেরা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য!

চাংগদেব কৌতূহলী হইয়া এ কীর্ত্তনবাসরে উঁকি দিলেন। কিছুক্ষণ পরে নৃত্যগীত থামিয়া গেল, ভাবোচ্ছাসও হইল প্রশমিত। হঠযোগী এবার ধীরে ধীরে জ্ঞানদেবের দিকে আগাইয়া গেলেন। সম্মুখে তাঁহার উপবিষ্ট অনিন্দ্যকান্তি বিংশতি বৎসরের তরুণ মহাপুরুষ! চোখে মুখে তাঁহার দিব্যভাবের অপরূপ ব্যঞ্জনা। প্রভুর স্তুতি কীর্ত্তনের শেষে আত্মসমর্পিত সাধক এক মহাশান্তির পারাবারে নিমজ্জিত।

চাংগদেব আপনহারা হইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার উপলব্ধি হইল, হঠযোগের যে সমস্ত সিদ্ধি এ যাবৎ তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, এই সর্ব্বনিবেদিত মহাসাধকের অপার আনন্দধারা ও শান্তির তুলনায় তাহা একেবারে তুচ্ছ।

সেইদিনই তিনি জ্ঞানদেবের শরণ নিলেন। ভক্তিবাদী মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থাকিয়া নূতন করিয়া শুরু হইল তাঁহার সাধনা।

উত্তরকালে জ্ঞানদেবের তিরোধানের পর তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী ভক্তিসিদ্ধা সাধিকা মুক্তাবাঈর শিষ্যত্ব চাংগদেব গ্রহণ করেন।

জ্ঞানী সাধক বলিয়া বিশোয়ার তখন চারিদিকে খ্যাতি রটিয়াছে। নিকটেই বার্সি-গ্রামে থাকিয়া তিনি সাধন-ভজন করেন। দীর্ঘদিন শিবের আরাধনা করিয়া ঋদ্ধি সিদ্ধিও কিছু কিছু অর্জ্জিত হইয়াছিল। এবার বিশোয়া অদ্বৈত জ্ঞানের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। দেব বিগ্রহ তিনি মানিতেই চাহেন না। পূজা, অর্চ্চনা, সেবা—সব কিছুই তাঁহার চোখে মূল্যহীন। বৈষ্ণবদের ভাবাবেশ, নর্ত্তন কীর্ত্তনের কথা উঠিলেই করেন তাচ্ছিল্য আর উপহাস।

পংধরপুরের এই নূতন ভক্তি আন্দোলন বিশোয়া মোটেই সুচক্ষে

দেখিতে পারেন নাই। তাই সুযোগ পাইলেই জ্ঞানদেবের উদ্দেশে তিনি শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণ করেন। বলেন, "যোগমার্গের সাধনা ছেড়ে জ্ঞানদেব হয়েছে প্রেমিক, ভাবের ফানুস জ্ঞানের রাজপথ ছেড়ে ধরেছে প্যানপেনে কান্নার গলিপথ।"

মারাঠী ভক্তি-সাধকের মধ্যে এ সময়ে জ্ঞানদেবের ভগ্নী মুক্তবাঈ-এর খ্যাতিও যথেষ্ট। তাঁহার রচিত সুমধুর অভঙ্ পদাবলী আজকাল গীত হয় মন্দিরে মন্দিরে, ঘরে ঘরে। জ্ঞানপন্থী বিশোয়া কিন্তু মুক্তাবাঈকেও নিন্দা করিতে ছাড়েন না।

ভক্তদের অনেকে এজন্য বিশোয়ার উপর ভারী বিরক্ত। কেউ কেউ বক্রোক্তি করিয়া তাঁহার নামকরণ করেন বিশোয়া-খেচরা।

পরম ভাগবত জ্ঞানদেব কিন্তু সাধক বিশোয়ার সান্নিধ্যের জন্য, তাঁহার সহিত ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য ব্যাকুল। বারবার লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন, পংধরপুরে আসিয়া অবস্থান করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান।

সে-বার জ্ঞানদেব শুনিতে পাইলেন বিশোয়া শুধু বিঠ্ঠল সম্প্রদায় সম্পর্কেই কটূক্তি করেন নাই, প্রভু শ্রীবিঠোবার উদ্দেশেও নাকি নানা শ্লেষোক্তি করিয়াছেন।

সবিস্ময়ে ভক্তদের তিনি কহিলেন, "সে কি! জ্ঞানী সাধক হয়ে বিশোয়ার এই মতিভ্রম? শ্রীবিঠোবাকে সে কি শুধু বিগ্রহ বলেই দেখেছে? তাঁর চৈতন্যময় রূপ চোখে পড়েনি? তাহলে এবার দেখছি, একটা ব্যবস্থা করাই দরকার। আজই তোমরা কেউ বার্সিতে চলে যাও। বিশোয়ার হাতে আমার এই সদ্য রচিত অভঙ্‌টি দিয়ে এসো।"

তাঁহার এই অভঙ্-এ জ্ঞানদেব সেদিন লিখিলেন, "দেখেছি আমি সেই মহালিঙ্গ, যাঁর আধার হচ্ছে অসীম আকাশ, জলরেখা হচ্ছে মহাসাগর, শেষনাগের মত যা বহন করে আছে সারা বিশ্বজগৎ; মেঘলোক থেকে এঁর ওপর বর্ষিত হচ্ছে বারিরাশি, আকাশের নক্ষত্ররাজী হচ্ছে পুষ্পদল যা দিয়ে হচ্ছে এঁর অর্চ্চনা, ফলরূপে এঁর কাছে নিবেদিত হচ্ছে চন্দ্রমা,

প্রদীপ্ত সূর্য্য করছে এঁর আরতি, এঁরই কাছে সাধকের ব্যক্তিসত্ত্বাকে নিবেদন করতে হবে অর্ঘ্যরূপে। আমি এই মহালিঙ্গকে আরাধনা করেছি আমার মহাভাবময় আনন্দ দিয়ে, আমার হৃদয়াসনে ধ্যেয়রূপে স্থাপন করেছি এই জ্যোতির্ম্ময় পরমবস্তুকে।" —অভঙ্ ৬৬।

অভঙ্খানি নকল করিয়া তখনি পাঠানো হইল।

সেই দিনই রাত্রে বিশোয়া এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। ইষ্টদেব মহেশ্বর তাঁহাকে রুষ্টস্বরে বলিতেছেন, 'ওরে, সাধন করে বৃদ্ধ হয়ে পড়লি এখনো যে তোর আত্মাভিমান গেলো না। ঘট না ভাঙলে কি আকাশের সাথে কখনো মিশতে পারে? নিজেই যে তুই নিজের চারদিকে রচনা করে রেখেছিস্ ব্যবধান। তুই নগন্য মৃত্তিকার এক ঘট, তবুও সেই মৃত্তিকার আবরণ ভেঙে ফেলতেই তোর মন সরছে না। আর ঐ ছ্যাখ সোনার ঘট হয়েও জ্ঞানদেব নিজেকে অবলীলায় ফেলেছে গুঁড়িয়ে, নিজেকে সে করেছে একেবারে অবলুপ্ত, তাইতো পেয়েছে তার পরম পাওয়া। জ্ঞানদেবেরই আশ্রয় গ্রহণ কর, অভীষ্ট তোর সিদ্ধ হবে। যা—যা, আর দেরী করিসনে।'

সেই রাত্রেই পায়ে হাঁটিয়া বিশোয়া পংধরপুরে আসিয়া উপস্থিত। ভোর হইতে না হইতেই জ্ঞানদেবের চরণতলে গিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। দুই চোখে নামিল তাঁহার অশ্রুর বন্যা।

এই প্রত্যুষকালে কে এই বৃদ্ধ সাধক এমন করিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছে? জ্ঞানদেব কোমলস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ভাই কে তুমি? কোথায় তোমার বাস? কেনই বা তোমার এমন আর্ত্তি?"

"প্রভু, আমি বিশোয়া-খেচরা।"

"সে কি ভাই, তুমি 'খেচরা' হতে যাবে কেন? তুমি যে সর্বজনমান্য সাধক বিশোয়া।"

"প্রভু, আজ দুটি প্রার্থনা নিয়ে আমি ছুটে এসেছি। কৃপা করে আমায় আপনার পরমাশ্রয় দিন, টেনে তুলুন আপনার কোলে। আর আজ থেকে 'বিশোয়া খেচরা' বলেই আমায় অভিহিত করুন। এই

'খেচরা' নামের কলঙ্কই থাকুক আমার সাথে চির জড়িত হয়ে। আপনাকে আর ভগিনী মুক্তাবাঈকে উপহাস ও তাচ্ছিল্য আমি এযাবৎ কম করিনি, একদল ভক্ত চটে গিয়ে তাই আমার নাম দিয়েছিল 'খেচরা'। সেই নামই থাক আমার চিরদিনের শিরোভূষণ হয়ে—আত্মাভিমান তাতে কিছুটা চাপা পড়বে।"

বিশোয়া-খেচরা অতঃপর জ্ঞানদেবের নিকট হইতে সাধন প্রাপ্ত হন উত্তরকালে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন এক ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। মহারাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক নামদেব এই বিশোয়া খেচরারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হন।

জ্ঞানদেবের অনুগামী বিঠ্ঠল সম্প্রদায় প্রসার লাভ করিতে থাকে, তাঁহার ভক্ত-সংখ্যাও ক্রমে আরো বাড়িয়া যায়। এই ভক্তদের মধ্যে বিশিষ্টতম হইতেছেন শক্তিধর সাধক—নামদেব। অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্বৎ মালী, নরহরি স্বর্ণকার ও চোখা নামক এক অস্পৃশ্য। ভক্তি-ধর্ম্মের এ আন্দোলন যে সেদিন মারাঠার জনজীবনের নিম্নতম স্তরেও বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহা এই ভক্তপ্রধানদের আবির্ভাব হইতেই বুঝা যায়। সমাজে নগণ্য ও অস্পৃশ্য হইয়াও জ্ঞানদেবের অনুগামী এই সাধকদল লাভ করিয়াছিলেন অসামান্য মর্য্যাদা।

প্রাক্তন দস্যু, নামদেবের জীবনে একদিন জাগিয়া উঠে অনুশোচনার তীব্রবেদনা। উন্মাদের মত সে ছুটিয়া আসে বিঠোবাজীর চরণতলে—জ্ঞানদেবের সঙ্গে এ সময়ে তাহার মিলন ঘটে।

নামদেবের জীবনে তখন চলিয়াছে তীব্র আর্ত্তি আর কৃচ্ছ্রসাধনার পালা। বিঠোবাজীর জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়ন অন্ধকার হইতে চলিয়াছে, কিন্তু তবুও তো মিলিতেছে না প্রভুর কৃপা, দৃষ্টির সম্মুখে খুলিতেছে না চিন্ময় লোকের দুয়ার।

জ্ঞানদেবের চরণ ধরিয়া একদিন তিনি মিনতি জানাইতে থাকেন,

"প্রভু, আপনি আমার উদ্ধারের পথ বলে দিন, নইলে স্থির করেছি—এ পাপ জীবনের ভার আর বয়ে বেড়াবো না।"

আশ্বাস দিয়া জ্ঞানদেব কহিলেন, "ভাই, শুধু কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ করলে কি হবে? চোখে আগে লাগাও কৃষ্ণকৃপার অঞ্জন। চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠো। তবে তো পাবে বিঠোবার চিন্ময়রূপের দর্শন। তাড়াতাড়ি তুমি গুরুবরণ করো, মন্ত্রদীক্ষা নাও। মন্ত্রের সাধন করে যাও, আর করে তোল এই মন্ত্রকে চৈতন্যময়। তবে তো মুক্তির দ্বার খুলবে। মন্ত্র হচ্ছে মুক্তি-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি। গুরুর কাছেই যে তা রয়েছে।"

"তাইতো আমি আপনার চরণতলে ছুটে এসেছি।"

"না গো, আমি তোমার গুরু নই। তোমার চিহ্নিত গুরু রয়েছেন অন্যখানে।"

"কোথায় তিনি, প্রভু? আপনিই কৃপা ক'রে তা বলে দিন।"

"আজই, তুমি বার্সিতে ছুটে যাও। সেখানে রয়েছেন পরম ভাগবত বিশোয়া-খেচরা। জ্ঞানী সাধক এবার প্রেম-ভক্তির সাধনায় বুঁদ হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে শিগ্‌গীর মন্ত্রদীক্ষা নাও। আমি বলছি শ্রীবিঠোবার দর্শন তুমি পাবে।"

জ্ঞানদেবের কৃপাপ্রাপ্ত সাধক বিশোয়া-খেচরাই নামদেবকে অধ্যাত্ম-জীবনের নির্দ্দেশ দান করেন, ঘটান তাঁহার বিস্ময়কর রূপান্তর। উত্তরকালে এই নামদেবের অভ্যুদয় ঘটে মহারাষ্ট্রের ভক্তি-সাধনার এক বিশিষ্ট সংবাহকরূপে। জ্ঞানদেবের লোকান্তরের পরে নামদেবই হন তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভক্তি আন্দোলনের প্রেরণাদাতা, এ আন্দোলনের প্রধান পরিচালক। অর্দ্ধশতাব্দী কালেরও উপর এই গুরুদায়িত্ব তিনি গৌরবের সহিত বহন করিয়া যান।

কিছুদিন পর জ্ঞানদেবের ইচ্ছা জাগে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট পুণ্যতীর্থ তিনি দর্শন করিয়া আসিবেন। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের বাহিরেও তাঁহার সাধনৈশ্বর্য্যের খ্যাতি প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। নানা অঞ্চল

হইতে ভক্ত-সমাজের আহ্বান বারবার তাঁহার কাছে পৌঁছিতেছে। এবার তীর্থদর্শনের পথে সে আমন্ত্রণও রক্ষা করা যাইবে। জ্ঞানদেব তাই পরিব্রাজনে বাহির হইলেন—সঙ্গে চলিলেন নামদেব, গোরা, বিশোয়া প্রভৃতি সাধকের দল। তীর্থাদি দর্শন ও কিছুসংখ্যক চিহ্নিত ভক্তকে কৃপা প্রদর্শনের পর তাঁহার এই পরিব্রাজন সমাপ্ত হয়।

পংধরপুরকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তির যে প্লাবন জ্ঞানদেব বহাইয়া দিয়া যান, ধীরে ধীরে তাহা মহারাষ্ট্রের জনজীবনের সর্ব্বস্তরে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার 'জ্ঞানেশ্বরী' ও 'অমৃতানুভব' আজ সাধক ও অধ্যাত্মরস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য। মননশীল, শিক্ষিত মারাঠীমাত্রেরই তাহা গৌরবের বস্তু। তাঁহার প্রেমভক্তি রসাশ্রিত অভঙ্ ও তাঁহার কীর্ত্তনানন্দ আপামর জনসাধারণের প্রাণে আনিয়াছে ভক্তির জোয়ার। আর এ জোয়ারের উৎসরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন স্বয়ং জ্ঞানদেব। বয়স মাত্র বিংশতি বৎসর হইলে কি হয়, ভক্তিসিদ্ধ দিব্যকান্তি এই মহাপুরুষের ভাষণ, ব্যক্তিত্ব, ও রসাবিষ্ট মূর্ত্তি লক্ষ লক্ষ ভক্তের হৃদয়ে জাগাইয়া তোলে শুদ্ধাভক্তির প্রেরণা।

জ্ঞানদেবের অন্তর এবার অমৃতরসে ভরপুর। ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট যে মহান কর্ম্মের ভার নিয়াছিলেন, প্রায় তাহা উদ্‌যাপিত করিয়া আনিয়াছেন। এখন কর্ম্মজাল গুটানোর পালা।

১২৯৬ খৃষ্টাব্দের এক শান্ত মধুর প্রভাত। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শিষ্যগণসহ আড়ন্দির পৈত্রিক ভিটায় জ্ঞানদেব আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নিত্যলীলায় প্রবেশের আর দেরী নাই। আপ্তকাম মহাসাধকের আননখানি সেদিন দেখা গেল বড় প্রসন্নোজ্জ্বল। স্মিতহাস্যে গুরু নিবৃত্তিনাথের চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া চিরতরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন।

দাক্ষিণাত্যের অধ্যাত্মাকাশ হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সেদিন খসিয়া পড়িল।

তন্ত্রাচার্য্য সর্ব্বানন্দ

মেহারের প্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারী জটাধর সেদিন সাড়ম্বরে সভা জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন। কাজকর্ম্ম শেষ হইবার পর পারিষদবর্গসহ নানা প্রসঙ্গ ও কৌতুকালাপ চলিতেছে।

হঠাৎ দ্বারপণ্ডিত আগমানন্দের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। লক্ষ্য করিলেন, আচার্য্যের পাশেই চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা সর্ব্বানন্দ। বয়সে তরুণ, দেখিতে একেবারে কন্দর্পকান্তি। কিন্তু মেহার অঞ্চলের সবাই জানে, এ একটি মাকাল ফল। প্রতিভাধর ব্রাহ্মণবংশের সন্তান হইলে কি হয়, একেবারে অকাট মূর্খ। শুধু তাহাই নয় সর্ব্বানন্দ জড়-ভরতের মত সদাই থাকে নিষ্ক্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি তাহার কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

জটাধর সহাস্যে কহিলেন, "কি ব্যাপার আচার্য্য ? আজ আমাদের সর্ব্বানন্দ যে স্বয়ং সভায় উপস্থিত!"

"মহারাজ তো সবই জানেন। নিজের খেয়াল খুশী মতই সে চলাফেরা করে। আজ হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে এখানে এসেছে। সঙ্গে করে এনেছে বালকপুত্র শিবনাথকেও।"

জমিদার মহাশয় হঠাৎ বড় কৌতুকী হইয়া উঠিয়াছেন। সহাস্যে সর্ব্বানন্দের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "কি হে পণ্ডিত, মা সরস্বতীর পাট তো এ জন্মের মত উঠিয়েই দিয়েছ। কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে—বলি, তিথি-নক্ষত্রের জ্ঞান-ট্যান কিছু আছে তো ? না, তাও ভুলে বসেছো। আচ্ছা বলতো, আজ কি তিথি ?"

সদ্য সুপ্তোত্থিতের মত, আচমকা সর্ব্বানন্দ কি জানি কেন বলিয়া বসিলেন, "আজ পূর্ণিমা।"

সভায় তুমুল হাসির রোল পড়িয়া গেল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে, আজ পৌষ সংক্রান্তি এবং অমাবস্যা তিথি।

রাজার ক্রোধ এক মুহূর্তে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

শক্তিধর সাধক, তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্, বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের গৃহে এ কোন্ কুলাঙ্গার জন্মিয়াছে। বংশের মানসম্ভ্রম নষ্ট না করিয়া সে ছাড়িবে না। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য্য-বংশের নাম ডুবিয়েছ তুমি, অপদার্থ কোথাকার। ব্রাহ্মণের ছেলে, রাজসভায় আসতে হলে বিদ্যা-বুদ্ধি কিছু থাকা দরকার—তাও কি জানো না। সাবধান। আর কখনো আমার সভায় তোমায় যেন না দেখি।"

শুধু তাহাই নয়, রোষকষায়িত নেত্রে সর্ব্বানন্দের পুত্র শিবনাথকেও সতর্ক করিয়া দিলেন, "তোমার বাবার তো কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই, তাকে কিছু বলা বৃথা। কিন্তু তুমি লক্ষ্য রাখব, সে যেন আমার সভার এদিকে কখনো পা না বাড়ায়। তা হলে কিন্তু কঠোর শাস্তি পেতে হবে তোমাদের।"

সর্ব্বানন্দ ও শিবনাথ নীরবে সভাকক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া শিবনাথ ক্ষোভে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন। মায়ের কাছে বিবৃত করিলেন আজিকার চরম অপমানের কথা।

এই স্বামীকে নিয়া পত্নী বল্লভা এ জীবনে কোনদিনই শান্তি পান নাই। আজিকার ঘটনায় তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। চীৎকার, কটূক্তি ও কান্নায় স্বামীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। তদুপরি শুরু হইল বাড়ীর সবাইয়ের গঞ্জনা ও তিরস্কার।

সর্ব্বানন্দের অন্তরে আজিকার আঘাত বড় মর্ম্মান্তিক হইয়া বাজিল। সদা বেহুঁশ, নিষ্ক্রিয় মানুষটির অন্তরে এক তীব্র নাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তমসার ঘোর হইতে নূতন করিয়া যেন তিনি জাগিতে চাহিতেছেন। সত্যিই তো। ব্যর্থ, বন্ধ্যা এই জীবনটা এতদিন কি করিয়া তিনি বহিয়া কাটাইলেন? স্ত্রীপুত্র পরিবারের কোন কাজেই আজ পর্য্যন্ত লাগিলেন

না। নিজের জন্যই বা কি করিয়াছেন ? নিরক্ষর নির্ব্বোধ তিনি। সংসারের ভার স্বরূপই এতকাল রহিয়াছেন। এমন জীবন টানিয়া বেড়ানোর চাইতে যে মৃত্যু অনেক ভাল।

অনুশোচনা ও আর্ত্তিতে সর্ব্বানন্দের হৃদয় মুষড়িয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে লোকালয় ছাড়িয়া বাহির হইলেন। তারপর ডাকাতিয়া নদীর তীর ধরিয়া প্রবেশ করিলেন গ্রামের প্রান্তস্থিত নিবিড় অরণ্যে।

সারাটা দিন তাঁহার কোন খোঁজ খবর নাই। বাড়ীর লোক বড় ঘাবড়াইয়া গেল। এমন তো কখনো হয় না। এই মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকের অদৃষ্টে এরূপ অপমান, লাঞ্ছনা আরো অনেকদিনই জুটিয়াছে, কিন্তু কোনও দিনই কেহ তাহাকে চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধ হইতে দেখেন নাই। ভাল মন্দের কোন বোধই যাহার নাই, তাহার পক্ষে স্তুতি-নিন্দা, অনুগ্রহ-নিগ্রহ সবই যে সমান।

সবার চাইতে কিন্তু বেশী ব্যাকুল হইয়া উঠে বাড়ীর নমঃশূদ্র ভৃত্য পূর্ণানন্দ। সর্ব্বানন্দের শিশুকাল হইতেই সে তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। মনের অজ্ঞাতে কি এক রহস্যময় আকর্ষণ তাহার প্রতি সে যেন বোধ করে। তাহার চোখে সর্ব্বানন্দ যেন এক ঘুমন্ত মানুষ —একান্ত অসহায়। সকলের উপেক্ষিত এই যুবা-শিশুটিকে আগলাইতে গিয়া দিনরাত পূর্ণানন্দকে হিম্‌সিম্ খাইতে হয়।

আজ সারাদিন তাঁহাকে না দেখিয়া পূর্ণানন্দ অধীর হইয়া পড়ে। বাড়ীর লোকেরও দুশ্চিন্তা কম হয় নাই।

এদিকে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া সর্ব্বানন্দ জঙ্গলের মধ্যে চুপচাপ বসিয়া আছেন। বারবারই মনে আলোড়িত হইতেছে দুঃসহ অপমানের কথা। সত্যিই তো, বিদ্যাবুদ্ধি-প্রতিষ্ঠাহীন এই জীবন রাখিয়া কি লাভ ? এক একবার সঙ্কল্প জাগে, নদীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবেন। কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ। এ পাপ যে করে, মৃত্যুর পরে তাহার তো মুক্তি নাই। তবে ?

অবশেষে ধীরে ধীরে মনে জাগিয়া উঠিল এক দৃঢ় সঙ্কল্প। বিদ্যা তাঁহাকে অর্জ্জন করিতেই হইবে। দাশবংশের কায়স্থ জমিদার এই পরগণার অধিকারী—রাজার মত তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, রাজা বলিয়াই সকলে অভিহিত করে, ভয় ভক্তিও করে। এই রাজা জটাধরকে সর্ব্বানন্দ পদানত করিবেন। এমনি শাস্ত্রবিদ্ তিনি হইবেন যে, দাম্ভিক জটাধরের শির লুটাইয়া পড়িবে তাঁহার চরণতলে। কিন্তু এতদিন পরে, এ বয়সে কি এই বিদ্যা আহরণ করা যাইবে? সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হওয়া কি আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব? কিন্তু কেনই বা নয়? কালিদাসের মত মূর্খও যদি পণ্ডিত হইতে পারেন, তিনি কেন পারিবেন না?

হ্যাঁ, আজই, এখনি শুরু করিবেন তাঁহার এই সঙ্কল্প-সাধন।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য তালপাতার আবশ্যক। একথা মনে হইতেই সর্ব্বানন্দ নিকটস্থ তালগাছটিতে উঠিয়া পড়িলেন।

শীতের পড়ন্ত বেলা। তাড়াতাড়ি কাজ না সারিলে এখনই অন্ধকার হইয়া যাইবে। কিন্তু একাজে তেমন অভ্যাস নাই, অতিকষ্টে ধীরে ধীরে তাঁহাকে উঠিতে হইতেছে। বহুক্ষণ পরে, গাছের শীর্ষদেশে সবেমাত্র পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় দেখা দিল এক ভীষণ বিপদ। হাত দিয়া পাতা ছিঁড়িতে যাইবেন, হঠাৎ গর্ত্ত হইতে ফোঁস করিয়া উঠিল এক দুর্দ্ধর্ষ গোখুরা সাপ!

তাইতো, এ মহাসঙ্কটে কি করা যায়? বৃক্ষ হইতে এখন অবতরণের চেষ্টা বৃথা, হিংস্র সাপের ছোবল খাইয়া মরিতে হইবে। বরং সাহসে ভর করিয়া এটাকে হত্যা করাই ভাল।

তখনি দুরন্ত সাহসে ভর করিয়া, ক্ষিপ্রবেগে সর্ব্বানন্দ সাপের ফণা আঁকড়াইয়া ধরিলেন। তারপর তালের শাখার ধারালো প্রান্তে ফেলিয়া সজোরে এটিকে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে দ্বিখণ্ডিত সাপটি ঝপ্ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল নীচ হইতে এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠের আহ্বান—

"তালবৃক্ষের ওপর বসে, কে তুমি বাবা, সাপের সঙ্গে যুঝছো এতক্ষণ? ধন্য সাহস, ধন্য শক্তি তোমার। এবার নীচে নেমে এসো।"

বহুক্ষণ আগে সর্ব্বানন্দ তাল গাছে আরোহণ শুরু করিয়াছেন। এতক্ষণ নীচের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর হয় নাই। এবার তাকাইয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে এক সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে আসিয়া বসিয়াছেন।

তাড়াতাড়ি কিছুটা তালপত্র সংগ্রহ করার পর তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন।

ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন এক মহাকায় অবধূত সন্ন্যাসী। শিরে তাঁহার দীর্ঘ জটাজাল, পরণে রক্তবর্ণ ক্ষৌম বসন। গলদেশে থাকে-থাকে রুদ্রাক্ষ ও হাড়ের মালা বিলম্বিত। কপালে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে বড় রক্তচন্দনের ফোঁটা। আয়ত নয়ন দুইটি সুরাপানে রক্তিম হইয়া আছে।

ভয়ে ভক্তিতে অভিভূত সর্ব্বানন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রশ্ন হইল, "কে তুমি বাবা? এই ভর সন্ধ্যেবেলায় তালগাছে উঠে কি করছিলে?"

"তালপাতা পাড়ছিলাম, লেখাপড়া শুরু করবো বলে।"

"তুমি নির্ভীক! এমন যে পরমপ্রিয় প্রাণ, তার প্রতি দেখছি কোন মমত্ববোধই তোমার নেই। সাধনার প্রকৃত অধিকারী তুমি। তোমার ওপর আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, বৎস। বল কি তোমার প্রার্থনা।"

সর্ব্বানন্দ করজোড়ে নিবেদন করিলেন, সেদিনকার দুঃসহ অপমানের কথা। তিনি বিদ্যা চান, হইতে চান সর্ব্বজনমান্য শাস্ত্রবিদ্। হ্যাঁ, ইহাই আজ তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। জমিদার জটাধরের অপমান তাঁহার দেহে বিষাক্ত কাঁটার মত বিঁধিতেছে। তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ তিনি নিতে চান, তাঁহার সভায় সর্ব্বানন্দ যেন পূর্ণ মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত হইতে পারেন।

গম্ভীরানন অবধূতের ওষ্ঠপ্রান্তে এবার দেখা দিল স্মিত হাস্যের রেখা। কহিলেন, "বাবা সর্ব্বানন্দ, যে বিদ্যা তুমি চাচ্ছো, তা হলো নিষ্ফলা বিদ্যা। তোমায় আমি সর্ব্ববিদ্যামন্ত্র দেব। সাধনায় তুমি তৎপর হও। দেবী তাতে প্রসন্না হবেন। সর্ব্বসিদ্ধি হবে তোমার করতলগত। তুচ্ছ জটাধরের সভার মর্য্যাদা ভেবে তুমি মরছো কেন?"

সর্ব্বানন্দের মন এ কথায় সায় দেয় না। সাধন ভজনের কথা বলিয়া সন্ন্যাসী কি তাঁহাকে আজিকার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে চান? মন্ত্রের সাধন নিয়া তাঁহার কি হইবে? তিনি চাহেন বিদ্যা!

মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিল অবধূতের রুদ্র রূপ। গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "চুপ করে কেন? বুঝেছি, প্রত্যয় এখনো আসছে না, না? আচ্ছা, তাহলে মন্ত্রবল একটু প্রত্যক্ষ করে নাও।"

খণ্ডিত সর্পের অংশ দুইটি নিকটেই ভূতলে পড়িয়া আছে। সন্ন্যাসী চিমটা দিয়া তাহা টানিয়া আনিলেন। তারপর অস্ফুটস্বরে মন্ত্র পড়িয়া ছিটাইয়া দিলেন কমণ্ডলুর পবিত্র বারি।

ক্ষণকাল মধ্যে সেখানে ঘটিয়া গেল এক মহা অলৌকিক কাণ্ড। সর্ব্বানন্দের বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রের সম্মুখে সর্পটি ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, তারপর নতশিরে প্রস্থান করিল গহন অরণ্যে।

অবধূত কহিলেন, "সর্ব্বানন্দ, এবার তো নিজ চোখে দেখলে মন্ত্রের সঞ্জীবনী ক্রিয়া। এবার তা হলে বিশ্বাস হয়তো হচ্ছে। হ্যাঁ, সত্যিই আমার মন্ত্র তোমার ভেতরকার ঘুমন্ত মানুষটিকে জাগিয়ে তুলতে পারে, পূরণ করতে পারে সর্ব্ব অভীষ্ট।"

সর্ব্বানন্দ একেবারে হতবাক্।

আগন্তুক মহাসাধকের কণ্ঠে এবার শোনা গেল ভিন্ন সুর। দৃঢ় বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "শোন সর্ব্বানন্দ। নিতান্ত আকস্মিকভাবে আজ আমি এখানে এসে পড়েছি, তা ভেবো না। পূর্ব্ব থেকেই এটা হয়ে রয়েছে বিধিনির্দ্দিষ্ট। বৎস, আজ তোমার জন্যই যে পূর্ব্ববঙ্গস্থিত এই সুদূর মেহার-এ আমার আগমন। শুভ লগ্ন সমুপস্থিত। আজই, এখনই আমি

তোমায় দীক্ষা দেবো। তুমি নিকটস্থ নদী থেকে অবগাহন করে এসো।"

স্নান সমাপনান্তে সর্ব্বানন্দ যন্ত্রচালিতবৎ মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দীক্ষা যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বানন্দের সর্ব্বশরীরে ছড়াইয়া পড়িল চৈতন্যময় এই মন্ত্রের ক্রিয়া। কে যেন উন্মুক্ত করিয়া দিল দীর্ঘদিনের আবদ্ধ শক্তির প্রচণ্ড নির্ঝর। জড়বুদ্ধি, মহামূর্খ সে সর্ব্বানন্দ আর নাই। সুপ্ত সিংহ এবার জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

অবধূত কহিলেন, "বৎস, এখন বোধহয় বুঝতে পারছো, এই অরণ্যে তোমার আসার পেছনে রয়েছে ঐশী ইচ্ছা। তোমার নিজের ইচ্ছেয় এ যোগাযোগ ঘটেনি। আরও কথা আছে, শোন। এই বনভূমি পরম পবিত্র, পরম জাগ্রত। পৌরাণিক যুগের মহাতাপস মাতঙ্গমুনির এটি অন্যতম তপস্যাপূত স্থান। অদূরে ঐ জীনবৃক্ষমূলে প্রোথিত রয়েছে মুনিবরের স্থাপিত মাতঙ্গেশ শিববিগ্রহ। আমার প্রদত্ত মহামন্ত্রের সাহায্যে তোমায় সেখানে শক্তিসাধনা শুরু করতে হবে। ঐ পবিত্র চিহ্নিত ভূমিতে উপবেশন করে সম্পন্ন করতে হবে শবসাধনা। জন্মান্তরের সঞ্চিত সাধনফল তোমার রয়েছে। মহাভাগ্যবান তুমি। পাবে জগন্মাতার দুর্লভ দর্শন।"

যুক্তকরে সর্ব্বানন্দ নিবেদন করেন, "প্রভু, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। নির্দ্দেশ দিন, কবে এ কাজে ব্রতী হতে হবে আমায়?"

"কবে নয় বৎস, আজই। রজনীর দ্বিতীয় যামে শুরু কর তোমার এই পরম গুহ্য তন্ত্রসাধনা।"

"সে কি প্রভু, আজই কি করে তা সম্ভব হবে? এ সাধনার প্রধান উপকরণ—চণ্ডালের শব। তা কোথায় পাবো? আর সব উপাচারই বা কোথায়? কে-ই বা আমায় সাহায্য করতে আজ এগোবে?"

"নির্ব্বোধ! এখনো গুরুর বাক্যে নির্ভরতা আসেনি! তোমায় যিনি এখানে টেনে এনেছেন, সেই মহামায়াই কৃপা করে করবেন সব কিছুর ব্যবস্থা। বৎস, তুমি সত্যই ভাগ্যবান, তাই আজ নাটকীয়ভাবে ঘটেছে

তোমার পরমপ্রাপ্তির এমন বিস্ময়কর যোগাযোগ। আর এক কথা। আজকের এসব কথা একান্তভাবে রাখবে গোপন। শুধু পূর্ণানন্দ ছাড়া আর কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। সে তোমায় প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে পারবে। যাও, এবার ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ কর, কার্য্যে অগ্রসর হও।”

ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন গুটাইয়া, কমণ্ডলু হস্তে সন্ন্যাসী বনমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সর্ব্বানন্দের আর দেরী সহে না, তখনি ব্যাকুল হইয়া ছুটিলেন তাঁহার পুণাদাদার সন্ধানে।

বাড়ী অবধি যাইতে হইল না, পথেই পূর্ণানন্দের সহিত তাঁহার দেখা। সোৎসাহে তখনি সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া পূর্ণানন্দ আনন্দে অধীর। সারা জীবন ধরিয়া এতদিন যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, আজ বুঝি তাহা সফল হইতে চলিয়াছে। অভীষ্ট সাধনের প্রতীক্ষায়ই যে এতগুলি বৎসর তিনি কাটাইয়াছেন, এজন্যই মেহারের এই ভট্টাচার্য্য-গৃহের ভৃত্যরূপে তিনি বৃদ্ধকাল অবধি বাস করিয়া আসিতেছেন।

সদ্য কৃপাপ্রাপ্ত সর্ব্বানন্দের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া তাঁহার আশ আর মিটে না। বড় অদ্ভুত এই রূপান্তর! এতদিনকার মূর্খ, নির্ব্বোধ জড়ভরত-প্রায় সেই যুবককে আজ আর খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। চোখে মুখে তাঁহার ফুটিয়া উঠিয়াছে অপরূপ প্রতিভার দীপ্তি। সন্ন্যাসীর মহামন্ত্র ঘটাইয়াছে নূতন জীবনের উন্মেষ!

সর্ব্বানন্দ কহিলেন, “পুণাদাদা, আমার গুরুদেব বলে গিয়েছেন—তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে সব কিছু করতে। তুমি আমায় প্রাণাপেক্ষা ভালবাস। আর ছোটবেলা থেকে আমিও তোমার ওপরই নির্ভর করে থাকতে শিখেছি। তাই বুঝি গুরুদেব তোমাকেই আমার সাহায্য-কারীরূপে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু শূদ্র হয়ে এ কাজে তুমি আমায়

সাহায্য করবে কি করে? এ বড় আশ্চর্য্য কথা। আমি কিন্তু এর কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে।"

"শোন্ সর্ব্ব। সংক্ষেপে তোকে আজ তোদের ঘরের পুরাণো কথা একটু বলি। এ শুনলে আর এতটা আশ্চর্য্য হবিনে। তোর ঠাকুরদা, বাসুদেব ঠাকুরমশাইয়ের সাধনার কথাই তোকে কিছুটা বলছি।"

"শুনেছি, ঠাকুরদামশাই ছিলেন এক শক্তিমান তান্ত্রিক সাধক। আর তুমি ছিলে তাঁর চিরসহচর, একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর অনেক কথা শুধু তুমিই জানো। দয়া করে আমায় বলো।"

নিকটস্থ এক বাগানে গিয়া উভয়ে বসিলেন। পূর্ণানন্দ কহিতে লাগিলেন পুরাতন দিনের কথা।—

সর্ব্বানন্দের পিতামহ বাসুদেব ভট্টাচার্য্য ছিলেন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। বাস করিতেন বর্দ্ধমানের পূর্ব্বস্থলী গ্রামে।

প্রতি নিশীথে এই তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ জগন্মাতার আরাধনায় উপবিষ্ট হন। ধ্যান জপে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যায়। অবশেষে একদিন দেবীর প্রত্যাদেশ মিলিল—"বৎস তুমি এতো অধীর হয়ো না। পূর্ব্ববঙ্গে চাঁদপুরের অন্তর্গত মেহার নামে এক গ্রাম রয়েছে। সেখানে গিয়ে বসবাস কর, তোমার সাধন সমাপ্ত কর।"

অতঃপর বাসুদেব আর বিলম্ব করেন নাই। স্ত্রী, পুত্র এবং প্রিয় ভৃত্য পূর্ণানন্দসহ তিনি মেহার-এ আসিয়া উপস্থিত হন।

তেজস্বী, সাধননিষ্ঠ বাসুদেবকে দেখিলে লোকের মনে স্বতঃই সম্ভ্রম জাগিয়া উঠে। মেহারের তৎকালীন ভূম্যধিকারী অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ঘর-বাড়ী ও জমি-জমা দান করিয়া এখানেই তাঁহার স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দেন। কিছুদিন পরে তন্ত্রাচার্য্য বাসুদেবকে তিনি গুরুত্বে বরণ করেন।

দীর্ঘদিন মেহার-এ থাকিয়া বাসুদেব সাধন ভজন ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদি করিয়াছেন। কিছু কিছু সিদ্ধাই লাভও তাঁহার হইয়াছে। কিন্তু শ্যামা মায়ের দর্শন লাভ এখন অবধি ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে একদিন

কামাক্ষ্যাতীর্থ অভিমুখে তিনি যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রহিল তাঁহার সাধনার অন্যতম সঙ্গী, প্রিয় শূদ্রভৃত্য পূর্ণানন্দ।

বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের সঙ্কল্প—তন্ত্রসাধনার মহাপীঠ, কামাক্ষ্যাধামে দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হইবেন। এবার অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া অবধি গৃহে ফিরিয়া আসিবেন না।

মাসের পর মাস ধরিয়া বাসুদেব কৃচ্ছ্রসাধন ও দেবীর আরাধনা চালাইয়া যাইতেছেন। তারপর শেষটায় অন্নজলও প্রায় ত্যাগ করিলেন। কিন্তু দেবীর দর্শন লাভ হইল না। হঠাৎ একদিন প্রত্যাদেশ মিলিল, "বৎস বাসুদেব, এই জন্মে আর আমার দর্শন তুমি পাবে না। তোমার নিজের পৌত্ররূপেই আবার জন্ম হবে তোমার। সেই জন্মে হবে সর্ব্ব অভীষ্ট পূর্ণ। মাতঙ্গমুনির স্থাপিত মহাদেব-শিলা যে বেদীর নীচে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন, সেখানে বসে আগামী জন্মে তন্ত্রোক্ত সাধনা সম্পন্ন করবে, তারপর প্রাপ্ত হবে পরমা সিদ্ধি।"

মন্ত্র ও সাধনবিধিও দেবী জানাইয়া দিয়া গেলেন।

সাধক বাসুদেবের দুই নয়নে তখন কান্নার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিকটে অপেক্ষমান পূর্ণানন্দকে ডাকিয়া সব কথা তাঁহাকে জানাইলেন।

অতঃপর দেবীর স্বপ্ন প্রদত্ত নির্দ্দেশাদি এক তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখা হইল।

বাসুদেব ভট্টাচার্য্য মেহারে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কামাক্ষ্যা পাহাড়েই দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তিনি দেহরক্ষা করেন। পবিত্র তাম্রফলকটি সযতনে বহন করিয়া ভৃত্য পূর্ণানন্দ দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

পুরাতন স্মৃতিকথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ পূর্ণানন্দ উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন। সর্ব্বানন্দকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া তখনি তিনি গৃহে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, তাঁহার হস্তে রহিয়াছে

বাসুদেবের রক্ষিত সেই তাম্রফলক। আজিকার সন্ধ্যায় তান্ত্রিক সন্ন্যাসী যে মন্ত্র ও সাধননির্দ্দেশ সর্ব্বানন্দকে দিয়া গিয়াছেন, সূত্রাকারে তাহাই যে এখানে লিখিত রহিয়াছে।

আত্মপ্রত্যয়ের সুরে পূর্ণানন্দ কহিলেন, "শোন সর্ব্ব, দীর্ঘদিন বাসুদেব ঠাকুরের তল্পী বয়ে এসে যা বুঝেছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের নিশায় তোর সাধনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে। শ্যামা মায়ের দর্শন তুই লাভ করবি। রাত্রি ক্রমে গভীর হয়ে আসছে। চল। এবার অবধূত ঠাকুরের চিহ্নিত জায়গায় তোকে বসিয়ে দি। মায়ের পূজোর উপচার আমি সব সংগ্রহ করে আনছি।

কি ভাবে যে নিগূঢ় তন্ত্রোক্ত সাধনার ক্রিয়া সফল হইয়া উঠিবে, সর্ব্বানন্দ তাহা ভাবিয়া পান না। ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন করেন, "কিন্তু পুণাদাদা, শবের যোগাড় কি করে হবে? গুরুদেব যে বলে গিয়েছেন, শবের ওপর আরোহণ করে এই চরম সাধনা সমাপ্ত করতে হবে।"

পূর্ণানন্দ সংক্ষেপে কহিলেন, "সেজন্য তোর ভাবনা নেই। মায়ের কৃপায় কোন উপচারেরই আজ অভাব ঘটবে না। তুই আমার সঙ্গে চলে আয়।"

রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে। অবধূতের চিহ্নিত সাধন ভূমিতে উভয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অমানিশার সূচিভেদ্য অন্ধকারে সারা ভুবন সমাচ্ছন্ন। আকাশ বাতাস এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে থম্‌থম্ করিতেছে। অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শুধু মাঝে মাঝে উত্থিত হইতেছে পেঁচক-বাদুড়ের ডানা ঝাপ্‌টানি আর সারমেয়-শিবার উৎকট চীৎকার।

পূর্ণানন্দ কহিলেন, "সর্ব্ব, এবার তুই তোর গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে সাধনায় বসে যা। যা তিনি বলে দিয়েছেন, অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাবি। আর শোন, আজ রাতে তোর এই শবসাধনার শব হবো আমি। শ্বাস রোধ করে এক্ষুণি আমি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করবো। আমার দেহের ওপর বসে তুই শুরু করবি তোর সাধনা আর মন্ত্রজপ।"

সর্ব্বানন্দ ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "একি অসম্ভব কথা তুমি বলছো, পুণাদাদা। তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে অর্জ্জন করবো সিদ্ধি? সে সিদ্ধিতে আমার কাজ নেই। এ আমি কক্ষনো পারবো না।"

"শোন, পাগলামি করিসনে। আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার এই জরাজীর্ণ দেহটা দিয়ে কার কি কাজ হবে, বলতো? নিজে ঘর সংসার কখনো করিনি, তোদের সংসার থেকে পরপর তিন পুরুষের সেবা করলাম। সংসারের সাধ আমার কিছু নেই। আমি শুধু দিন গুনছি মা-জগদম্বার কৃপার আশায়। আর ভাবছি,—আমার গুরু বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের সাধনা মিথ্যে হবার নয়, যে প্রত্যাদেশ তিনি কামাক্ষ্যাধামে পেয়েছিলেন, আজ তা সফল হতে যাচ্ছে। এ কাজে আমার এই নগণ্য, জরাজীর্ণদেহটাকে উৎসর্গ করতে পারবো—এ যে আমার মহাভাগ্য রে।"

এত কথার পরেও সর্ব্বানন্দের মন সরে না। নীরবে, নত মস্তকে দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকেন, একি অদ্ভুত প্রস্তাব! কোন প্রাণে পরম প্রিয় পুণাদাদার মৃত্যু ঘটাইবেন? বাল্যবধি যাঁহাকে সখা, সুহৃদ ও আশ্রয়রূপে দেখিয়া আসিতেছেন, কি করিয়া তাঁহার জীবননাশের কারণ তিনি আজ হইবেন?

দৃঢ়স্বরে পূর্ণানন্দ কহিলেন, "যে অভীষ্ট সাধনের জন্য বাসুদেব ঠাকুর প্রাণপাত করে গেলেন, একবার তা ভেবে ছাখ। স্মরণ কর, তোর গুরুর আদেশের কথা। আমার কথাটাও একটু ভাববি। ওরে, আমার শেষ আশা সফল করার দায়িত্ব যে রয়েছে তোরই হাতে। এটাও জেনে রাখিস, এ দেহ যদি মায়ের আবাহনের কাজে না লাগে, তবে আজ রাতেই ডাকাতে-নদীর জলে আমি তা বিসর্জ্জন দেবো।"

এ ব্যবস্থা মানিয়া না নিয়া সর্ব্বানন্দের আর গত্যন্তর রহিল না। স্বপ্নাবিষ্টের মত তিনি সাধনভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন।

কাজ শুরু করার আগে পূর্ণানন্দ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন, "দেখ, জন্মজন্মান্তরের তপস্যায় এ সুযোগ তোর এসেছে। খুব সাবধান! মনে ভয়, ভ্রান্তি, লোভ একটু ঢুকলেই কিন্তু আর রক্ষে নেই। বীরাচারী

সাধনার পথে সূক্ষ্মলোকচারী শক্তিরা দেখাবে ভয় আর প্রলোভন। একটুও টলবিনে। অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া অবধি একান্ত নিষ্ঠায় চালিয়ে যাবি ধ্যান জপ। আর একটা কথা। মা আবির্ভূতা হয়ে যদি কোন বর চাইতে বলেন, বলবি,—সে সব পুণাদাদা জানে।"

গভীর নিশীথে বিগতপ্রাণ চণ্ডাল দেহের উপর সর্ব্বানন্দ আসন করিয়া বসেন, জপে নিবিষ্ট হন। ধীরে ধীরে শুরু হয় গুরুদত্ত মন্ত্রের চৈতন্যময় ক্রিয়া। ধ্যান ক্রমে গাঢ়তর হইতে থাকে। একে একে শক্তিসাধনার উচ্চতর স্তরগুলি তিনি ভেদ করিয়া চলেন।

রাত্রি আরো গভীর হয়। মাতৃধ্যানে সর্ব্বানন্দ একেবারে বিভোর। কোন বাহ্যজ্ঞানই তাঁহার নাই। সহসা নৈশ স্তব্ধতার বুক চিরিয়া বাহির হয় কাহাদের ঐ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ? এ আর্ত্তনাদের রেশ মিলাইতে না মিলাইতেই সাধনক্ষেত্রটি ঘিরিয়া তাঁহার চারিদিকে শুরু হয় পৈশাচিক তাণ্ডব। বিকট চীৎকারে কর্ণপটাহ ছিঁড়িয়া যাইতে চায়। মড়মড় শব্দে কাহারা ভাঙিতে থাকে বৃক্ষশাখা? লণ্ডভণ্ড করে সারা অরণ্য? ভূত, প্রেত, পিশাচ আর ডাকিনী দলের, একি বীভৎস দাপাদাপি, উল্লাস, আর অট্টহাসি—হি-হি-হি!

পুণাদার সতর্কবাণী মনে আছে সর্ব্বানন্দের। একৈকনিষ্ঠায় তিনি মহামন্ত্র জপ করিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে বীর সাধকের কণ্ঠ হইতে নির্গত হয় 'মা—মা' আরাব। পৈশাচিক নৃত্যতাণ্ডব ও হট্টগোল ছাপাইয়া এ আরাব চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া তোলে।

একি! আবার কাহার ইন্দ্রজালবলে মুহূর্ত্তে এ দৃশ্য হয় পরিবর্ত্তিত? মুনিজনমোহিনীরূপে অন্তরীক্ষ হইতে নামিয়া আসে অপ্সরা কিন্নরীর দল। হাস্য লাস্য কৌতুকে তাহারা বারবার প্রলুব্ধ করিতে চায়। কিন্তু বীর সাধক সর্ব্বানন্দকে তাহারা টলাইতে পারে কই? ভোজবাজীর মত আবার সব কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

এক একবার শোনা যায় আকাশজোড়া মেঘের বজ্রগর্জ্জন। মাথার

উপরে কড়-কড়াৎ শব্দে ফাটিয়া পড়ে অশনি। সারা প্রকৃতি আজ কি খণ্ডপ্রলয়ের মারণ-মহোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে? সর্ব্বানন্দের কিন্তু কোন কিছুর দিকেই দৃষ্টি নাই। তিনি নির্ব্বিকার।

নিবিড় আঁধারে সমাবৃত নৈশ আকাশে হঠাৎ কখন আবার ফুটিয়া উঠে প্রত্যুষের আলোকচ্ছটা। কানে আসে পাখীর কাকলী, জেলেডিঙির ছপাৎ ছপাৎ শব্দ। অদূরে ডাকাতিয়া নদীতে ধীবরেরা রাত্রিশেষে মাছ ধরিতে যাইতেছে। সেকি! ইহারই মধ্যে প্রভাত আসিয়া গেল? তবে কি সাধনা তাঁহার আজ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত? তবে কি তাঁহার দুর্ব্বল সাধন-আধারে গুরুশক্তি কার্য্যকরী হয় নাই?

সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রজপের মধ্য দিয়া আসে সত্যের ঝিলিক। উপলব্ধি করেন—এ সবই মায়ার কুহকজাল। নিশাবসানের এখনো অনেক দেরী আছে। অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন অস্ফুটস্বরে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়া দেয়, 'ওরে ভয় নেই! রাখিস্‌নে কোন সংশয়। মায়ের আসন নড়ে উঠেছে তোর সাধনার বলে। নিশাবসানের আগেই যে তাঁকে আবির্ভূত হতে হবে, দিতে হবে কৃপা-প্রসাদ।'

প্রাণহীন চণ্ডালদেহের আসন হঠাৎ কখন চঞ্চল হইয়া ওঠে। দন্ত কিড়মিড় করিয়া মৃত সবলে উত্থিত হইতে চায়। অকুতোভয় সর্ব্বানন্দ সজোরে চাপিয়া বসিয়া থাকেন, জগন্মাতার দর্শন না পাওয়া অবধি প্রাণ গেলেও তিনি এ ধ্যানাসন ছাড়িবেন না।

নিজের সর্ব্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া মায়ের উদ্দেশে তাহা করিতেছেন নিবেদন। ধ্যানের ধারা বহিয়া চলিয়াছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।

একটির পর একটি উপস্থিত হইতে থাকে দৈবী পরীক্ষা। তীব্রবেগে ছুটিয়া আসে মায়াশক্তির এক একটি তরঙ্গাভিঘাত। আর বীর সাধকের সাধন-প্রাকারে প্রতিহত হইয়া বারবারই তাহা ফিরিয়া যায়।

সর্ব্বানন্দের শক্তিসাধনা এবার সিদ্ধির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র সত্তায় উপচিয়া উঠিয়াছে চরম উল্লাস। ঐ যে; মায়ের পদধ্বনি তিনি শুনিতে পাইতেছেন।

সহসা দিব্য জ্যোতির ছটায় বনভূমি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর এই জ্যোতিঃরাশি ঘনীভূত হইয়া রূপ পরিগ্রহ করিল সর্ব্বানন্দের ধ্যেয় ইষ্টমূর্ত্তিতে। ষোড়শী মহাবিদ্যারূপে জগজ্জননী এবার তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। সিদ্ধকাম সাধক আসন হইতে ব্যুত্থিত হইয়া মায়ের চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িলেন।

প্রণাম নিবেদনের পরক্ষণেই দেখা দেয় তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য রূপান্তর! নিরক্ষর সাধনভজনহীন সর্ব্বানন্দের মুখ দিয়া অনর্গলভাবে উদ্গীত হইতে থাকে অনুপম স্তবগাথা, দরদরধারে ঝরিয়া পড়ে প্রেমাশ্রুর ধারা।

সুধামাখা কণ্ঠে মা কহিলেন, "বৎস সর্ব্বানন্দ, তোমার ওপর আমি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

সর্ব্বানন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। করজোড়ে গদগদ ভাষে কহিলেন, "জননী, আজ আমি তোমার দেব-বাঞ্ছিত চরণকমল দর্শন করেছি। সর্ব্ব অভীষ্ট আমার পূর্ণ হয়েছে। জীবনে আর তো কোন কামনাই আমার নেই।"

"বৎস, আজ তুমি আমার কাছে কিছু চেয়ে নাও।"

"মা, বর যদি দিতেই হয়, তবে আমার পুণাদাদাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর, তাঁর প্রার্থিত বর প্রদান কর। ঐ ছাখো, শব হয়ে সে তোমার সম্মুখে ভূতলে লোটাচ্ছে।"

দেবীর নয়নসম্পাতে তখনি পূর্ণানন্দের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল। সুপ্তোত্থিতের মত তিনি উঠিয়া বসিলেন। বহু স্তব স্তুতির পর প্রার্থনা করিলেন, "মাগো, করুণা করে যদি আবির্ভূতই হয়েছো, তবে এ তুই দাসানুদাসকে তোমার দশমহাবিদ্যারূপ প্রদর্শন কর।"

ভক্তদ্বয়ের নয়ন সমক্ষে একের পর এক প্রকাশিত হইল মহাদেবীর এই লীলাময়ীরূপ।

জগজ্জননী এবার কহিলেন, "বৎস পূর্ণানন্দ, আর কি মনোবাঞ্ছা তোমার রয়েছে, আমায় বল।"

"মা, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমার এই প্রভুবংশে, তোমার বীর-পুত্র

সর্ব্বানন্দের বংশে তোমার পাদপদ্মে ভক্তি যেন অচলা থাকে। আর, আজকের এই সাধনপীঠ কখনো যেন দূষিত না হয়। আরো একটা নিবেদন আছে আমার। জমিদার জটাধরের সভায় সর্ব্বানন্দ মূর্খের মত বলে ফেলেছে, আজ পূর্ণিমা তিথি। তোমার ভক্তের মর্য্যাদা তোমাকেই রক্ষা করতে হবে মা। অমাবস্যা নিশির এখন শেষ যাম। আমার একান্ত প্রার্থনা, মেহারের অন্ধকারময় আকাশকে আজ তুমি পূর্ণচন্দ্রের প্রভায় আলোকিত করে তোল।”

ভক্তবৎসলা দেবী প্রসন্নমধুর কণ্ঠে কহিলেন, “তথাস্তু”।

কথিত আছে, সেদিনকার অমানিশায় পূর্ণিমার আলোক-উদ্ভাসন দেখিয়া মেহার-এ চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। এই অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া জমিদার জটাধর সর্ব্বানন্দের সাধনা ও সিদ্ধির কথা, সর্ব্ববিদ্যায় তাঁহার পারঙ্গম হওয়ার কথা জানিতে পারেন। অনুতপ্ত হৃদয়ে বারবার তিনি তাঁহার মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন।

সর্ব্বানন্দের সুপণ্ডিত পুত্র, শিবনাথ তাঁহার রচিত গ্রন্থ ‘সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিনী’তে পিতার সাধনা ও সিদ্ধির তথ্যাদি পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, পৌষ সংক্রান্তির অমাবস্যা রাত্রে দেবীর দর্শন ও কৃপা সর্ব্বানন্দ লাভ করেন। আর এই দর্শনের মধ্য দিয়া তাঁহার সাত জন্মের তপস্যা সার্থক হইয়া উঠে। *১

সর্ব্বানন্দ কোন বৎসরে সিদ্ধ হন তাহা একটি বহু-আলোচিত প্রশ্ন তন্ত্রতত্ত্বের প্রসিদ্ধ গবেষক, মনীষী স্যর জন উড্‌রফ্‌ এ সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নরূপ :

*১ ‘সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিনী’-র রচয়িতা শিবনাথ তাঁহার গ্রন্থে সর্ব্বানন্দের ভাগিনেয় ও অনুগামী সাধক ষড়ানন্দের এক উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, সর্ব্বানন্দ পূর্ব্বেকার সাত জন্মে সিদ্ধির জন্য কঠোর তপস্যা করেন এবং ব্রহ্মময়ীর দর্শনলাভের জন্য নীলাচল, বিন্ধ্যগিরি, সিন্ধুশৈল, বদরিকাশ্রম, গঙ্গাসাগর, বারাণসী ও কামাক্ষ্যায় কৃচ্ছ্রসাধনে দেহপাত করেন।

তন্ত্রসাধক সর্ব্বানন্দের সিদ্ধিদিবস নির্ণয়ে সাহায্য করার জন্য শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাকে এক হিসাব দিয়াছেন। এই হিসাবমতে, তাঁহার সিদ্ধিদিবসটি ছিল কোন এক বৎসরের পৌষ সংক্রান্তি, শুক্রবার, চতুর্দ্দশী বা অমাবস্যা তিথি। পুরাতন পঞ্জিকা অনুসন্ধানে দেখা যায়, বারো শত হইতে সতের শত খৃষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বার ও তিথির মিলন ঘটিয়াছিল মাত্র তিনটি পৌষ সংক্রান্তিতে। এই সংক্রান্তিগুলি পড়িয়াছে ১৩৪২, ১৪২৬ এবং ১৫৪৮ সালে।

সর্ব্বানন্দের বংশাবলীর কালের যে হিসাব রহিয়াছে, তাহার সহিত প্রথমোক্ত সালটি একেবারেই মিলে না। শেষোক্তটিও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, কুলপঞ্জী অনুসারে প্রমাণিত হয়—সর্ব্বানন্দের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ জানকীবল্লভ গুর্বাচার্য্য ছিলেন বারভূঁইয়ার সমকালীন। কাজেই আমরা ১৪২৬ খৃষ্টাব্দকেই সর্ব্বানন্দের সিদ্ধির তারিখ বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি এবং এই সিদ্ধান্তই সমীচীন। *১

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নানা প্রমাণপঞ্জী আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, সর্ব্বানন্দ ১৪২৬ অথবা ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তপস্যায় সিদ্ধকাম হন। তাঁহার মতে, মেহার-এর এই বহুখ্যাত তান্ত্রিক সাধক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। *২

সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সর্ব্বানন্দের খ্যাতি এবার চারিদিকে বিস্তারিত হইতে থাকে। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ এবং মনীষীরূপেও পণ্ডিত সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন। মেহার জমিদার ভবনে এখন তাঁহার সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির সীমা নাই।

সাংসারিক ক্ষেত্রের এই যশ, মান ও ঐশ্বর্য্যের বিস্তার কিন্তু

---

*১ স্যার জন উড্রফ্-এর 'শক্তি অ্যাণ্ড শাক্ত', তৃতীয় খণ্ড।

*২ সর্ব্বানন্দের 'সর্ব্বোল্লাস তন্ত্র' (ভূমিকা: অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

মহাসাধকের মনে কোন ভাবান্তর আনিতে পারে নাই। এখন হইতে নিস্পৃহ ও নির্ব্বিকার জীবনই তিনি যাপন করিতে থাকেন।

কিছুদিন পরের কথা। শীতকাল প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। মেহার-এর জমিদার সে-বার পশ্চিম অঞ্চল হইতে কয়েকখানা বহুমূল্য শাল আনাইয়াছেন। ইহা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শালখানি বাছিয়া নিয়া তিনি শ্রদ্ধাভরে সর্ব্বানন্দকে দান করিলেন।

জমিদার ভবন হইতে সর্ব্বানন্দ সেদিন নিজের গৃহে ফিরিতেছেন। কাঁধের উপর মনোরম শালখানি বিলম্বিত রহিয়াছে। বাজারের পথে মোড় ঘুরিতেই সম্মুখে পড়িল এক বারাঙ্গনা।

সর্ব্বানন্দকে এ অঞ্চলের সবাই চেনে; শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমও যথেষ্ট করে। মেয়েটি আবদারের সুরে কহিল, "বাঃ বাবাঠাকুরের শালটি দেখছি বড় চমৎকার। তা শীত তো আমাদেরও করছে। কিন্তু এমন শাল আর ভাগ্যে জুটছে কই?"

সর্ব্বানন্দ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "বেশ তো, মা। ইচ্ছে যখন হয়েছে, নিয়ে নে তুই এটা।"

শালখানি তখনি অবলীলায় তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া তিনি গৃহে চলিয়া আসিলেন।

এ সংবাদ প্রচারিত হইতে দেরী হইল না। সেই দিনই নানা ভাবে পল্লবিত হইয়া ইহা জমিদারের কানে গেল। ক্রোধে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। কি! এতদূর স্পর্দ্ধা পণ্ডিত সর্ব্বানন্দের! তাঁহার উপহার দেওয়া শাল কি না বাজারের এক বারবনিতাকে তিনি দিয়াছেন! হোন না তিনি বড় সাধক, তাই বলিয়া জটাধর এ অপমান সহ্য করিবেন না—কিছুতেই না। এ অঞ্চলের ভূম্যধিকারী তিনি, তাঁহার নিজের একটা মান সম্ভ্রম আছে।

সর্ব্বানন্দ ঠাকুরকে তখনি ডাকাইয়া আনা হইল। জমিদার ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "ঠাকুর, দেখছি আপনার স্পর্দ্ধা একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কত সমাদর করে দামী শালখানি আমি আপনাকে দিয়েছিলাম,

তা কোথায় রেখেছেন বা কাকে দিয়েছেন, শীগ্‌গির বলুন।"

কোন কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিবার আগেই সর্ব্বানন্দের মুখ দিয়া সহসা বাহির হইল, "ঘরেই তা রয়েছে। আছে গৃহিণীর কাছে।"

জটাধর ক্রোধে এবার ক্ষিপ্তপ্রায়। এই বুঝি সিদ্ধ সাধকের সত্যনিষ্ঠা! উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "খুব ভাল কথা। এক্ষুনি সে শালখানা আনিয়ে দিন তো। আমার প্রয়োজন আছে।"

জগন্মাতার দর্শনলাভের পর হইতেই সর্ব্বানন্দ যেন তাঁহার কোলের সন্তানটি হইয়া গিয়াছেন! মায়ের উপর সব কিছু ছাড়িয়া দিয়া সিদ্ধ সাধক একান্তভাবে হইয়াছেন মাতৃনির্ভর। নিজে তিনি যন্ত্র আর তাঁহার যন্ত্রী হইতেছেন মা!

কেন যে হঠাৎ তিনি বলিলেন—শালখানা স্ত্রীর কাছে রহিয়াছে, তাহা তাঁহার নিজেরই বোধগম্য হইতেছে না। ভিতর হইতে কে যেন এ সঙ্কট সময়ে তাঁহার মুখ দিয়া একথা বলাইয়া দিল।

ইষ্টদেবীই এ বিপদে ভরসা। তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়া সর্ব্বানন্দ ভাগিনেয় ষড়ানন্দকে নিকটে ডাকাইলেন, কহিলেন "ওরে এক্ষুনি একবার বাড়ীতে যা। তোর মামীমার কাছ থেকে আমার নূতন শালখানা চেয়ে আন।"

ষড়ানন্দকে তাড়াতাড়ি মাতুল ভবনে ছুটিতে হইল। সর্ব্বানন্দের শয়নকক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া মাতুলানী বল্লভা দেবীকে কহিলেন, "মামার নূতন শালখানা এখনি চাই, দিন। বড় তাড়াতাড়ি।"

বল্লভা দেবী কিন্তু তখন ঘরে নাই, নিকটেই প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়াছেন। এদিকে ষড়ানন্দ শালের জন্য চেঁচাইতেছেন।

হঠাৎ ঘরের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। বাহির হইল একখানি সুডৌল চম্পকবরণ হাত, দিব্য জ্যোতি তাহা হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে কারুশিল্পখচিত মূল্যবান শালটি ষড়ানন্দের দিকে নিক্ষেপ করিয়াই হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ষড়ানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তাইতো। এ কি! এ হাত তো তাঁহার

মামীমার নয়। 'মামীমা—মামীমা' বলিয়া চীৎকার করিয়া তিনি শয্যা-গৃহে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিন্তু কই, কোথাও তো কেহ নাই।

ইতিমধ্যে বল্লভা দেবী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনিও তেমনি অবাক। শালের খবর কিছুই জানেন না। তাছাড়া, তিনি এতক্ষণ এখানেই ছিলেন না।

ষড়ানন্দ বুঝিলেন, এ কাণ্ড লীলাময়ী মা মহামায়ার। প্রিয় পুত্র সর্ব্বানন্দের মান সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্যই তাঁহার এই অলৌকিক আবির্ভাব। মায়ের অপার করুণার কথা ভাবিতে ভাবিতে ষড়ানন্দের দুই নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

শাল নিয়া মাতুল সর্ব্বানন্দের কাছে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে জমিদার জটাধরও পাইক পাঠাইয়া বারবনিতার গৃহ হইতে সেই শালখানি উদ্ধার করিয়া আনাইয়াছেন।

কিন্তু একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! দুইখানি শালই যে হুবহু এক রকম। কোনটি যে তিনি সর্ব্বানন্দকে দান করিয়াছিলেন তাহা তো কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না!

এতক্ষণে জমিদার মহাশয়ের চৈতন্যোদয় হইল। বুঝিলেন, প্রিয় পুত্রের মর্য্যাদা রাখিতে জগজ্জননী নিজেই আজ আসিয়াছিলেন।

অনুশোচনায় জটাধরের সারা অন্তর ভরিয়া উঠিল। শাক্তধর সাধকের কাছে বারবার তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মেহার-জীবনের পরিবেশ কিছুদিন হইতেই সর্ব্বানন্দের তেমন ভালো লাগিতেছিল না। এই ঘটনার পর বিরক্তি তাঁহার আরো বাড়িয়া গেল। স্থির করলেন, এখানে আর নয়, দেশ ছাড়িয়া এবার কাশীবাসী হইবেন। নীরব সাধনার মধ্য দিয়া বাকী জীবনটা সেখানেই কাটাইয়া দিবেন। কিন্তু একি অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত! আত্মপরিজন ও ভক্তদের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। যুক্তিতর্ক, আবেদন, ক্রন্দন সব কিছুই হইয়া গেল ব্যর্থ। সর্ব্বানন্দ অবিচল রহিলেন।

পত্নী বল্লভা দেবীর নয়ন ছুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন, "ওগো, তুমি এমন উতলা হয়ো না। ভয় নেই। শীগ্‌গিরই তুমি মুক্তি লাভ করবে। আজ আর কান্নাকাটি করে অমঙ্গল ডেকে এনো না।"

পুত্র শিবনাথ মর্ম্মাহত হইয়া নীরবে বসিয়া আছেন। সর্ব্বানন্দ সস্নেহে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আশ্বাস দিলেন। তারপর কর্ণে দিলেন শক্তি সাধনার সিদ্ধমন্ত্র।

ভক্ত, অনুরাগী ও দর্শনার্থীদের একে একে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া চিরতরে মেহার ছাড়িয়া তিনি রওনা হইলেন। সঙ্গে চলিল বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভৃত্য পূর্ণানন্দ আর প্রিয় ভাগিনেয় ষড়ানন্দ। এ সময় সর্ব্বানন্দের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর।

বারাণসীর দিকে চলিতে চলিতে সেদিন তাঁহারা যশোহরের অন্তর্গত সেনহাটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। যশোহর-রাজ্যের দ্বারপণ্ডিত, প্রবীণ তন্ত্রাচার্য্য চন্দ্রচূড় আগমবাগীশের বাসস্থান এইখানে। সর্ব্বানন্দ ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন, আগমবাগীশ মহাশয়ের গৃহে তন্ত্রশাস্ত্রের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের এক মূল্যবান সঞ্চয় রহিয়াছে। ভাবিলেন, কাশীধামে যাওয়ার আগে আগমশাস্ত্রের ছুই একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া নিলে মন্দ কি? কিন্তু দশ বিশ দিনে একাজ সম্পন্ন হইবে না। এজন্য অন্ততঃ কয়েকমাস সেনহাটিতে তাঁহার থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আগমবাগীশের গৃহেই তিনি আশ্রয় নিলেন।

আত্মপরিচয় দিলে অসুবিধা অনেক। কারণ, মেহার-এ সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বানন্দের নাম তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেনহাটিতে তিনি রহিয়াছেন জানিলে, লোকে অনর্থক ভীড় বাড়াইবে। কাজেই নিজের পরিচয় তাঁহাকে এসময়ে গোপন করিতে হইল। সকলে জানিল, আগম শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য পূর্ব্বাঞ্চলের এক শিক্ষার্থী রাজপণ্ডিতের কাছে আসিয়া বাস করিতেছে।

ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে। হঠাৎ সেদিন যশোহর রাজসভায় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। তাল ঠুকিয়া এই পণ্ডিত চন্দ্রচূড় আগমবাগীশকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানাইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনটি যতই আগাইয়া আসিতেছে রাজপণ্ডিত ততই ভীত হইয়া পড়িতেছেন। এ বৃদ্ধ বয়সে আজকাল মাঝে মাঝে তাঁহার স্মৃতি বিভ্রম দেখা যায়। পরাজিত হইয়া কি শেষটায় লোক হাসাইবেন? এ বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায়ই তিনি ভাবিয়া পান না।

আগমবাগীশের উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা সর্ব্বানন্দ লক্ষ্য করিয়াছেন। মন তাঁহার সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। তাইতো, আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ পণ্ডিতকে এবার রক্ষা না করিলে তো আর চলে না।

সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি এই তর্কযুদ্ধ নিয়ে কোনই দুশ্চিন্তা করবেন না। এ সম্পর্কে যা কিছু করবার আমিই করছি। আমিই দিগ্বিজয়ীর সম্মুখীন হবো।"

"সে কি বাবা! সে যে এক দিক্‌পাল পণ্ডিত। তাঁকে তুমি কি করে পরাস্ত করবে? এযে অসম্ভব কথা।"

"আমার কথায় বিশ্বাস করুন, সত্যিই এ নিয়ে আপনার ভাবনা করার কিছু নেই। জগজ্জননীর প্রসাদে এ অসম্ভব সম্ভব হবে। আপনি রাজসভায় আজই জানিয়ে দিন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আগে আপনার ছাত্র সর্ব্বানন্দের সঙ্গে বিচারে জয়ী হোন, তারপর প্রয়োজন হলে আপনি সভায় অবতীর্ণ হবেন।"

রাজসভায় এই প্রস্তাব জানাইয়া দেওয়া হইল। সেইদিনই রাত্রে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এক স্বপ্ন দেখিলেন—জগন্মাতা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "ওরে, তোর সাহস তো দেখছি কম নয়। আগমবাগীশের ছাত্র, মেহার-এর সর্ব্বানন্দের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে এগিয়েছিস! সে যে সিদ্ধপুরুষ, আমার কৃপাপ্রসাদ পেয়ে হয়েছে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ। তাকে পরাস্ত করার আশা ত্যাগ কর।"

পরদিন প্রত্যুষেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

যাইবার আগে বলিয়া গেলেন,—দেবীর বলে বলীয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুঝিবার মত শক্তি তাঁহার নাই।

চন্দ্রচূড় আগমবাগীশ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সর্ব্বানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন তাঁহার ভরিয়া উঠিল।

দিগ্বিজয়ীর স্বপ্নের কথা তাঁহার কানেও গিয়াছে। তবে তো, মেহার-এর বহুখ্যাত সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বানন্দই আত্মগোপন করিয়া আছেন তাঁহার গৃহে। এ যে তাঁহার মহাভাগ্য!

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের মনে এক আশার আলো উঁকি দিতে থাকে। সর্ব্বানন্দকে কি স্থায়ীভাবে তাঁহার গৃহে রাখা যায় না? নিজের এক বিবাহযোগ্যা কন্যা রহিয়াছে, যেমন করিয়াই হোক, এ কন্যাকে তিনি সর্ব্বানন্দের হাতে সম্প্রদান করিবেন।

সর্ব্বানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি আজ আমার মানসম্ভ্রম রক্ষা করেছো। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও, সর্ব্বত্র জয়ী হও।"

পরিচয় প্রকাশ পাইয়া গিয়াছে, এবার আর এখানে থাকা যায় না। সর্ব্বানন্দ উত্তরে কহিলেন, "আপনার আশিস পেয়ে কৃতার্থ হলাম। আজ আমার একটা নিবেদন আছে। এতদিন আপনার গৃহে থেকে আগম-শাস্ত্রের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ আলোচনা করেছি, তাতে যথেষ্ট লাভবানও হয়েছি। এবার আমায় বিদায় দিন, আমি কাশীধামের দিকে যাবো। সেখানে যাবার সঙ্কল্প নিয়েই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি।"

"বাবা, আমায় তুমি শিক্ষক বলে এতদিন মেনে নিয়েছিলে। কিন্তু গুরুদক্ষিণা দিলে কই?"

"বেশতো। আজ্ঞা করুন, কি দক্ষিণা আমি দেব।"

"আমার কন্যা স্বয়ংপ্রভা বর্ত্তমানে বিবাহযোগ্যা হয়েছে। সর্ব্বাংশে সে তোমার উপযুক্ত। তাকে তুমি গ্রহণ কর। এখানে আমার গৃহে নূতন করে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করতে থাক। তুমি এতে রাজী হও, তবেই আমার গুরুদক্ষিণা পাওয়া হবে।"

সর্ব্বানন্দ নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। একি পরীক্ষায়

মহামায়া আজ তাঁহাকে ফেলিলেন। গুরুদক্ষিণা দানের প্রতিশ্রুতি নিজেই দিয়া বসিয়াছেন, তাহা পালন না করিলে ধর্ম্মে পতিত হইবেন। আবার কাশীতে না গেলেও, নিভৃত সাধনার যে সঙ্কল্প নিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইবে না। তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারের জন্য যে গ্রন্থাদি রচনার পরিকল্পনা রহিয়াছে, এবার তাহাও বুঝি বান্‌চাল হইয়া যায়।

সর্ব্বানন্দের সমস্যার কথা বুঝিয়া নিতে চন্দ্রচূড় আগমবাগীশের দেরী হয় নাই। তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "বাবা, এখানে থাকলে তোমার সাধনার কোন বিঘ্ন হবে বলে আমি মনে করিনে। আমাদের বংশ প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক বংশ। আমার কন্যাকে তুমি শক্তিরূপে গ্রহণ কর। আরও একটা কথা। তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় ক্রিয়া ও সাধন পদ্ধতির কথাই শুধু লোকে জানে, দূর থেকে ভয় পেয়ে সরে থাকে। তুমি এ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি রচনা করে লোকের কল্যাণ সাধন কর। এখানে থাকলে তোমার এ কাজের সাহায্যই হবে।"

সর্ব্বানন্দকে আগমবাগীশের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেই হইল। অতঃপর এখানে থাকিয়া নিজেকে তিনি সাধন ভজন ও গ্রন্থরচনার কাজে ঢালিয়া দিলেন। এই সময়েই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সর্ব্বোল্লাস তন্ত্র'-এর রচনা সমাপ্ত হয়। বিবিধ তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া মূল্যবান তথ্যাদি তিনি ইহাতে সন্নিবেশিত করেন।

'নবার্ণব পূজা পদ্ধতি' ও 'ত্রিপুরার্চ্চন দীপিকা' নামক দুইটি তন্ত্রগ্রন্থও তাঁহার রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য এখনো নির্ণীত হয় নাই। প্রথম গ্রন্থটির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি কাশ্মীরের রঘুনাথ মঠে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয়টি মধ্যভারত হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

সেনহাটিতে কয়েক বৎসর বাস করার পর সর্ব্বানন্দের একটি পুত্রসন্তান জন্মে।* তাঁহার নামকরণ করা হয় শিবানন্দ। এবার আর

* সর্ব্বানন্দের পুত্রদ্বয় শিবনাথ ও শিবানন্দের সন্তান-সন্ততিগণ উত্তর-কালে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। ইহারা সর্ব্ববিদ্যার বংশ

সর্ব্বানন্দকে সেনহাটিতে ধরিয়া রাখা সম্ভব হইল না। অনুচর পূর্ণানন্দ ও ভাগিনেয় ষড়ানন্দকে সঙ্গে নিয়া পদব্রজে তিনি কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখনকার দিনে কাশীর গণেশ মহল্লার সারদা মঠের খ্যাতি শুনা যাইত।* অনেকের মতে আচার্য্য শঙ্কর ছিলেন ইহার স্থাপয়িতা। এই মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভদ্রকালীর বিগ্রহ দর্শন করিয়া সর্ব্বানন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। এই জাগ্রত বিগ্রহের সান্নিধ্যে, এই মন্দিরেই তিনি অবস্থান করিতে থাকেন।

মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি সহযোগে সর্ব্বানন্দ মায়ের আরাধনা করেন, চক্রানুষ্ঠান করেন। কাশীর শৈব ও দণ্ডী সন্ন্যাসীরা সেদিন ইহা মোটেই সুচক্ষে দেখেন নাই। এই নবাগত তান্ত্রিক সাধককে বিতাড়নের জন্য তাঁহারা তৎপর হইয়া উঠেন।

কাশীতে বরাবরই তন্ত্রসাধকের সংখ্যা বড় অল্প, শৈব ও বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠাই এখানে বেশী। ইঁহাদের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বানন্দ কি করিতে পারেন? তাছাড়া, এই

বলিয়া বিখ্যাত। ত্রিপুরা, নোয়াখালি, যশোহর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে এই বংশধারা বিস্তৃতি লাভ করে, বাংলার বহু অভিজাত পরিবারের দীক্ষাগুরুরূপে ইঁহারা সম্মানিত হইয়া উঠেন। এই বংশে বহু শক্তিমান সাধক ও খ্যাতনামা গ্রন্থকারেরও আবির্ভাব হইয়াছে।

সর্ব্বানন্দের অধস্তন পঞ্চমপুরুষে, এই বংশে তন্ত্রসিদ্ধ সাধক জানকীবল্লভ গুর্বাচার্য্যের জন্ম হয়। বিক্রমপুরের রাজা কেদার রায় ইঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সাধক গুর্বাচার্য্যের অলৌকিক শক্তি বিভূতি সম্বন্ধে আজও নানা কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। কথিত আছে, একবার তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যদের মনে প্রত্যয় জাগাইয়া তোলার জন্য এই শক্তিধর সাধক মৃত্তিকা নির্ম্মিত শ্যামা-বিগ্রহের চরণে কুশের আঘাত দ্বারা রক্ত নিঃসৃত করাইয়াছিলেন।

* পরবর্ত্তীকালে ইহা রাজগুরু-মঠ নামে পরিচিত হইয়া উঠে।

শহরে তিনি নূতন আসিয়াছেন, কোন সহায়সম্পদও তাঁহার নাই।

. দণ্ডীদের ষড়যন্ত্র ও নির্য্যাতন কিন্তু বাড়িয়াই চলিল। শেষকালে আর কোন উপায় না দেখিয়া সর্ব্বানন্দ তাঁহার শক্তি বিভূতি প্রয়োগ করিলেন। কথিত আছে, উগ্রপন্থী দণ্ডীরা এই সময়ে যখনি আহারে বসিতেন তখনি দেখা যাইত, কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে তাঁহাদের ভোজনপাত্রের উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছে মৎস্য মাংস ইত্যাদি বামাচারী আহার্য্য। একাধিকবার এভাবে নিগৃহীত হওয়ার পর বিরুদ্ধবাদী সন্ন্যাসীরা সর্ব্বানন্দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন।

এ ঘটনার পর হইতে যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া সর্ব্বানন্দের খ্যাতি কাশী অঞ্চলে প্রচারিত হইতে থাকে। ত্রিতাপদগ্ধ বহু নরনারী এ সময়ে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন। সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন অবধূত-মহারাজ নামে।

সর্ব্বানন্দ কতদিন কাশীধামে অবস্থান করেন সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু জানা যায় না। তাঁহার উত্তরসাধক পূর্ণানন্দ এবং ষড়ানন্দের জীবন-তথ্যও সাধারণের কাছে অজানা রহিয়াছে।

দীর্ঘকাল লোকালয়ে বসবাস করার পর প্রবীণ সাধক সর্ব্বানন্দ বাহির হইয়া পড়েন হিমালয়ের পথে। কাশীর ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে বিদায় নিয়া বদরিকাশ্রম অভিমুখে তিনি অগ্রসর হন।

পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে এই সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনে নামিয়া আসে রহস্যঘন কুহেলিকার আবরণ। তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনার নিগূঢ়তম ক্রিয়া সমূহ উদ্‌যাপনের জন্য গুরুর নির্দ্দেশে তিনি আত্মগোপন করেন। শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধি ও যোগৈশ্বর্য্য হয় তাঁহার করতলগত।

শক্তিসাধনার বিশিষ্ট তথ্যানুসন্ধানী স্যার উড্‌রফ্ কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব উল্লেখিত গ্রন্থে মহাসাধক সর্ব্বানন্দের শেষ জীবনের কথাপ্রসঙ্গে এক চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন—

"জনশ্রুতি রহিয়াছে যে, সর্ব্বানন্দ এখনও—এই কয়েক শত বৎসরের

ব্যবধানেও, কায়ব্যূহ যোগাভ্যাসের সাহায্যে জীবিত আছেন, আর সিদ্ধ সাধকদের অধ্যুষিত কোন পবিত্র ও গুপ্ত সাধনপীঠই এখন হইয়াছে তাঁহার আশ্রয়স্থল। ইতিপূর্ব্বে আমার কোন বিশ্বস্ত সংবাদদাতার সহিত এক বিশিষ্ট সিদ্ধপুরুষের সাক্ষাৎ ঘটে। এই সিদ্ধপুরুষটি তাঁহাকে জানান যে, কিছুকাল পূর্ব্বে চম্পকারণ্যে ক্রমাগত কয়েকমাস ধরিয়া মহাতান্ত্রিক সর্ব্বানন্দের সহিত তাঁহার দেখাশুনা হইয়াছিল। ইহার পর পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধপুরুষ স্থানান্তরে চলিয়া যান, কাজেই সর্ব্বানন্দের আর কোন সংবাদ তাঁহার পক্ষে রাখা সম্ভব হয় নাই।”

শক্তিসাধনার চরম স্তরে পৌঁছিয়া মহাতান্ত্রিক সর্ব্বানন্দ তাঁহার জীবনের চারিদিকে যে রহস্যঘন যবনিকা টানিয়া দেন, আজিও তাহা অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়া গিয়াছে।

নানক

নানককে নিয়া কালু বেদী এক মহা দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন। বংশের একমাত্র পুত্র সে, সকলেরই আশা-ভরসা। কিন্তু ঘরসংসারে তাঁহার একটুকুও মন নাই, নাই লেখাপড়ায় কোন মনোযোগ। ক্ষেত খামার সামান্য কিছু আছে, কিন্তু তাহাতে কুলাইয়া উঠে কই? কালু বেদীকে তাই নিতে হইয়াছে জমিদার সেরেস্তায় হিসাবনবীশের কাজ।

এখানকার মুসলমান জমিদার, রায় বুলার বড় সজ্জন, ধর্ম্মপরায়ণ। কালুকে স্নেহের চোখে তিনি দেখেন। গ্রামে তাই আজকাল কালুর প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। কঠোর পরিশ্রমের ফলে সংসারে আসিতেছে স্বচ্ছলতা। কিন্তু নানক মানুষ না হইলে সবই যে পণ্ডশ্রম।

ছেলেকে গ্রামের পাঠশালায় দেওয়া হইয়াছিল, কোন লাভ হয় নাই। পুঁথিপত্র নিয়া এক দণ্ডও সে বসিতে চায় না। পথে প্রান্তরে, বনে জঙ্গলে আপন খেয়াল খুশিমত ঘুরিয়া বেড়ায়।

পাঠের জন্য পণ্ডিত তাড়া দিলে বিজ্ঞের মত উত্তর দেয়, "এসব ছাইভস্ম পড়ে কি হবে? তার চেয়ে ঈশ্বরের নাম নিয়ে থাকাই তো অনেক ভালো, সংসার থেকে তরে যাওয়া যায়।"

বালক পুত্রের মুখে একি সব বড় বড় কথা! শুনিয়া কালু বেদীর গা জ্বলিয়া যায়। তিরস্কার করিয়া কহেন, "এতটুকু ছেলে, সংসার কাকে বলে তা জানিসনে, সংসার থেকে উদ্ধার পাবার কথা নিয়ে তোর এত মাথা ঘামানো কেন রে বাপু?"

নূতন পয়সা-কড়ি হইয়াছে, কালু বেদী সেদিন তাই ঘটা করিয়াই পুত্রের উপনয়ন দিলেন। সারা গাঁয়ের লোককে আকণ্ঠ খাওয়ানো

হইল। কিন্তু সেই উৎসব অনুষ্ঠানেই কি নানককে নিয়া কম ঝামেলা ? পুরোহিতের সাথে কি কুতর্কই না যে জুড়িয়া দিল।—"শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে দিয়ে কি লাভ ? যজ্ঞসূত্র গলায় ঝুলিয়ে কোথায় কোন অমর লোকে পৌঁছানো যাবে ? সুতোর মালার চাইতে ঈশ্বরের নামের মালাই কি অনেক বেশী ভালো নয় ? তাতেই কি প্রকৃত কল্যাণ আসে না ?"—এই সব মন্তব্য আর প্রশ্নবাণে বালক উপস্থিত সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। পুত্রের সেদিনকার এ ঔদ্ধত্যে কালু বেদীর মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে।

জননী তৃপ্তার উৎকণ্ঠাও বড় কম নয়। সুযোগ পাইলেই পুত্রকে বোঝান, "ওরে, মন দিয়ে লেখাপড়া কর। আর পাঁচজনের মত চলতে চেষ্টা কর। দেখছিস তো বুড়ো বাপ খেটে খেটে সারা হয়ে যাচ্ছে। এখনো তুই যদি বুঝে-সুজে না চলিস, তবে যে এই গেরস্তির সব কিছুই তলিয়ে যাবে।"

মায়ের মিনতি আর পিতার তিরস্কার সবই হয় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত। সংসার-বিরাগী বালক চোখে মাখিয়াছে কোন অজানার অনুরাগ-অঞ্জন, তাই আপন ভাবতন্ময়তা নিয়া দিনের পর দিন মনের আনন্দে সে ঘুরিয়া বেড়ায় পথে প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে। মুখে সদাই লাগিয়া থাকে তাহার নিজের রচিত ভজনগানের সুর।

দায়িত্ববোধহীন এই ছেলেকে নিয়া কি করা যায় ? কালু বেদী একদিন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। লক্ষীছাড়া ছেলেকে তিনি সায়েস্তা না করিয়া ছাড়িবেন না। এবার হইতে শুরু হইল হইল পুত্রের উপর তাঁহার কঠোর নির্য্যাতন।

জমিদার রায় বুলার বড় ভালবাসেন কালুর এ পুত্রটিকে। কি যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণ রহিয়াছে এই বালকের ভাববিহ্বল চোখ দুইটিতে। বনের পাখীর মত সারা দিন সে গান গাহিয়া বেড়ায়। সহজ সত্যের কথা, ধর্ম্মের মূল কথা অবলীলায় এক একদিন এই নিরক্ষর, অনভিজ্ঞ

বালকের মুখ দিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে বাহির হয়। রায় বুলার বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান।

নানকের এই নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া এবার তিনি আগাইয়া আসিলেন। সেদিন সেরেস্তায় কাজ করিতে বসিয়াই হিসাবনবীশ কালু বেদীকে দিলেন জরুরী তলব।

ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "কালু এসব কি শুনছি বলতো? নানকের ওপর হঠাৎ এমন খড়্গহস্ত হলে কেন?"

"আর বলবেন না, হুজুর। এ অবাধ্য ছেলেকে নিয়ে আমি হিমসিম খাচ্ছি। লেখাপড়ার পাট সে প্রায় উঠিয়েই দিয়েছে, সংসারের কোন কাজও সে দেখবে না। দিনরাত ঘুরে বেড়াবে ছন্নছাড়ার মত। এবার গালাগাল আর মারধোর ছাড়া ওকে শোধরাবার আর উপায় তো আমি দেখছিনে।"

"শোন কালু। তুমি এক মস্ত ভুল করছো। তোমার ছেলে নানক কিন্তু আর পাঁচটা ছেলের মত মোটেই নয়। তার চোখে মুখে আমি দেখেছি এক পরমভক্ত সাধুর ছায়া। মনে হয়, জন্মগত ধর্ম্মবোধ নিয়েই তোমার এ ছেলে জন্মেছে।"

"কি জানি হুজুর, আমরা তো ওকে ধরে নিয়েছি দায়িত্ববোধহীন, পাগলাটে ধরণের ছেলে বলে।"

"না—না। বহুবার আমি লক্ষ্য করেছি, বালক নানক যখন ঈশ্বরের নামগান করে বা ধর্ম্মকথা বলে, কি জানি কেন আমার সারা অন্তরে নাড়া পড়ে যায়। আমি মুসলমান, ভিন্নধর্ম্মী—কিন্তু তার ভজনগান শুনে আমার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠে। অন্তরে মুক্তির কথা ভেবেভেবে আমি অধীর হয়ে পড়ি। না, তোমার ছেলে সাধারণ পাগল নয়, ঈশ্বরের জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছে। ক'টা লোকের এমন ভাগ্য হয়, বলতো? আমি বলছি কালু, তোমার এ ছেলে সামান্য নয়, সাধারণ নয়। একদিন তার ভেতরকার বস্তু ফুটে বেরুবেই। নিশ্চয়ই সে হবে এক সর্ব্বজনমান্য ধর্ম্মনেতা।"

বিশ্বাস করুন বা না করুন, মনিবের এসব কথা শুনিয়া কালু বেদী

থমকিয়া যান। নূতন করিয়া ভাবিতে শুরু করেন। ছেলের ঔদাসীন্য আর ভাবুকতাকে মানিয়া নিতে চাহেন সহজভাবে।

রায় বুলারের সেদিনকার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী উত্তরকালে সফল হইয়া উঠে। ভারতের এক শক্তিমান মহাপুরুষ ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকরূপে গুরু নানকের অভ্যুদয় দেখা দেয়।

এক উদার ও সর্ব্বজনীন ধর্ম্মবোধের ভিত্তিতে নানক প্রবর্ত্তন করেন তাঁহার শিখধর্ম্ম। আপন ভাগবত জীবনের সাধনা ও সিদ্ধির মধ্য দিয়া ভগবদ্‌ভক্তির এক নূতন ভাবতরঙ্গ তিনি উদ্বেলিত করিয়া তোলেন, আর এই তরঙ্গ ছড়াইয়া পড়ে সারা পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহে।

লাহোর হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে, গুজরানওয়ালা জেলার এক প্রান্তে তালওয়ান্দি গ্রাম।* চারিদিক সবুজ তরুলতায় বেষ্টিত। প্রকৃতির স্নেহস্পর্শে এখানকার ভূমি হইয়াছে সরস এবং স্নিগ্ধ শ্যামল। অদূরে প্রসারিত অরণ্যময় বার-মালভূমি। তাহার ওপাশেই বিস্তীর্ণ মরু-অঞ্চল। বৈশাখের উন্মত্ত হাওয়ার দাপটে মাঝে মাঝে এখানে দেখা দেয় বালুকা-ঝড়ের রুদ্রমূর্ত্তি—সবুজ বনানীর উপর তখন ছড়াইয়া পড়ে শুভ্র আস্তরণ। ঝড়তাণ্ডবের শেষে আবার তালওয়ান্দির বনভূমিতে জাগিয়া উঠে হরিৎ শোভার অপরূপ মাধুর্য্য। বনে-জঙ্গলে ঝোপে-ঝাড়ে উঁকি মারিতে থাকে হরিণ, খরগোস—নাচিয়া বেড়ায় শালিখ, টিয়া আর তিতির পাখীর দল।

প্রকৃতির লীলানিকেতন এই মনোরম তালওয়ান্দি গ্রামই শিখগুরু নানকের জন্মভূমি। এখানকার এক সাধারণ ক্ষত্রিয় পরিবারে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে।

* শিখগুরু অধ্যুষিত এই তালওয়ান্দি গ্রাম উত্তরকালে এক তীর্থ-শহরে পরিণত হয়। নানকের স্মৃতি বুকে ধরিয়া আছে—শিখেরা তাই ইহার নূতন নামকরণ করেন, নান্‌কানা। শিখশক্তির অভ্যুদয়-যুগে নানকের জন্মস্থানে এক

মধ্যযুগের জড়তা ও সুপ্তি ভাঙ্গিয়া সাধারণ মানুষের মনে এ সময়ে জাগিয়া উঠিয়াছে নূতন জীবন-জিজ্ঞাসা, নূতন প্রাণচাঞ্চল্য। রামানন্দ, কবীর প্রভৃতি সাধকদের ভক্তি আন্দোলন জনজীবনের নয়ন সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছে নূতন আশার আলো।

সম্রাট বহলুল লোদীর তখন রাজত্বকাল। এ সময়ে উত্তরপশ্চিম ভারতের বড় দুর্দ্দিন চলিয়াছে। ধর্ম্মান্ধতা আর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে মানুষের জীবন হইয়াছে বিপর্য্যস্ত। কাহারো মনে কোন স্বস্তি বা শান্তি নাই—নাই কোন আশা ভরসা। লোদী সম্রাট ও তাঁহার পাঠান আমীর ওমরাহদের ধর্ম্মীয় গোঁড়ামি আর শাসনগত দুর্ব্বলতা এই পরিস্থিতিকে ক্রমে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

এ সময়কার অনাচার ও ভেদ বিসম্বাদের দুঃসহ অবস্থাটি গুরু নানকের রচিত এক পদে বর্ণিত হইয়াছে

—এই যুগ যেন এক শাণিত ছুরিকা,
আর রাজারা সব নির্ম্মম কসাই।
ন্যায়নীতি আজ কোথায় উড়ে পালিয়েছে
তার পাখা মেলে।
দেখছি মিথ্যার দুর্ভেদ্য যবনিকা,
আর দেখছি এই নিরন্ধ্র আঁধার-রাত
কোথায় আলোক দিশারী চাঁদ?
—খুঁজে খুঁজে আমি যে হয়েছি ক্লান্ত।
ওগো, তমসার পারে কোথায় রয়েছে আলোকচ্ছটা?
কেঁদে কেঁদে মরছি আমি
আত্ম-অভিমানের বোঝা বয়ে।

মন্দির গড়িয়া উঠে, আর এই মন্দিরে স্থাপিত হয় শিখদের পবিত্র ও আরাধ্য—'গ্রন্থসাহেব'। পূর্ব্বে নান্‌কানা-সাহেব নানকপন্থী ভক্তদের স্খলিত ভজন ও স্তোত্রপাঠে সর্ব্বদা ঝঙ্কৃত থাকিত। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর হইতে নান্‌কানার সে গৌরব আর নাই।

গুরু নানক

কে বলে দেবে আমায় কোথায় রয়েছে,
উদ্ধারের পরম পথ?

সমকালীন পাঞ্জাবী প্রদেশ ছিল লোদী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, আর এই সুবার বিভিন্ন অঞ্চল প্রধানতঃ মুসলমান সামন্ত ও ভূম্যধিকারীদের দ্বারাই শাসিত হইত। তালওয়ান্দির রায়-ভোই ছিলেন এমনি এক মুসলমান ভূম্যধিকারী। বংশের দিক দিয়া তিনি ছিলেন রাজপুত। রায়-বুলার ইঁহারই পুত্র।

রাষ্ট্রবিপ্লব ও দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যে হঠাৎ একদিন রাজপুত সামন্ত রায়-ভোই কলমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া যান। কিন্তু বেশী বয়সের এই ধর্ম্মান্তরিত জীবনে মুসলমান ধর্ম্মের তত্ত্ব ও উপদেশ রূপায়িত করার সুযোগ তাঁহার কমই মিলিয়াছে। পুত্র রায়-বুলারের কাছেও মুসলমান ধর্ম্ম তেমন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই। তাছাড়া, ধর্ম্মবোধের দিক দিয়া তিনি ছিলেন পরম উদার। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি, হিন্দু প্রজাদের প্রতি যে ব্যবহার তিনি করিতেন, সঙ্কীর্ণতার ঠাঁই সেখানে ছিল না।

তালওয়ান্দির এক উঁচু টিলার উপর রায়-বুলারের কেল্লা ও প্রাসাদ বিরাজিত। চারিদিকে ঘিরিয়া আছে তাঁহার জমিদারী ও ক্ষেতখামার। প্রাচুর্য্য, শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া তিনি এই জমিদারী শাসন করেন। বাহিরের রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটা তাঁহার এই শান্তিময় নীড়ে আসিয়া বড় একটা ধাক্কা দেয় না।

এমনিতেই রায়-বুলার সজ্জন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। তদুপরি, আজকাল বয়সও যথেষ্ট হইয়াছে। তাই সাধু ফকীর দেখিলে বা কোন ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ পাইলে তাঁহার উৎসাহের অন্ত থাকে না।

কি জানি কেন, নানকের ভগবদ্‌মুখী জীবনের প্রতি রায়-বুলার গোড়া হইতেই বোধ করেন এক অহেতুক আকর্ষণ। স্নেহমমতা দিয়া সদাই এ বালককে তিনি ঘিরিয়া রাখিতে চাহেন।

তালওয়ান্দি অঞ্চলে মুসলমানদের কোন অত্যাচার বা উপদ্রব নাই।

গ্রামের নিকটেই শুরু হইয়াছে এক নিবিড় বন। স্থানটি তপস্তার পক্ষে বড় অনুকূল। তাই প্রায়ই এখানে দেখা যায় উচ্চস্তরের সাধু মহাত্মাদের আনাগোনা। ইঁহাদের খোঁজে নানক অনেক সময় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান, সাক্ষাৎ পাইলেই নিকটে গিয়া বসেন। কত দীর্ঘ পরিব্রাজন ও সাধনার অভিজ্ঞতা এই সব সাধুদের। অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপর দখলও কম নয়। ইঁহাদের কাছে বসিয়া নানক নানা কাহিনী ও তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করেন। আগন্তুক সাধুসন্তেরা ভারতের দূর দূরান্তে ঘুরিয়া বেড়ান, তাই সমকালীন ধর্ম্ম আন্দোলনের সংবাদও ইঁহাদের কাছে অনেক সময় পাওয়া যায়।

ভক্তিবাদী সাধকদের সাথেই নানকের ঘনিষ্ঠতা হয় বেশী, ঈশ্বরের লীলাকাহিনী ও নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহার যেন আর আশ মিটে না। হৃদয়মধ্যে দিনরাত বহিয়া চলে নামের ধারাস্রোত। এই নাম কীর্ত্তন আর ভজন নিয়াই তিনি মত্ত হইয়া উঠেন।

সরকারী রাজস্ব বিভাগের তরুণ আমীন জয়রাম সেদিন সদর হইতে তালওয়ান্দিতে আসিয়া উপস্থিত। তখনকার দিনে ক্ষেতের শস্য দিয়া রাজস্ব দিতে হইত, জয়রাম সেবার এখানকার জরীপ ও শস্যের হিসাব-নিকাশ করিতে আসিয়াছেন।

ক্ষেতের ধারে দাঁড়াইয়া কাজ করিতেছেন, এমন সময় নানকের বড় বোন নানকীর উপর হঠাৎ তাঁহার চোখ পড়িল। রূপ লাবণ্যবতী কে এই তরুণী? খোঁজ নিয়া জানিলেন, সে স্থানীয় জমিদারের হিসাব-নবীশ কালু বেদীর কন্যা? জাতে ইহারা ক্ষত্রিয়, জয়রামেরই স্বঘর। নবাবের আমীনের এখানে মন পড়িয়াছে দেখিয়া জমিদার রায়-বুলারও ঘটকালিতে উৎসাহী হইয়া পড়িলেন। অল্পদিনের মধ্যে জয়রামের সহিত নানকীর বিবাহ হইয়া গেল।

মেয়ে এতদিন ঘরের বোঝা হইয়া ছিল, নানকের জননী তৃপ্তা এবার তাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

অতঃপর চাপিয়া ধরা হইল নানককে। ভগ্নীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এখন ঘরে একটি বধূ না আসিলে কি করিয়া চলে? জননীর এখন বয়স হইয়াছে, খাটিতে খাটিতে দেহ কালি হইয়া গেল, তাঁহার দিকেও তো একটু চাহিতে হয়। বিবাহের জন্য সকলে হৈ-চৈ তুলিয়া দিলেন।

এই সোরগোলের মধ্যে নানকের কণ্ঠস্বর চাপা পড়িয়া যায়। চৌদ্দ বৎসরের বালক, সে আবার নিজের ভালো-মন্দ কি বুঝিবে? বাপ মায়ের মুখ চাহিয়া বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে।

গুরুদাসপুর জেলার বাতালা গ্রাম হইতে এক সম্বন্ধের প্রস্তাব আসে। পাত্রী সুন্দরী ও সৎস্বভাবা। নাম তাহার সুলখনী। এক শুভ লগ্নে সমারোহের সহিত নানকের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর।*

জননীর মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার হাসি। উদাসী ছেলেকে তো কোন রকমে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করা গেল, এবার নিশ্চয়ই তাহার মন ফিরিবে, গৃহস্থীতে মন দিবে।

বিবাহের পরেও কিন্তু নানকের মতিগতির কোন রকম পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। আগের মতই তিনি স্বেচ্ছাবিহারী। পথে প্রান্তরে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান। মাঝে মাঝে ভক্তিরসে আবিষ্ট হইয়া রচনা করেন চমৎকার সব ভজন সঙ্গীত। সংসারের প্রতি আকর্ষণ আসা দূরে থাকুক, দিন দিন তিনি যেন আরো উদাসীন হইয়া উঠেন। মায়ের মনে অস্বস্তির অন্ত নাই। এ ছেলেকে নিয়া তিনি কি করিবেন?

* শিখধর্ম্ম ও উপদেশাবলীর আদি লেখক ভাই-গুরুদাসের এক সংক্ষিপ্ত রচনার ভিত্তিতে মণি সিং গুরু-নানকের বিস্তৃত জীবনী লিখেন, ইহার নাম —'জ্ঞানরতনাবলী'। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, চব্বিশ বৎসর বয়সে নানকের বিবাহ হয়। অপর লেখকদের মতে, এই বিবাহ হয় আরো অনেক পরে, যখন তিনি সুলতানপুরে সরকারী কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু নানকের জীবনে অধ্যাত্মরসের জোয়ার আসার অনেক আগে এবং প্রধানতঃ পিতামাতার চাপে পড়িয়া তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হন—ইহাই বেশী যুক্তিযুক্ত।

রায়-বুলার নানকের সব খবরই রাখেন। মনে মনে চিন্তিত হইয়া উঠেন, তাইতো, এই ধর্ম্ম-পাগল ছেলেকে নিয়া কি করা যায়? একদিন কালু বেদীকে ডাকাইয়া কহিলেন—"শোন কালু, হতাশ হবার কিছু নেই। আমার মনে হয়, নানককে ফার্সী পড়ানোই ভাল। সামান্য কিছু শিখলেই চাকরির সুবিধা হবে। আমার যা কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তা আমি প্রয়োগ করবো ওর জন্য। তাছাড়া, তোমার জামাই জয়রাম সদরে রয়েছে। দক্ষ কর্ম্মচারী বলে সুলতানপুরের নবাবের কাছে তার আজকাল খুব খাতির। চাকরি জুটিয়ে দিতে সেও পারবে।"

ফার্সী শিক্ষক, মৌলবী রুকন-উল-উদ্দীনের কাছে নানককে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অল্পদিনে সে ফার্সী অনেকটা আয়ত্ত করিয়াও ফেলে। মৌলবী তাহার মেধা ও প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান, আবার এই খামখেয়ালী ছাত্রটিকে নিয়া ঝঞ্ঝাটও তাঁহাকে কম পোহাইতে হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের প্রশ্নের উত্তরে নানক মুখে মুখে রচনা করিয়া দেন ঈশ্বরের প্রশস্তিমূলক বয়েৎ। যেমন অপূর্ব্ব এসব রচনার ভাব, তেমনি তার ভাষা।

রুকন-উল-উদ্দীন খুশী হন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিতও কম হন না। ফার্সী শিক্ষার যে রীতি ও পন্থা প্রচলিত, নানক তাহা এড়াইয়া চলেন। তরুণ ছাত্রের প্রতিভা যতই থাকুক না কেন, এভাবে চলিতে থাকিলে কোন দিনই প্রকৃত শিক্ষা সে লাভ করিতে পারিবে না।

নানক কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁহার ফার্সী শেখা ছাড়িয়া দিলেন। বিদ্যায়তনের ছাঁচে তৈরী হইয়া উঠিবার পাত্র তিনি নন, ছক বাঁধা পাঠক্রম অনুসরণ করাও তাঁহার পক্ষে অসহ্য। তাই এবার হইতে ঘরেই স্বেচ্ছামত পাঠ-কার্য্য চলিতে থাকে।

নানকের উত্তরকালীন রচনায় গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও পরিণত শিক্ষার নিদর্শন দেখা যায়। ফার্সী ভাষায়ও যে তাঁহার বুৎপত্তি যথেষ্ট ছিল, তাহার বহু প্রমাণও রহিয়াছে।*

* শিখ ধর্ম্মের প্রবীণ গবেষক, ম্যাক্স্ আর্থার মেকলিফ্ লিখিয়াছেন,

ফার্সী শিক্ষালয় ছাড়িবার কথা শুনিয়া পিতা খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। নানককে ডাকিয়া কহিলেন, "বুঝতে পেরেছি, লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হওয়া, চাকরি-বাকরি করা, এসব তোকে দিয়ে হবে না। থাকবি অকাট মুখ্যু হয়ে, ঘুরে বেড়াবি বনে-বাদাড়ে। যা! তার চেয়ে এবার ক্ষেতে গিয়ে মোষগুলো চরাতে থাক। খামারের কাজ দেখাশুনা কর। তবুও সংসারের কিছু সাহায্য হতে পারবে।"

অসীম আকাশের নীচে উন্মুক্ত প্রান্তর, আর শস্য-শ্যামল ক্ষেত। প্রকৃতির সহজ আনন্দের ধারা সেখানে সদা বিস্তারিত। মহিষের দল নিয়া এ নিসর্গ-শোভার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে নানকের আপত্তি নাই, বরং উৎসাহই আছে। তখনি এ প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেলেন।

মহিষ চরাইতে গিয়া সেদিন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। পরিশ্রমও এতক্ষণ নিতান্ত কম হয় নাই। ক্ষেতের ধারের বটগাছটির নীচে নানক বিশ্রামের জন্য বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে কখন যে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, হুঁস নাই।

বেশীক্ষণ কিন্তু এই নিদ্রাসুখ উপভোগ করা ঘটিয়া উঠে নাই। গ্রামের অন্যতম গৃহস্থ, ভট্টির চীৎকারে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সে উচ্চকণ্ঠে অজস্র গালিবর্ষণ করিতেছে। মহিষের দল ইতিমধ্যে তাহার ক্ষেতের অনেকটা শস্য খাইয়া ফেলিয়াছে। অত্যাচার ভট্টি সহ্য করিবে না।

নানক জোড় হস্তে দোষ স্বীকার করিলেন, অনেক কাকুতি মিনতিও করিলেন। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক কিছুতেই কর্ণপাত করিতে রাজী নয়।

ইতিমধ্যে গ্রামের আর পাঁচজন সেখানে জড়ো হইয়া পড়িয়াছে।

নানকের রচিত 'গ্রন্থসাহিবে'র অংশে যে সব ফার্সী শব্দ ও কাব্যপদ পাওয়া যায় তাহাতে প্রমাণিত হয়, তিনি ফার্সী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নিজের স্বাধীন চিন্তাধারা এবং উদার ও পরমতসহিষ্ণুতার মূলে অনেকাংশে ছিল পারস্যের সাহিত্যের প্রভাব।—দি শিখ্ রিলিজিয়ন, অধ্যায় ১।

ক্রোধোদ্দীপ্ত ভট্টি তখনই কয়েকজন সাক্ষী নিয়া জমিদারের কাছে ছুটিয়া যায়, নানকের বিরুদ্ধে জানায় তাহার অভিযোগ।

কাঁদিয়া কাটিয়া লোকটি মহা অনর্থ বাধাইয়া তুলিয়াছে। রায়-বুলারকে তাই স্বয়ং এ তদন্তে আসিতে হইল।

ক্ষেতের দিকে তাকাইয়া তিনি দেখেন, মহিষের অত্যাচারের কোন চিহ্নই নাই। এক ছড়া শস্যও নষ্ট হয় নাই। ক্ষেতের মালিক, অভিযোগকারী তো মহা অপ্রস্তুত। যেসব গ্রামবাসী সঙ্গে ছিল তাহারাও এ দৃশ্য দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছে। একি অলৌকিক রহস্য! তাহারা যে কিছুক্ষণ আগেই ক্ষেতের চরম দুরবস্থা দেখিয়া গিয়াছে। শস্যের ক্ষতির পরিমাণও তো নিতান্ত কম ছিল না।

নানক যে এক উঁচুদরের ধর্ম্মপ্রাণ যুবক সে সম্পর্কে রায়-বুলারের কোনদিনই সন্দেহ ছিল না। এবার তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল, সে শুধু ঈশ্বরভক্তই নয়, ঈশ্বরাশ্রিতও বটে। নতুবা প্রকাশ্য দিবালোকে এমন কাণ্ড কখনো সম্ভব হইতে পারে না।*

নানকের উদাসীনতা ও ভাবোন্মত্ত অবস্থা দিন দিনই কেবল বাড়িয়া চলিয়াছে। এক সময়ে কয়েকদিন তিনি মৌন হইয়া, নিভৃতে গৃহকোণে বসিয়া দিন কাটাইতে থাকেন। জননী বড় ভীত হইয়া পড়িলেন, শেষটায় পুত্রের মাথা খারাপ না হইয়া পড়ে।

নরম স্বরে তিনি ছেলেকে বুঝান, "ওরে, শুধু মোষ চরিয়ে বেড়ালে কি করে চলবে? সংসারের ব্যয় যে এরপর কেবল বাড়তেই থাকবে।"

উত্তরে নানক গাহিতে থাকেন তাঁহার ভক্তিমধুর ভজন।

পিতা কঠোর হইয়া তিরস্কার করেন, "এসব ভজন-টজন ছেড়ে দিয়ে কৃষির কাজে লেগে যা দেখি। এতকাল খেটেখুটে কিছু জমি করেছি।

নান্‌কানার প্রান্তস্থিত যে শস্যক্ষেত্রে এই আলৌকিক ঘটনাটি ঘটিয়াছিল আজও তাহা শিখদের কাছে এক পরম পবিত্রস্থান রূপে গণ্য হইয়া আছে। এই স্থানটি 'কিয়ারা সাহেব' নামে অভিহিত হয়।

তুই তার দেখাশুনা কর। আর কতকাল আমি তোদের বোঝা বইবো?"

ভাবতন্ময় নানক সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বলেন—

"এহু তনু ধরতি বীজ কর্ম্মাকরৌ,
সলিল আপউ সারিংপাণী।
মন কিরষান্নু হরিহৃদে জমাইলে,
উপাব সিফদ নিরবাণী।"

অর্থাৎ, আমার এই তনু হচ্ছে ধরিত্রী—ক্ষেত্র, সৎকর্ম্ম বীজস্বরূপ, আর ধনুর্ধারী শ্রীরাম করেন তাতে জলসেচন। হে মনরূপ কৃষাণ, হৃদয়ে তুমি হরিরূপ বৃক্ষ রোপন কর, তাতে প্রাপ্ত হবে নির্ব্বাণ।

"বাজে কথা এখন রাখ। আচ্ছা, বেশ তো, ক্ষেতখামারের কাজ ভালো না লাগে, কোন কারবারে লেগে যা।"

"কারবার নিয়েই তো হয়েছি পাগল। মালিক দিয়েছেন তাঁর নামের মূলধন। দিবানিশি ভাবছি—কি দেব তার হিসেব।"

কালু বেদী হাল ছাড়িয়া দেন। নাঃ, এ ছেলেকে দিয়া কোন অর্থকরী কাজই আর হইবে বলিয়া মনে হয় না। মায়ের নয়ন জল ও মিনতি দিনের পর দিন ব্যর্থ হইয়া যায়।

ভগিনী নানকীর বড় প্রিয়পাত্র নানক। স্বামীগৃহ হইতে নানকী মাঝে মাঝে তলওয়ান্দিতে আসে, সুযোগ পাইলেই হাতে ধরিয়া ভ্রাতাকে কত বুঝায়। কিন্তু কে তাহার কথায় কর্ণপাত করে?

ভাবোন্মত্ত অবস্থায় নানক এসময়ে কিছুদিনের জন্য খাওয়া দাওয়া একেবারে ত্যাগ করিলেন।

বাড়ীর সকলের আতঙ্কের সীমা রহিল না। তাড়াতাড়ি জমিদার বাড়ীর চিকিৎসককে ডাকিয়া আনা হইল।

প্রবীণ চিকিৎসক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেদিন তাঁহার রোগীকে পরীক্ষা করিতেছেন। রোগ নির্ণয়ের জন্য চলিতেছে নানা জিজ্ঞাসাবাদ। রোগী হঠাৎ গুন্ গুন্ সুরে নামগান শুরু করিয়া দেয়। এই গান শেষ হইলে চিকিৎসককে বলে, "ওগো, সত্যকার ঔষধের নাম যদি করতে হয়, তা

হচ্ছে—ভগবৎ-নাম। যে ব্যাধি এই নামে নিরাময় হয়, তা কি তোমার ব্যবস্থা পত্র দিয়ে সারাতে পারো তুমি ?”

দীর্ঘ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের পর চিকিৎসক সবাইকে কহিলেন, “না-গো, তোমরা যা সন্দেহ করেছো তা নয়, এ ছেলের উন্মাদরোগ হয়নি—হয়েছে ঈশ্বর প্রেমের ব্যাকুলতা। কোন ভয় নেই। সময়মত এই অস্থিরতা কমে যাবে।”

জননী তৃপ্তার হৃদয় হইতে এক পাষাণভার নামিয়া গেল। যাক, ছেলের তবে সত্যসত্যই কোন গুরুতর পীড়া হয় নাই। বাছা এবার ভগবানের কৃপায় সুস্থ হইয়া উঠিলেই বাঁচা যায়।

এই ভাবমত্ততার পর্য্যায় কিছুদিনের মধ্যে চলিয়া গেল। নানক ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।

পুত্রের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া কালু বেদী অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। সেদিন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, “হতভাগা, তোর হলো কি বল তো। এই শেষবারের মত বলছি, যা হয় কিছু রোজগার কর। বেশ তো, ব্যবসাই শুরু করে দে না। মূলধন আমি দিচ্ছি। ঐতো রয়েছে চুহারকানার মস্ত বাজার। নুন, তেল, হলুদ কত কিছু জিনিসের কেনা-বেচা সেখানে হয়। যাতে তোর খুশি তাতেই টাকা লাগিয়ে দে। এখনকার মত, এই নে—গোটাকুড়ি টাকা। আজ থেকেই কাজে লেগে পড়্।”

নানক এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া পিতার কথা শুনিতেছিলেন। এবার যন্ত্রচালিতের মত টাকা গ্রহণ করিলেন, রওনা হইলেন বাজারের দিকে। সঙ্গে চলিল বাড়ীর বিশ্বাসী ভৃত্য বালা।

পদব্রজে উভয়ে চলিয়াছেন। কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করার পর কয়েকজন নাগা সন্ন্যাসীর সাথে তাঁহাদের দেখা। উলঙ্গ, চিম্‌টাধারী সন্ন্যাসীরা সেদিনকার মত এক বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম নিয়াছেন। নানক তাঁহাদের চরণে প্রণাম নিবেদন করিলেন, দলের নেতার কাছে বসিয়া কহিতে লাগিলেন নানা প্রসঙ্গকথা।

সর্ব্বত্যাগী এই সাধুর দল চিরদিনই নানকের কাছে সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের বস্তু। খুঁটিয়া খুঁটিয়া তিনি প্রশ্ন করিতে থাকেন, "মহারাজ, আপনারা উলঙ্গ থাকেন কেন? পরিচ্ছদ কি আপনাদের জোটে না? আচ্ছা, ভোজনের ব্যবস্থাই বা কে করে দেয়?"

সাধুজী উত্তর দেন, "বেটা, সংসারের সব কিছু মায়া মমতা ছেড়ে যে আমরা পথে বেরিয়ে পড়েছি। তবে পরিচ্ছদের মোহ আর রাখতে যাবো কেন? আর আহারের কথা বলছো? তা চলে আকাশবৃত্তিতে। পরমাত্মা যে দিন যা ব্যবস্থা করেন, তাতেই ক্ষুধা মেটাতে হয়।"

"মহারাজ, আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে, আজ আমি আপনাদের এই ক'মূর্ত্তির সেবা করবো। কিছু টাকাও আমার কাছে রয়েছে, এখনি গ্রামের বাজার থেকে আমি ঘি-আটা এ সব কিনে আনছি।"

ভৃত্য বালা নিকটেই বসিয়া আছে। নানকের প্রস্তাব শুনিয়া তাহার তো চক্ষু স্থির। একান্তে তাঁহাকে ডাকিয়া নিয়া কহিল, "আরে, এ তুমি কি পাগলামো করতে যাচ্ছো। জানো তো, তোমার বাবা এমনিতেই উগ্র স্বভাবের লোক। টাকা যদি এভাবে নষ্ট কর, তিনি কিন্তু আর রক্ষে রাখবেন না। কারবারে লাভ করবার জন্য টাকা দিয়েছেন, কিন্তু লাভ করা তো দূরের কথা, এখন আসলই মারা যাচ্ছে।"

ভৃত্যের কথা নানক গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বালা, আমায় বলতে পারো, আর কোন কাজে টাকা খাটালে এর চাইতে বেশী লাভ হতে পারে? সাধুদের আশীর্ব্বাদই কি সব চাইতে ভাল সওদা নয়? দেখছো না, ভগবানের কৃপায় এক মস্ত ব্যবসার সুযোগ আজ আমাদের সামনে উপস্থিত।"

ব্যবসায় সম্পর্কে এমনতর মৌলিক ব্যাখ্যা বালা তাহার জীবনে আর শোনে নাই। হতাশ হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

পরিতোষ সহকারে সাধুদের ভোজন করাইয়া নানক গৃহে ফিরিয়া আসিলেন কপর্দ্দকহীন অবস্থায়।

ক্রোধান্ধ কালু বেদী পুত্রকে ধরিয়া এবার শুরু করেন প্রচণ্ড প্রহার।

নানকের বড় বোন নানকী তখন পিত্রালয়ে রহিয়াছে। নানকী এবং জননী তৃপ্তা দেবীর কান্নাকাটি ও মিনতির ফলে শেষটায় কালু বেদীকে সেদিনের মত নিরস্ত হইতে হয়।

এ ঘটনার কথা রায়-বুলারের কানে পৌঁছিতে দেরী হয় নাই। সারা অন্তর তাঁহার ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে, লোক পাঠাইয়া পিতা-পুত্রকে ডাকাইয়া আনিলেন।

নানককে দেখা মাত্র রায়-বুলারের চোখ দুটি প্রেমাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, সাগ্রহে তিনি তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন।

এবার কালু বেদীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,"সাধুদের ভোজন করিয়ে নানক তো অন্যায় কিছু করে নি, সৎকাজই করেছে, কালু। তোমাদের হিন্দুশাস্ত্রে দান মাহাত্ম্যের কথা অনেক আছে। আমাদের ধর্ম্মেও 'জাকাৎ'-এর স্থান দেওয়া হয়েছে কত উঁচুতে। ধর্ম্ম জীবনের এ এক মস্ত বড় কর্ত্তব্য। তুমি আর আমি যে কর্ত্তব্য, যে ধর্ম্মাচরণের কথা ভাবতে পারিনি, এই অল্প বয়সে নানক তা করেছে অনায়াসে এবং স্বাভাবিক-ভাবে। না—কালু, তুমি ওর উপর এত কঠোর হয়ো না। হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোমার যে কুড়িটা টাকা নানক অপব্যয় করেছে বলে তুমি মনে করেছো, এই নাও, আমি তা দিয়ে দিচ্ছি।"

বারবার অনিচ্ছা জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও কালু বেদী ঐ টাকা নিতে বাধ্য হইলেন।

নানক সেস্থান ত্যাগ করার পর রায়-বুলার আবার কহিলেন,"কালু, সত্য কথা বলতে কি, তোমার ছেলে নানকের কাছে আমি ঋণী। তাকে দেখলেই আমার ভেতরকার ঘুমন্ত মানুষটা জেগে উঠতে চায়—ধর্ম্মের কথা, ঈশ্বরের কথা বারবার মনে পড়ে। নানকের থেকে আরও উপকার আমি পেয়েছি। সে সত্যই বড় পয়মন্ত। তার জন্মকালের পর থেকে আমার এ জমিদারীতে কোন অশান্তি, কোন উপদ্রব হয় নি। যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিই হয়েছে। অবশ্য, এ আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস।"

গভীরভাবে খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া রায়-বুলার আবার কহিলেন, "কিছুদিন যাবৎ আমার কেবলই মনে হচ্ছে, নানককে অন্য কোথাও পাঠানো দরকার। তাতে তার ভাল হবে, তোমার বাড়ীর অশান্তিও কমবে। এ সম্পর্কে নানকীর স্বামী জয়রামের সাথেও আমার পরামর্শ হয়েছে। জয়রামকে বলেছি, সুযোগমত নানককে সে যেন সদরে, নবাবের কোন কাজে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আর কিছুটা দিন তুমি ধৈর্য্য ধরে থাকো।"

বেশী দিন গত হয় নাই, ইহারই মধ্যে নানককে নিয়া আবার এক গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। গ্রামের উপকণ্ঠে সেদিন সাধুর বেশে এক ভবঘুরে আসিয়া উপস্থিত। কৌতূহলী হইয়া অনেকের সাথে নানকও তাহাকে দেখিতে গেলেন। লোকটি কিছু সাহায্য চাওয়া মাত্র তিনি তাঁহার বিবাহের সোনার অঙ্গুরীয় ও হস্তস্থিত পিতলের লোটাটি অবলীলায় দিয়া দিলেন।

এইদিন কালু বেদীর পক্ষে আর ধৈর্য্য ধারণ করা সম্ভব হইল না। পরিষ্কার ভাষায় পুত্রকে বলিয়া দিলেন, "তোমার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে, রোজ রোজ আর কত মার-ধর করা যায়। তুমি বাপু, বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাস কর।"

এ সঙ্কটেও রায়-বুলার আগাইয়া আসিলেন। স্থির হইল, নানক এবার সুলতানপুরে গিয়া কিছুদিন থাকিবে। নানকীর স্বামী জয়রামকে আগে হইতেই বলা আছে, শ্যালকের জন্য না হোক একটা সরকারী চাকরি অবশ্যই সে জুটাইয়া দিতে পারিবে।

বিদায় ক্ষণের আর বেশী দেরী নাই। পত্নী সুলখনীর অন্তরে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে ব্যাথার পাথার। দুই নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে।

আশ্বাস দিয়া নানক কহিলেন, "ছিঃ সুলখনী, যাবার সময় এমন করে কাঁদতে নেই। আমি তো শুধু অল্প কিছুদিনের জন্যই তোমাদের ছেড়ে যাব। তা ছাড়া, সুলতানপুর তো বেশী দূরে নয়।"

সুলখনী পতিব্রতা নারী, পতির সংসারের কাজে নীরবে, নির্ব্বিচারে নিজেকে তিনি একেবারে বিলাইয়া দিয়াছেন। পতিকে তিনি অপরের চাইতে অনেক বেশী বুঝিতে পারেন। ভগবৎ-প্রেমে পাগল এই মানুষটির উপর আর সকলেই জোর জবরদস্তি করিতে চায়, ভার চাপাইতে চায়। কিন্তু সুলখনী তাহা কখনো পারেন নাই। পতির সংসারে থাকিয়া শুধু তাঁহার দিকে চাহিয়াই নিঃশেষে নিজেকে তিনি এতদিন বিলাইয়া দিয়া আসিতেছেন। বিচ্ছেদের প্রাক্কালে এবার তাঁহার হৃদয় আর প্রবোধ মানিতে চায় না।

মুখ ফুটিয়া কহিলেন, "প্রিয়, এখানে সব সময়ে চোখের সামনে থেকেই তুমি আমায় ভালবাসতে পারলে না। বিদেশে গেলে কি তোমার মনের কোণে এতটুকু স্থানও আমার থাকবে? তাছাড়া, তুমি কি আর ফিরে আসবে আমার কাছে?"

"সুলখনী, তুমি এমন অবুঝ হয়ো না। ভেবে ছাখো, এখানে থেকেই বা আমি কি করছি? তোমার কি কল্যাণ করতে পারছি।"

"তবু তো, তুমি এখানে, এ বাড়ীতে থাকলে আমি নিজের মনে কত জোর পেতাম। জানতাম বেদী-পরিবারের বধূ আমি—আমি এই ঘর সংসারের কর্ত্রী, আমার রাজত্বে আমি রাণী। এবার যে আমার মনের বল একেবারে ভেঙে যাবে।"

"না গো, তুমি এতো উতলা হয়ো না। আমি বলছি, রাণীর পদ তোমার চিরদিনই বজায় থাকবে।"

"ওগো, দোহাই তোমার। তুমি আমায় সাথে নিয়ে চল, যেখানে তুমি থাকবে, সেখানেই রয়েছে আমার স্থান।"

"শান্ত হও, সুলখনী। স্থির হয়ে শোনো। আমায় বিদেশে এবার বেরুতে হবেই। যদি রোজগার করতে পারি, তোমায় সেখানে নিয়ে যাবো। ভয় পেয়ো না! ঘর সংসার ছেড়ে আমি যাচ্ছিনে। তুমি আপাততঃ এখানেই থাকো। আমার আদেশ মেনে চলো।"

সেই দিনই রায়-বুলারের প্রাসাদে এক ভোজ খাইয়া নানক রওনা

হন সুলতানপুরের পথে। তাঁহার সঙ্গীরূপে চলে প্রিয় ভৃত্য, বালা।

কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এবার কাছে পাইয়া নানকীর আনন্দ আর ধরে না। নানককে বরাবরই তিনি বড় স্নেহ করেন। তাছাড়া, ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়াও তাঁহাকে সম্ভ্রম কম করেন না।

শ্যালকের চাকরির জন্য জয়রাম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সুদক্ষ কর্ম্মচারী হিসেবে নবাব সরকারে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি আজকাল যথেষ্ট। নিজেই তিনি একদিন নানককে নবাব দৌলতখানের কাছে নিয়া উপস্থিত করলেন। নানক ফার্সী কিছুটা জানেন, কাজেই আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে চাকির জুটিয়া গেল।

সরকারী সরবরাহ বিভাগের গুদামে কাজ নিয়াছেন, অনেক কিছু দায়িত্ব নানকের উপর বর্ত্তিয়াছে। একাজে সততা, নিষ্ঠা ও নিপুণতার প্রয়োজন সর্ব্বসময়ে। তিনি কিন্তু মিষ্ট স্বভাব ও কর্ম্মশক্তির গুণে অল্পদিনেই উপরওয়ালাদের প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

এই ব্যবহারিক জীবন ও বহিরঙ্গ কাজের অন্তরালে অবিরত বহিয়া চলিয়াছে নানকের নাম-সাধনা আর ভক্তিরসের ধারা। পণ্যের হিসাব, মাপজোক ও পরিমাপ অনবরত চলে, আর কর্ম্মরত এই তরুণকে সদাই তাঁহার কাজের ফাঁকে ফাঁকে অস্ফুট স্বরে বলিতে শোনা যায়—তেরা, তেরা,—অর্থাৎ প্রভু, আমি তোমারই, শুধু তোমারই।

ভগ্নী নানকীর সংসার খুবই স্বচ্ছল, তাই নানককে তাঁহার উপার্জিত টাকা একটিও ব্যয় করিতে হয় না। ইহার প্রায় সবটাই তিনি লাগান সাধুসেবা, দানধ্যান ও অন্যান্য সৎকর্ম্মে।

সাধুসেবার এই উৎসাহ এ সময়ে দুই দুইবার নানকের বিপদ টানিয়া আনে। কয়েকটি কর্ম্মচারী ঈর্ষাবশে নবাবের কাছে অভিযোগ করে—নানক বেদী অসাধু, সরকারী গুদামের জিনিষপত্র সব লোপাট করিয়া কেবলই সে টাকা লুটিতেছে। নইলে এত ঘন ঘন সাধুদের ভাণ্ডারা কি করিয়া সে দেয়?

সন্দিহান হইয়া নবাব তখনি তদন্তের আদেশ দিলেন। হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, মালপত্র সব ঠিকমতই রহিয়াছে। আরও একবার ঘটে একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি। সে-বারও নানকের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া গেল না। নবীন কর্ম্মচারীর সাধুতা প্রমাণিত হওয়ায় নবাব বরং খুশী হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

অতঃপর নানক তাঁহার পত্নীকে কর্ম্মস্থলে নিয়া আসেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে দুইটি পুত্রও জন্মলাভ করে। প্রথম পুত্রের নাম শ্রীচাঁদ, আর দ্বিতীয় লক্ষ্মীচাঁদ। সরকারী কর্ম্মের দায়িত্ব ও গৃহস্থী এই দুয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়াও ভক্ত সাধক নানকের জীবন সদা উন্মুখ হইয়া রহিল ভজন সাধন ও সাধুসঙ্গের মধ্যে।

গ্রাম হইতে স্ত্রীকে যেমন নানক সুলতানপুরে আনিয়াছেন, তেমনি নিজের চারিপাশে জড়ো করিয়াছেন তালওয়ান্দির একদল ভক্তিপ্রবণ তরুণকে। ভৃত্য বালা বালক কাল হইতেই তাঁহাদের গৃহে বাস করে, নানককে সে আন্তরিকভাবে ভালবাসে—তাঁহার কর্ম্মজীবনের গোড়া হইতেই বালা সুলতানপুরে রহিয়াছে। ইতিমধ্যে নানক মুসলমান ভক্ত মর্দানাকেও আনয়ন করিয়াছেন। সরকারী কাজে তাঁহার এখন একটু প্রভাব পতিপত্তি হইয়াছে—তাই মর্দানা ও আরো জনকয়েক ধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুকে এখানে চাকরি যোগাড় করিয়া দিতে তাঁহার বেগ পাইতে হয় নাই।

ক্ষুদ্র একটি ভক্তগোষ্ঠী ইতিমধ্যে নানককে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজকর্ম্মের শেষে রোজই ইহাদের নিয়া তিনি নামগানে মত্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার স্বরচিত ভজন গানের সাথে ঝঙ্কৃত হয় মর্দানার রবাব-যন্ত্রের মধুর নিক্কণ। নানকের গৃহের এই ভক্তিময় পরিবেশের মধ্য দিয়া দিব্য আনন্দের ধারা দিনের পর দিন উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে।

ইষ্টভাবনায় সদা উন্মুখ, এই ভাগবত জীবনের প্রান্তে এবার আসিয়া দাঁড়ান নানকের নির্দ্দিষ্ট গুরুবিধি। নিগূঢ় সাধনার সঙ্কেত দানে শিষ্যকে

করেন তিনি কৃতকৃতার্থ। এই সদ্‌গুরুর নাম ও পরিচয় নানক চিরদিন গোপন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রসিদ্ধ পৌড়ীগুলিতে যে সব অপূর্ব্ব নিদর্শন ছড়াইয়া আছে, তাহা তাঁহার অসমান্য গুরুভক্তি ও গুরু-পরম্পরাবাদকে সপ্রমাণ করে।

"নানক গাবী ঐ গুণী নিধান্নু
গাবী ঐ স্থনীঐ মনি রখী ঐ ভাউ
দুখু পরহরি সুখু ঘরি লৈ জাই ॥
গুরমুখি নাদং গুরমুখি বেদং গুরমুখি রহিআ সমাঈ
গুর ঈসরু গুরু গোরখু বরমা গুরু পারবতী মাঈ
জে হউ জানা আখা নাহী কহিনা কথনু ন জাঈ ॥
গুরা ইক দেহি বুঝাই।
সভনা জী আ কা ইকু দাতা সো মৈ বিশরি ন জাঈ ॥"

অর্থাৎ, নানক কহে, সেই গুণনিধান পরমপ্রভুর স্তুতিগান কর। তাঁর গুণ কর গান, তাঁর গুণ কর শ্রবণ, হৃদয়ে সঞ্চিত রাখ তাঁর প্রেম। তবেই সর্ব্ব দুঃখ করতে পারবে পরিহার—সুখ নিয়ে যেতে পারবে ঘরে। গুরুর মুখেই শ্রবণ করা যায় নাদ বা ওঁকার, বেদের তত্ত্ব যায় জানা। গুরুর উপদেশেই উপলব্ধি হয় যে,—অকাল পুরুষ সর্ব্বত্র রয়েছেন সমাহিত, রয়েছেন ওতপ্রোত। গুরু মহেশ্বর, গুরু বিষ্ণু, গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই পার্ব্বতী। গুরুর যে মহিমা জানি তাহা মুখে যায় না বলা—তিনি যে বাক্যের অতীত। আমার গুরু এই কথাই আমাকে উপলব্ধি করিয়ে দিয়েছেন যে,—সর্ব্ব জীবের দাতা একজনই, একথা যেন আমার না হয় কখনো বিস্মরণ।

উত্তরকালে, সিদ্ধ হওয়ার পর নানক প্রচার করিতেন—সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ ও গুরু-উপদিষ্ট পন্থায় নাম সাধন করাই ভগবৎ প্রাপ্তির মুখ্য উপায়। সুলতানপুরের এই ধর্ম্মকর্ম্মময় জীবনে ভাগ্যবান নানকের সম্মুখে এই সদ্‌গুরুর আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। স্বীয় গুরুর পরিচয় উদ্‌ঘাটন না করিলেও বারবার কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি তাঁহার দানের কথা

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, স্বরচিত পদে করিয়াছেন স্তুতিগান।

সুলতানপুরের কাছেই রোহরী নামক এক দূরবিস্তারী গহন অরণ্য। নানক আজকাল মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। ধ্যানজপে এক একদিন সারা রাত কাটাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন।

সে-বার ক্রমাগত তিন দিন তাঁহার দেখা নাই। সিদ্ধির সঙ্কল্প নিয়া গহন অরণ্যে সাধক প্রবেশ করিয়াছেন, এ সঙ্কল্প সাধিত না হওয়া অবধি ধ্যানাসন হইতে উত্থিত হইবেন না। গুরু-কৃপায় এবার অভীষ্ট তাঁহার পূর্ণ হইল, সর্ব্ব সত্তায় জাগিয়া উঠিল পরম প্রভুর উপলব্ধি।

হৃদ্‌পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, নয়ন সমক্ষে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে দিব্য জ্যোতির পারাবার। তাই আপ্তকাম সাধক নানকের কণ্ঠ হইতে সেদিন নিঃসৃত হইল বন্দনা গান—

"সভ মহি জ্যোতি জ্যোতি হৈ সোই
তিসদৈ চানণিসভ মহি চানণু হোই।
গুরসাখী জোতি পরগটু হোই।
জো তিস্সু ভাবৈ সু আরতী হোই।

অর্থাৎ, সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে যে জ্যোতি ওতপ্রোত, হে প্রভু, তা তোমারই জ্যোতি। সেই জ্যোতিরই প্রকাশে সব কিছু হয় প্রকাশিত, চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ তারাদল হয় আলোকিত। গুরু সাক্ষী হয়েছেন, গুরুর চরণতলে বসে শিক্ষা নিয়ে অন্তরে সেই জ্যোতির হয়েছে প্রকাশ। হে প্রভু, আমি বুঝেছি, যা তোমার প্রীতি সম্পাদন করে, তাই তোমার শ্রেষ্ঠ আরতি।

অতঃপর নানক লাভ করিলেন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ—'নানক, আমি সদা তোমাতেই রয়েছি। এবার থেকে তুমি নির্লিপ্ত, মুক্তপুরুষ হয়ে জীবের উদ্ধারে ব্রতী হও।'

তিনদিন অজ্ঞাতবাস যাপনের পর নানক সুলতানপুরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ যেন এক নূতন মানুষ। চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে সিদ্ধ পুরুষের দিব্য লাবণ্যশ্রী। সহজ স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রত্যয়ের সুর তাঁহার কথায় ও চাল চলনে। যে উদার ধর্ম্মবোধের উপর তাঁহার উপলব্ধি

প্রতিষ্ঠিত, পরমানন্দে এবার তাহাই তিনি প্রচার শুরু করিলেন।

এ অবস্থায় চাকরি করা আর সম্ভব নয়, অচিরে নবাব সরকারের কাজ তিনি ছাড়িয়া দিলেন।

এবার গৃহত্যাগের পালা। পত্নী সুলখনীর জীবনে আবার ঘনাইয়া আসিয়াছে এক সঙ্কট। স্বামী তাঁহার চির উদাসীন, ভজন সাধন নিয়াই এতকাল ছিলেন মত্ত। তবুও তো সুলখনী মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেন, স্বামী তাঁহার কাছেই রহিয়াছেন। স্বামীকে চোখে দেখিয়া, সেবা যত্ন করিয়াও কিছুটা তৃপ্তি তাঁহার হইত। এবার যে তাহাতেও বঞ্চিত হইলেন! ইতিমধ্যে শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ এই দুই পুত্রের জন্ম হইয়াছে। ইহাদের মানুষ করিয়া তোলা সহজ নয়, একলা তিনি কি করিয়া এসব করিবেন? সারা অন্তর তাই হাহাকার করিয়া উঠে, দুই চোখে নামে অশ্রুধারা।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে নানক স্ত্রীকে কহিতে থাকেন, "কেঁদো না সুলখনী। দেখছো তো, চারদিক ছেয়ে গেছে হিংসা, দ্বন্দ্ব, লোভ—অহঙ্কার আর নীচতায়। মানুষের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে, ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে দীর্ঘশ্বাস ও ক্রন্দন ধ্বনি। আমাকে যে এবার যেতেই হবে। ঘুরে বেড়াবো দেশে দেশে, প্রভুর নাম গেয়ে। চেষ্টা করবো মানুষের জীবনে এনে দিতে শান্তির প্রলেপ। তুমি ভয় পেয়ো না, আবার আমি ফিরে আসবো, সংসারের ভেতরে থেকেই সংসারের প্রভুর সেবা—তাই যে আমার ব্রত।"

পত্নীর ক্রন্দন, বালক পুত্রদ্বয়ের করুণ চাহনি ও প্রিয় ভগ্নী নান্‌কীর মিনতি তাঁহার গতি রোধ করিতে পারিল না।

পথে প্রান্তরে, শ্মশানে, উপবনে নানক ঘুরিয়া বেড়ান। প্রচার করেন উপলব্ধ সত্যের বাণী। সঙ্গে চলে মুসলমান ভক্ত মর্দানা। নানকের স্বরচিত ভজন ও মর্দানার রবাবের সুরঝঙ্কারে দলে দলে লোক ছুটিয়া

আসে। নবীন সাধকের উপদেশ বাণী শুনিয়া মুগ্ধ হয়।

জিজ্ঞাসুরা প্রশ্ন করে, "আপনি কোন মঠের? কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত?"

উত্তর হয়, "আমি নানক নিরংকারী, যে নিরাকার নিয়েছেন সারা বিশ্বসৃষ্টির এই আকার, তাঁর ধ্যানই আমি করি, তাঁরই মহিমা গেয়ে বেড়াই দিকে দিকে। আমার কাছে নেই কোন সম্প্রদায়ের প্রশ্ন, নেই উঁচু-নীচুর পার্থক্য। হিন্দু মুসলমানের ভেদও নেই আমার দৃষ্টিতে। আমি যে দেখছি—হিন্দু আজ দেশে একটিও নেই, তেমনি নেই কোন মুসলমান।"

নানকের কথা পল্লবিত হইয়া নবাবের কাজীর কানে যায়। তিনি গর্জ্জিয়া উঠেন, "সে কি কথা? নানক হিন্দুর ছেলে। হিন্দুদের নিয়ে যা কিছু বলাবলি করুক, তাতে বলবার কিছু নেই। কিন্তু মুসলমানদের সম্পর্কে হাল্‌কা ধরণের কথা বললে তো তা সহ্য করা হবে না।"

নবাব দৌলতখানের কাছে অভিযোগ উঠে, নানককে অবিলম্বে দরবারে হাজির করা হয়। নবাব রুক্ষস্বরে কহেন, "নানক, আমি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি। তুমি নাকি বলে বেড়াচ্ছো—হিন্দু নেই, মুসলমানও কেউ নেই। তবে কি বলতে চাও—এই কাজী সাহেব বা আমি, এই দুজনেই অ-মুসলমান?"

নানক সহাস্যে উত্তর দিলেন, "নবাব সাহেব, প্রকৃত মুসলমান আমি তাঁকেই বলবো, সত্যকার বিশ্বাস জেগেছে যাঁর মনে, পয়গম্বরের উপদেশবাণী রূপায়িত হয়েছে যাঁর জীবনে। অভিমান, লোভ আর কাম ক্রোধ যিনি করেছেন নির্ম্মূল, জীবন আর মৃত্যু যাঁর চোখে হয়ে গেছে সমান—তাকেই বলবো প্রকৃত মুসলমান। ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে যাঁর ইচ্ছার হয়েছে মিলন, পুরোপুরি সত্যের উপলব্ধি নিয়ে যিনি সর্ব্বত্র দেখছেন তাঁর আল্লা-তালাহ্‌কে তাঁকে ছাড়া আর কাকে বলবো মুসলমান? এমন লোক কোথায়? আমায় বলে দিন।"

সভাকক্ষে চাপা গুঞ্জন ধ্বনি উঠিল। এ ব্যাখ্যার উপর সহসা মুখ

ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিতেছেন না। যে উদার ধর্ম্মবোধ হইতে নানক তাঁহার বক্তব্য বলিতেছেন, নবাব তাহা বুঝিয়াছেন। ভিতরে ভিতরে খুশী হইয়াও উঠিয়াছেন।

কাজী কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। কহিলেন, "আচ্ছা, তোমার বক্তৃতা তো অনেক শুনলুম। কিন্তু এবার ঠিক করে বলতো, তুমি কোন ধর্ম্মায় ?"

"কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে তো আমি নেই।"

"কেন ? এ আবার কি রকম অদ্ভুত কথা ?"

"সম্প্রদায় চালিত হয় প্রবর্ত্তকের উপদেশবাণীর মধ্য দিয়ে, আর আমি পথ চলি সেই অনাদি, অনন্ত, পরম পুরুষের প্রদর্শিত আলোতে। আমার চোখে তাই ধর্ম্মের ভেদরেখা হয়ে গেছে বিলুপ্ত।"

সন্ধ্যাকালীন নামাজের সময় হইয়া আসিয়াছে, সভা ভঙ্গ হইল। নবাব সহাস্যে কহিলেন, "নানক, প্রার্থনার জন্য আমরা মসজেদে যাচ্ছি। তুমি তো বললে, ধর্ম্মের ভেদ তোমার চোখে কিছু নেই। আমাদের সাথে মসজেদে গিয়ে নামাজ পড়তে তোমার আপত্তি আছে ?

"কিছু মাত্র নয়। ঈশ্বরের যে কোন স্তুতিই যে আমার শ্রদ্ধার বস্তু।" —এ কথা বলিয়া নানকও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন।

নামাজ শেষ হইয়া গেল। প্রার্থনাগৃহের এক প্রান্তে নানক চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছেন।

কাজী আসিয়া চাপিয়া ধরিলেন, "কই, তুমি তো আমাদের সঙ্গে যোগ দাওনি। এই বুঝি তোমার সত্যবাদিতা ?"

"কাজী সাহেব, আপনাকে অনুসরণ করে নামাজ পড়বো, ভগবানের কাছে প্রাণের প্রার্থনা জানাবো, এই আশা নিয়েই তো এখানে এসেছিলাম। কিন্তু অনুসরণ করবো কাকে ? আপনি তো সত্য সত্যিই আজ এখানে নামাজ পড়েন নি।"

"মুখ সামলে কথা বল, বেয়াদপ।" অভিমানহত কাজী রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

নবাবও কম উত্তেজিত হন নাই। কহিলেন, "নানক, এর জবাবদিহি তোমায় করতে হবে, নইলে পাবে কঠোর দণ্ড।"

"হুজুর, সত্যি বলছি, আমি যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম—কাজীসাহেব নামাজ পড়েন নি, আর যদি অভয় দেন তো বলি—নামাজ আপনিও পড়েন নি।"

"তবে আমরা এতক্ষণ এখানে কি করেছি?"

"তা হলে শুনুন। কাজী সাহেবের ঘোটকীর এক বাচ্চা হয়েছে কিছুদিন আগে। বাড়ীর অঙ্গনে এই বাচ্চাটা ঘুরে বেড়ায়। পাশেই রয়েছে এক কূয়ো, তাতে ওটা যাতে পড়ে না যায় এই দুশ্চিন্তাই তিনি করছিলেন নামাজের সময়।"

কাজী ভয়ে বিস্ময়ে নিরুত্তর হইয়া আছেন। সত্যই তাই। এই তরুণ সাধক কি তবে অন্তর্য্যামী?

নানক বলিয়া চলিলেন, "নবাব সাহেবের মনও নামাজ ছেড়ে বিচরণ করছিল কান্দাহার অঞ্চলে। একরাশ টাকা দিয়ে আপনি সেখানে কর্ম্মচারীদের পাঠিয়েছেন ঘোড়া কেনবার জন্য। আপনি সেই কথাই বারবার ভাবছিলেন।"

সব কথা বর্ণে বর্ণে সত্য—নবাবের অস্বীকার করার উপায় নাই। কাজীর আত্মাভিমানও ইতিমধ্যে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উভয়ে ইতিমধ্যে বুঝিয়া নিয়াছেন, নানক আজ এক শক্তিধর মহাপুরুষে পরিণত। অতঃপর যথোপযুক্ত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া নানককে তাঁহারা বিদায় দিলেন।

এবার শুরু হয় নানকের পরিব্রাজক-জীবন, আর পরিব্রাজনের পথে পথে বহু নরনারীর জীবনে করুণার ধারা তিনি ঢালিয়া দেন, প্রকাশিত হইতে থাকে যোগবিভূতির নানা ঐশ্বর্য্য।

পদযাত্রার পথে সেদিন তিনি সঈদপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। হঠাৎ শহরের এক প্রান্তে লালু নামক ছুতোর মিস্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার

দেখা। আর্থিক স্বচ্ছলতা লালুর কোন দিনই নাই, দিনরাত পরিশ্রম করিয়া তাহাকে সংসার চালাইতে হয়। কিন্তু সে বড় ভক্তিমান। সাধু-সন্ত ও ফকীরদের দর্শন পাওয়ামাত্র যুক্তকরে আমন্ত্রণ জানায়, গৃহে আনিয়া সাধ্যমত সেবাযত্ন করে।

পরম সমাদরে সেদিন নানককে সে আপন গৃহে নিয়া আসিল। হলদে রঙের আলখাল্লা পরা, প্রিয়দর্শন এই নূতন সাধুকে দর্শনের জন্য দলে দলে লোক লালুর কুটিরে আসিতে থাকে, তাঁহার ধর্ম্ম-উপদেশ শুনিয়া সকলের মনে জাগ্রত হয় আশা ও উৎসাহ। ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র সাধু নানকের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

পাঠান সুবাদারের দেওয়ান, মালিক ভগো এই শহরে অবস্থান করেন। পুণ্য অর্জ্জনের জন্য এ সময়ে তিনি পীর, ফকীর ও গরীব নরনারীদের কয়েকদিন ধরিয়া ভোজন করাইতেছেন। হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের জন্যও পৃথক ভাণ্ডারার বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

কথাপ্রসঙ্গে মালিক ভগো শুনিলেন, কিছুদিন যাবৎ লালু ছুতোরের বাড়ীতে এক হিন্দু সাধু আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভাণ্ডারায় এ সাধু আজ অবধি উপস্থিত হন নাই।

দেওয়ান সাহেবের আত্মাভিমানে ঘা লাগিয়া গেল। এখানকার সব সাধু ফকীরেরাই তো তাঁহার নিমন্ত্রণে যোগ দিয়াছেন, পরিতোষপূর্ব্বক ভোজনও করিয়াছেন। লালুর অতিথিটি কি তবে অবজ্ঞা করিয়াই তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন নাই? সেই দিনই লোক পাঠাইয়া নানককে ডাকাইয়া আনিলেন। লালুও ভয়ে ভয়ে সঙ্গে আসিয়াছে। কি জানি তাহার অতিথিটির অদৃষ্টে আজ পাঠান দেওয়ানের কাছে কোন লাঞ্ছনা আছে তাহা কে জানে?

মালিক ভগো প্রশ্ন করিলেন, "আপনি তো শুনছি, উদার স্বভাবের সাধু, জাতিও মানেন না। তবে আমার ভাণ্ডারায় ভোজন করতে আসেন নি কেন? স্থানীয় সব সাধুদেরই তো সমাদর করে আহ্বান জানানো হয়েছে।"

নানক কোন উত্তর না দিয়া মিটিমিটি হাসিতেছেন। মালিক ভগো উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "আমার কথার উত্তর দিন। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে আপনাকে ছাড়া হবে না। দেখছি, দেওয়ান মালিক ভগোকে এখনো আপনি চেনেন নি।"

"দেওয়ান সাহেব, চিনেছি বলেই তো, আপনার পুরী মালপোয়া খেতে আসতে পারি নি।"

"তার মানে ?"—মালিক ভগো ক্রোধে একেবারে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম।

"মানে আমি এখনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, দেওয়ান সাহেব। আপনি আপনার ভাণ্ডারার ঘর থেকে আমার জন্য কিছু খাবার আনিয়ে দিন। আর লালুও এখনি চলে যাক তার ঘরে, আমার জন্য সেখানে যে আহার্য্য তৈরী হচ্ছে, তা নিয়ে আসুক। তারপর আমি আমার বক্তব্য বলছি।"

নানকের কথামত কাজ করা হইল। মালিক ভগোর গৃহে প্রস্তুত-করা পুরী-মালপোয়া-মিষ্টির পাত্র স্থাপন করা হইল তাঁহার সম্মুখে। লালুর বাড়ীর দুই টুকরা শুষ্ক রুটিও পাশে রহিয়াছে।

আত্মম্ভরী দেওয়ানকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য নানক এ সময়ে প্রকটিত করিলেন এক বিস্ময়কর যোগবিভূতি। শিখগ্রন্থ 'জনমসাখী'তে এ ঘটনাটির উল্লেখ রহিয়াছে।

মালিক ভগোর খাদ্যগুলি হাতে নিয়া নানক নিঙড়াইতে লাগিলেন। সমবেত সকলের বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টির সমক্ষে ঐ খাদ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতে থাকে টাটকা রক্তধারা। আবার লালুর খাদ্যকে পেষণ করার ফলে নিঃসৃত হয় শুভ্র সুপেয় গো-দুগ্ধ।

এ অদ্ভুত, অমানুষী কাণ্ড প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে মালিক ভগোর সকল দম্ভ ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। নানকের চরণে পতিত হইয়া বারবার তিনি কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

নানক নিরংকারীর প্রশস্তিতে সারা শহর সেদিন মুখরিত হইয়া উঠে,

লালুর গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। নানক প্রমাদ গণিলেন।

বালা এবং মর্দানাকে সঙ্গে নিয়া পরদিনই তিনি সঈদপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

পথ চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রাত্রির জন্য নানক ও তাঁহার সঙ্গী ভক্তদ্বয় সেদিন সুজন নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। লোকটি দেখিতে পরম ধার্ম্মিক। কপালে লম্বা ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় বিলম্বিত স্ফটিকের মালা। মুখে সদাই যেন মধু ঝরিতেছে। অতিথিসেবাই নাকি তাহার জীবনের প্রধান ব্রত। এজন্য আয়োজনের কোন ত্রুটিও নাই। বাড়ীর সদর দরজার পাশেই সুজন তাহার হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের অতিথিদের জন্য দুইটি পৃথক বিশ্রামভবন নির্ম্মাণ করিয়াছে। রাস্তার ধারেই সে বসিয়া থাকে, আর বিদেশী পথিক দেখিলেই সাদরে স্বগৃহে আহ্বান জানায়।

এই সুজন আসলে এক ছদ্মবেশী দস্যু। ধার্ম্মিক ও অতিথিবৎসল ভদ্রলোকের বেশ ধরিয়া নিরীহ পথচারীদের প্রায়ই ভুলাইয়া সে নিজের কবলে টানিয়া আনে। তারপর গভীর রাতে, শ্রান্ত অতিথিরা যখন নিদ্রায় অভিভূত হয়, সে তাহাদের নির্ব্বিচারে হত্যা করে—টাকাকড়ি করে আত্মসাৎ।

নানকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সাধুবেশধারী এই দস্যুকে চিনিয়া নিতে একটুও ভুল করে নাই।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া আসিয়াছে, সুজন তাহার শিকারের আশায় প্রতীক্ষারত। এমন সময় নানক মর্দানাকে রবাব বাজানোর আদেশ দিলেন, নিজে ধরিলেন সুমধুর ভজন। এ ভক্তি-সঙ্গীতের আবেগ ও সংবেদন ধীরে ধীরে দস্যুর হৃদয় গলাইয়া দেয়।

পাশের কক্ষ হইতে আকুল হইয়া সে ছুটিয়া আসে, কাঁদিতে কাঁদিতে নানকের চরণতলে পতিত হয়।

হৃদয়ে তাহার এবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে অনুতাপের আগুন। কাতরস্বরে

বলিতে থাকে "মহারাজ, আমি ঠিকই বুঝেছি, অতিথির বেশে আপনি এসেছেন আমায় উদ্ধার করতে। আমি মহাপাপী। এমন কোন ঘৃণ্য অপরাধ নেই যা আজ অবধি আমি করিনি। আমায় আপনি দয়া করুন, আর বলে দিন, কি করে আমার পাপের স্খালন হবে।"

অপার প্রসন্নতায় নানকের আনন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দস্যু সুজনকে বক্ষে ধারণ করিয়া আশ্বাস দিলেন, "ভাই, কোন ভয় নেই তোমার। 'অকাল পুরুষ' নিশ্চয় করবেন তোমায় উদ্ধার। তিনি যে পরম কৃপালু। তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বত্র রয়েছে প্রসারিত। তোমার এ অনুতাপের জ্বালা তিনি টের পেয়েছেন। এবার তিনি এগিয়ে আসবেন।"

"আপনার পরম আশ্রয় পেয়েছি, আর আমার কোন ভয় নেই। এবার কি আমায় করতে হবে আদেশ করুন।"

"সুজন, এবার থেকে তোমার সাধনা শুরু হোক অনুতাপ আর পাপস্খালনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শুধু মুখের কথাতেই তো অনুতাপ করা হয় না, ভাই। সারা জীবনে যত কিছু অপকর্ম্ম করেছ, তা এবার স্মরণ কর। যারা তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে, যত পার সে ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা কর। তবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে মুক্তি।"

ভক্ত ও মুমুক্ষুদের জন্য নানক এ সময় তাঁহার 'জপজী' গ্রন্থ রচনা শুরু করিয়াছেন। সুজনের স্মরণ ও মননের জন্য তাহা হইতে দুই একটি পৌড়ী শুনাইয়া দিলেন। আর দিলেন তাহাকে 'সৎ-নাম'।

দস্যু সুজনের জীবনে এক অদ্ভুত রূপান্তর আসিয়া গেল। এখন হইতে তাহার জীবনের প্রধান কাজ—পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা। এজন্য দিনের পর দিন কত অপমান লাঞ্ছনা যে তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ভক্ত সুজন প্রাণপণে গুরুজীর উপদেশ পালন করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্ম ও নামপ্রেম হইতে একদিনের তরেও বিচ্যুত হন নাই। এক নিষ্ঠাবান শিখ হিসাবে সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

আর্ত্ত মানুষের সেবা ও সাধকদের ধর্ম্মচর্চ্চার সুবিধার জন্য সুজন নিজের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া উত্তরকালে এক ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। ইহাই প্রথম শিখ-ধর্ম্মশালা।

ঘুরিতে ঘুরিতে নানক পাঞ্জাবের বাতালা নামক স্থানে আসিয়াছেন। রাবী নদীর তীরে, বটবৃক্ষতলে বসিয়া মনের আনন্দে গাহিতেছেন ভজন গান। যে তাঁহার এই মধুর স্তুতি-সঙ্গীত শুনে, সে-ই মুগ্ধ হইয়া যায়। দিকে দিকে এই নবাগত সাধু পুরুষের কথা ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দু মুসলমান, উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মুর্খ সকলেই দলে দলে আসিয়া সেদিন সেখানে ভীড় করিতে থাকে।

কড়োরিয়া এই অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদার। নানকের এমন জনপ্রিয়তা দেখিয়া তিনি মহা রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। এক অখ্যাতনামা হিন্দু সাধুকে নিয়া কেন শুধু এত হৈ চৈ? এ তাঁহার একেবারে অসহ্য। স্থির করিলেন, আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই সাধুকে দমন করিবেন। এ অঞ্চল হইতে তাহাকে দূর করিবেনই।

কোমরবন্ধে তরবারি ঝুলাইয়া, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া কড়োরিয়া নদাতীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে চলিল তাঁহার একদল রক্ষী ও কৌতূহলী মোসাহেব।

কিছুদূর যাওয়ার পরই ঘটে এক আকস্মিক দুর্ঘটনা। পথ চলিতে গিয়া কড়োরিয়ার অশ্বটির পা ফসকিয়া যায় এবং মনিবকে নিয়া উহা ভূতলে পতিত হয়। আঘাত গুরুতর হয় নাই, কিন্তু কড়োরিয়া দুই দিন গৃহে বসিয়া বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন।

একটু সুস্থ হইয়াই নানকের আস্তানার দিকে তিনি রওনা হইলেন। কিন্তু বাড়ীর সীমানা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল আর এক দুর্দ্দৈব। নিজের দৃষ্টিশক্তিকে হঠাৎ তিনি হারাইয়া ফেলিলেন। শত চেষ্টা করিয়াও চারিদিকের কোন বস্তুই আর দেখিতে পাইতেছেন না। অথচ গৃহে ফিরিয়া আসার পরই দেখা গেল, পূর্ব্বেকার দৃষ্টি শক্তি তিনি

আবার ফিরিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার কাছে এ এক অদ্ভুত রহস্য!

জমিদার কড়োরিয়া স্বভাবতঃই বড় দাম্ভিক। তাছাড়া, এই সামান্য কাজে এমনতর বাধা পাইয়া জেদ তাঁহার আরো বাড়িয়া গেল। আবার অশ্বপৃষ্ঠে তিনি চড়িয়া বসিলেন।

এবারকার অভিজ্ঞতাও পূর্ব্ববৎ। একটু আগাইয়া যাইতেই দুই চোখ তাঁহার একেবারে অন্ধ হইয়া গেল।

এবার কড়োরিয়ার অন্তরে বড় ভয় ঢুকিয়া গিয়াছে। অনুচরদের প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি বলতো? বাড়ীর বার হলেই এ রকমটা হচ্ছে কেন?"

সঙ্গীরা কহিল, "হুজুর, দেখে শুনে মনে হচ্ছে, নানক এক সত্যিকার বড় সাধক, ঈশ্বরের প্রিয় জন। আপনি শুধু শুধু তাঁর ওপর চটে গিয়েছেন, তাঁকে এই গাঁ থেকে বার করে দিতে যাচ্ছেন। বোধ হচ্ছে, আপনার এ কাজটায় ঈশ্বরের তেমন সমর্থন নেই, তাই এতো দুর্ঘটনা বার বার ঘটছে।"

কড়োরিয়ার মন এবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নরম সুরে কহিলেন, "তা হলে চল, তাঁকে আমাদের সেলাম জানিয়ে আসি।"

অশ্বচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে এ আবার কি কাণ্ড? দৃষ্টিশক্তি তাঁহার কোথায় হারাইয়া গেল?

হতাশভাবে সঙ্গীদের তিনি কহিলেন, "এবার তবে তোমরা আমায় কি করতে বলো? ছাখো, নানককে সেলাম জানাতে যাবো, তাতেও পড়ছে এই বাধা।"

"হুজুর আপনি একটা মস্ত ভুল করছেন। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে কি সাধু ফকীরদের কাছে কখনো যেতে আছে? সাধুর দোয়া মাগতে যাচ্ছেন—আপনার উচিত হবে, পায়ে হেঁটে নম্র হয়ে তাঁর কাছে যাওয়া।"

এবার কড়োরিয়ার চৈতন্যোদয় হইল। দৈন্যভরে নানকের কাছে গিয়া পতিত হইলেন তাঁহার চরণে। প্রেমভরে বারবার আলিঙ্গন দিয়া

কৃপালু নানক তাঁহাকে সেদিন নানা সদুপদেশ দান করিলেন।

কড়োরিয়া যুক্ত করে কহিলেন, "আপনি দয়া করে আজ আমায় শিক্ষা দিয়েছেন, আমার মহা কল্যাণ করেছেন। আপনার দর্শন পেয়ে হয়েছি কৃতার্থ। আমার কিন্তু একটা নিবেদন আছে। এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল আমারই জমিদারীর অন্তর্গত। আমার একান্ত ইচ্ছে, এখানকার উর্ব্বর ভূমিগুলি আপনার কাজে আমি দান করি। দয়া করে আমায় অনুমতি দিন। আপনার মত মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে এখানে এক নূতন গ্রাম, নূতন সমাজ গড়ে উঠুক, তাই আমি চাই।"

নানক সহাস্যে কহিলেন, "এ সংসারের সব ভূমির মালিকই হচ্ছেন 'করতার'—যিনি দৃশ্যমান সব কিছু করেছেন সৃষ্টি। তুমি ধন্য যে, তাঁর নাম করে এই জমি তাঁর কাজে বিলিয়ে দিচ্ছ। তোমায় আমি অনুমতি দিলাম। আজ হতে এ নূতন উপনিবেশের নাম হবে করতারপুর।"

অল্প দিনের মধ্যেই করতারপুরে জনবসতি শুরু হইয়া যায়। উত্তর-কালে এক বর্দ্ধিষ্ণু জনপদরূপে এস্থান পরিচিত হইয়া উঠে। অতঃপর নানকের পরিবারবর্গকেও এখানে আনয়ন করা হয় এবং তখন হইতে করতারপুর হইয়া উঠে নানকের অধিষ্ঠানের স্থান আর নানক-পন্থীদের প্রধান কেন্দ্র।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়াছে নানকের পদযাত্রা আর ইহারই মধ্য দিয়া দিনের পর দিন দুঃস্থ, দুর্গত ও পতিত জনের সান্নিধ্যে তিনি আসিতেছেন। যেখানেই যান, তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্পর্শে জাগিয়া উঠে আশা ও আনন্দের আলো, ধ্বনিত হইতে থাকে পরম প্রভুর জয়গান।

হঠাৎ একদিন বালা ও মর্দানাকে তিনি কহিলেন, "এবার একবার তালওয়ান্দিতে আমায় ফিরতে হবে। আমার আত্মার আত্মীয়, পরম সুহৃদ রায়-বুলারের কাছে এসে গিয়েছে পরপারের ডাক। চির বিদায় নেবার আগে একবার তাঁকে দেখে আসতে হয়।"

তালওয়ান্দির গড়ে বৃদ্ধ রায়-বুলার অন্তিম সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। নানক ধীরপদে তাঁহার শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ললাটে রাখিলেন স্নেহস্নিগ্ধ হস্তের স্পর্শ। তারপর কহিলেন, "রায়-বুলার, তোমার অন্তরের আহ্বান পৌঁচেছে আমার কাছে। এই ছাখো, আমি আজ এসেছি।"

তালওয়ান্দির সেদিনকার সেই আপনভোলা ক্ষুদ্র বালক আজ অগণিত মানুষের মুক্তির দিশারী। রায়-বুলারের বহুদিনের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ। নানকের যে আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার কথা তিনি এতকাল ভাবিয়া আসিতেছিলেন তাহা এবার সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। এই বৃদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের মনে অভিলাষ ছিল, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে নানকের যেন দেখা পান। শয্যাপার্শ্বে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। রোগ পাণ্ডুর কপোল বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

নানকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, নিজগৃহের শান্তিময় পরিবেশে রায়-বুলার দেহত্যাগ করিলেন।

জনক জননী ও তালওয়ান্দির অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের পর নানক ফিরিয়া যান করতারপুরে।

পথে এক বৃক্ষতলে বসিয়া মর্দানা ও বালার সহিত নানক বিশ্রাম করিতেছেন। মর্দানা সঙ্কোচভরে কহিলেন, "গুরুজী, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, অভয় দেন তো নিবেদন করি।"

"খুলে বল মর্দানা, কি তোমার প্রশ্ন।"

"গুরুজী আমি দেখেছি রায়-বুলারকে দেখবার জন্য আপনি কি তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে সেদিন তালওয়ান্দিতে ছুটে এলেন। পথে আসতে আসতে বার বার বল্লেছেন, রায়-বুলারের মত পরম সুহৃদ আপনার খুব কমই আছে। কিন্তু আমার বড় আশ্চর্য্য লাগছে, সেই পরম সুহৃদের মৃত্যুর সময়ে আপনার চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জলও আজ গড়িয়ে পড়ল না, হলো না কোনই ভাবান্তর। আপনি তার আত্মপরিজনের ক্রন্দন ও

শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে নির্ব্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এটা সে সময়ে আমার বড় অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে।"

"তবে শোন মর্দানা। রায়-বুলার সৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক, মৃত্যুর পর তাঁর সদ্‌গতি হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁর জন্য শোক করবার কিছু নেই। তাছাড়া, আমি যে জেনেছি, মৃত্যু হচ্ছে জীবনেরই সিংহদ্বার—মানবাত্মার আর এক নূতন অভিযাত্রা এর ভেতর দিয়ে শুরু হয়। মর্দানা, জেনে রেখো, যা কিছুরই অস্তিত্ব রয়েছে, তা কখনো বিনষ্ট হয় না। বার বার ঘটে শুধু তার রূপান্তর। ভেতরকার আত্মা থাকে বিকারহীন, পরিণতি-হীন, বদলে যায় শুধু বাইরের দেহের আবরণ। সে আবরণ টুটে গেলে দুঃখ করবার কিছুই নেই। দেখছো তো, যে গাছটার তলায় আজ তুমি বসে রয়েছো, শীতের আক্রমণে তা হয়ে পড়েছে বিশীর্ণ, ঝরে পড়েছে তার পত্র পুষ্পদল। আবার আসবে এর দেহে নূতন প্রাণের জোয়ার, সবুজ পাতায় আর রঙীন ফুলে হয়ে উঠবে অপরূপ। তেমনি মানুষের দেহটা যখন জীর্ণ হয়, তা খসে পড়ে অনিবার্য্যরূপে, আবার আত্মা গ্রহণ করে নূতনতর দেহ। শুরু হয় নূতনতর জীবন-লীলা। এমনি করেই তো পরমপ্রভু অনাদি অনন্তকাল ধরে আমাদের নিয়ে খেলছেন তাঁর অবিশ্রান্ত খেলা।"

ভক্তদ্বয়সহ নানক আর একবার পরিব্রাজনে বাহির হইয়াছেন। পথের ধারেই দেখা গেল এক প্রকাণ্ড মেলা। হাজার হাজার নরনারীর ভীড় সেখানে। হাসি আনন্দ আলো গানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, এখানকার বিখ্যাত ফকীর সাহেবের জন্মদিনে এই পবিত্র মেলা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ দিনে জনসাধারণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আনন্দ উৎসব করে, তাঁহার চরণে শ্রদ্ধা ও নতি জানায়।

ফকীর সাহেবের নাম সদা-সুহাগন্। এ নাম তাঁহার নিজেরই

দেওয়া। সদা-সুহাগন্ কথাটির অর্থ—চির সোহাগিনী। প্রেমময় ভগবানের প্রেমিকারূপে ফকীরের সাধনা,আর এ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া তিনি ও তাঁহার ভক্তেরা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়ান।

কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে নানকের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল স্মিত হাস্য।

ফকীরের আবাসস্থলে গিয়া তিনি তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইলেন। ভিতরকার এক প্রকোষ্ঠে ফকীর নিভৃতে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা জানাইলেন, "এখন তো ফকীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না। এ সময়ে তাঁর একটুও অবসর নেই। নিরালায় বসে তাঁর পরম প্রিয় খোদার সঙ্গে তিনি প্রেমালাপ করছেন। দেখছেন না, দুয়ারের পাশে শত শত লোক তাঁর দর্শনের আশায় কখন থেকে বসে আছে? এখন অবধি কারুরই অনুমতি মেলে নি।"

নানক গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তাহলে দেখাছ, এবার রহস্যের পর্দা সরাতেই হোল।"

দর্শনার্থী আরো বহু লোক দ্বারে সমবেত রহিয়াছে। তাহারা কৌতূহলী হইয়া উঠে, ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে—"রহস্যের পর্দা সরানো? সে আবার কি কথা?"

"তাহলে কক্ষের ভেতরে গিয়ে দ্যাখো, ফকীর কার সঙ্গে বসে নিভৃতে আলাপ করছেন।"—দৃঢ়স্বরে কথা কয়টি বলিয়া নানক নিকটস্থ আম্রবনে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এতক্ষণ ফকীরের দর্শনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে করিতে একদল লোক অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এবার নানকের দৃঢ় কণ্ঠের মন্তব্য শুনিয়া তাহারা সাহসী হইয়া উঠে, ফকীরের গুপ্ত প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে সকলে একযোগে ঢুকিয়া পড়ে।

জনতার সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয় এক বিসদৃশ দৃশ্য। নিভৃতসাধন ভজন কিছু নয়, ফকীর সাহেব সেখানে কয়েকটি সুন্দরী তরুণী নিয়া রঙ্গরসে মত্ত রহিয়াছেন।

দর্শনার্থীরা এবার কপটী ফকীরের উপর মারমুখী হইয়া উঠিয়াছে। বেগতিক দেখিয়া ফকীর তখনি উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। উত্তেজিত জনতার আক্রমণে লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল তাঁহার সুসাজ্জিত বস্ত্রাবাস, ঝাড়লণ্ঠন, আর মেলা-অঙ্গনের বাদ্যভাণ্ড।

এদিকে নানক আম্রকাননে বসিয়া তাঁহার ভক্তিরসাত্মক গীত শুরু করিয়াছেন। লোকে তাঁহার দিব্যকান্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হইতেছে, ভজন ও উপদেশ শুনিয়া লাভ করিতেছে অপার শান্তি। এই সিদ্ধপুরুষের নাম এতদিন অনেকেই কানে শুনিয়াছেন, এবার তাঁহার দর্শনে সকলে কৃতার্থ হইলেন।

নানকের পরিচয়, তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের খ্যাতির কথা সদা-সুহাগন ফকীরও আগে শুনিয়াছেন। এবার অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি নানকের চরণে আশ্রয় নিতে আসিলেন।

জনতা এখনো ফকীরের উপর চটিয়া রহিয়াছে, নানকের কাছে আসা মাত্র উত্তেজিতভাবে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

নানক দৃঢ়স্বরে আদেশ দিলেন, "তোমরা সবাই এখন শান্ত হয়ে বস, ভগবানের রাজ্যে সব পাপেরই ক্ষমা আছে, সব পাপেরই আছে পরিত্রাণ। ফকীরের কি বলবার আছে শুনতে দাও।"

ফকীর করজোড়ে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি পরম কৃপালু। কপট জীবনের মোহ থেকে, ভ্রষ্টাচার থেকে আমায় রক্ষা করেছেন। এবার একান্তভাবে আপনার শরণ নিলাম, বলে দিন আমায় সত্যকারের উদ্ধারের পথ।"

"হ্যাঁ ভাই, সত্যপথ দেখাবো বলেই তো তোমার কপটতার মুখোস এমন করে ভেঙে দিলাম। এবার মুক্তির সাধনায় এগিয়ে পড়ো।"

"সাধনার ইঙ্গিত আমায় কিছু দিন।"

"যে প্রিয়তম, যে প্রাণপ্রভুকে আমরা খুঁজবো, তিনি যে প্রাণেরই গোপনপুরে বসে আছেন। বাইরে তাঁকে খুঁজলে তো চলবে না। বেশতো, তুমি তোমার প্রেমসাধনার পথেই এগিয়ে যাও, লাভ কর সেই

প্রেমময়কে। কিন্তু কখনো যেন ভুলে যেয়ো না, স্থূল জগতের প্রেমিকের মত সীমাবদ্ধ নয় তাঁর দৃষ্টি—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান। আদি-অন্ত-জন্ম-মৃত্যুহীন তিনি। এমনিতর প্রেমিকের সঙ্গে এবার থেকে তোমায় করতে হবে প্রেম।"

"তাঁর পন্থা কি বলে দিন।"

"শুধু বাইরেকার প্রেম দেখালে, আর্ত্তি আর অশ্রুবর্ষণ করলে এ মহাপ্রেমিককে পাওয়া যায় না, ভাই। এ জন্য চাই কায়-মন-বাক্যের পবিত্রতা, চাই ত্যাগ বৈরাগ্য, চাই সত্যের ধৃতি। মিথ্যাচার, মায়া আর আসক্তির চিহ্ন মাত্র থাকলে যে তাঁকে লাভ করা যায় না।"

"সত্যকার ঈশ্বর প্রেম কি, কি করেই বা তা আসবে, তা কৃপা করে আমায় বলে দিন।"

"এ প্রেম তো ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না, এ হচ্ছে উপলব্ধির বস্তু। আর এ উপলব্ধি পেতে হলে তোমায় ঢেলে দিতে হবে সর্ব্বস্ব, তাঁর চরণে করতে হবে আত্ম-সমর্পণ। এই আত্ম-সমর্পণের পথ ধরেই হয়ে ওঠো সেই প্রেমিক পুরুষের 'মনোরমা'। তিনি তোমায় দেখে মুগ্ধ হবেন, তবে তো সফল হবে তোমার প্রেম।"

সমবেত দর্শনার্থীদের দিকে চাহিয়া নানক ধরিলেন সদ্যরচিত এক সুমধুর ভজন। মর্দানার রবাব ধ্বনিত হইয়া উঠিল তাহার সাথে।

—এই দেহ রয়েছে মায়া মোহে আচ্ছন্ন হয়ে,
আসক্তির জট পাকানো চারিদিকে।
কি করে হবে তবে প্রিয় মিলন ?
ওগো কনে ! শুধু রঙীন ওড়না আর ঘাঘ্‌রা দিয়ে
কি করে করবে তোমার বরের মন হরণ ?
ঢেলে দাও তোমার অনাবিল প্রেম—
এ প্রেমের রঙ জৌলুষের কখনো যে নেই বিনাশ।
এ প্রেম পেয়েছে যারা, তারাই ধন্য,
চিরনমস্য তারা নানকের।

যারা প্রভুর প্রিয় নাম সদাই করে গান,
তাদের দিকেই যে প্রভু আমার করেন নয়নপাত,
—চিরতরে করেন তাদের অঙ্গীকার।

এবার একান্তে বসিয়া নানক ফকীরকে ভক্তি-সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বাদি শিখাইয়া দেন। তারপর স্থানত্যাগ করেন। এই সদা-সুহাগন ফকীর উত্তরকালে এক খ্যাতনামা প্রেমিকভক্তে পরিণত হন।

পরিব্রাজন ও প্রচারের জন্য নানক কয়েকবার করতারপুর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন, দূর দূরান্তে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। মুসলমান সুফী সাধকদের অনেকেরই সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। ইঁহাদের মূল ধর্ম্মস্থান মক্কা মদিনা দেখার ইচ্ছা একবার তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। তাই ভক্ত মর্দানাকে সঙ্গে করিয়া একবার তিনি পদব্রজে সারা মধ্য-প্রাচ্য ভ্রমণ করিয়া আসেন। এই সময়ে তত্রত্য অঞ্চলের সাধকেরা তাঁহার যোগ বিভূতির নানা পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেবার তিনি কিছুদিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করিতেছেন। মুসলমান ভক্তদের তখন নামাজের সময়। নানক ভাবতন্ময় হইয়া আপন মনে শয্যায় শুইয়া আছেন, কাবা-শরীফের দিকে তাঁহার পদদ্বয় রহিয়াছে প্রসারিত। কাবার মাতোয়ালীর দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়িল, তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "ওরে দরবেশ, তোর এত বড় সাহস! খোদার পবিত্রস্থান বলে যে কাবা সবার কাছে সম্মান পায়, সেদিকে তুই তোর পা রেখেছিস! ভালো চাস তো এই মুহূর্ত্তে পা সরিয়ে নে!"

নানক শায়িত অবস্থায় উত্তর দিলেন, "ভাই, সেই দিকেই এ পা দুটো সরিয়ে দাও, যেখানে ঈশ্বর অবস্থান করেন না, আর যেখানে নেই তোমার কাবা-শরীফ।"

কথিত আছে, নানকের পা দুইটি এ সময়ে টানিয়া সরাইতে গিয়া এই মাতোয়ালী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়—যে দিকেই তাঁহার পদদ্বয় স্থাপিত করা হয়, দেখা যায়, সেই দিকেই কাবা-মসজেদ স্থান পরিবর্ত্তন

করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছে। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সকলে হতবাক হইয়া যায়। নানক যে একজন যোগবিভূতিসম্পন্ন উচ্চস্তরের সাধক এ বিষয়ে তাহাদের কোন সন্দেহ থাকে না।

মক্কা হইতে নানক মদিনা, বাগ্‌দাদ ও অন্যান্য অঞ্চল ঘুরিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দিল্লীতে তখন লোদী বংশীয়দের রাজত্ব চলিতেছে। বহ্‌লুল লোদী দুর্ব্বল হস্তে তাঁহার রাজদণ্ড ধারণ করিয়া আছেন। এই সময়ে দুর্দ্ধর্ষ মুঘলবাহিনী নিয়া বাবর শাহ পশ্চিম ভারতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পাঞ্জাবের এক একটি অঞ্চলে তিনি আগাইয়া চলিয়াছেন, আর পাঠানদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ধ্বসিয়া পড়িতেছে।

বহ্‌লুল লোদীর আত্মীয়, দৌলতখান তখন পাঞ্জাবের এক বৃহৎ ভূভাগের শাসনকর্ত্তা। সুলতানপুরে থাকিয়া তিনি শাসন পরিচালনা করেন। বাবরের আক্রমণের মুখে তাঁহার সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

আজিকার দিনের গুজরানওয়ালা-জেলার আমিনাবাদ পূর্ব্বে সঈদপুর বলিয়া পরিচিত ছিল। এই সঈদপুর সেবার মুঘলদের হাতে পড়িয়াছে। হত্যা, অগ্নিদাহ আর লুণ্ঠনের বিভীষিকাময় রাজত্ব তখন চারিদিকে। যুদ্ধক্ষেত্রে বহু লোক হতাহত হইয়া পড়িয়া আছে। বন্দীদের সংখ্যাও হইবে কয়েক হাজার। বাবরের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ মীরখাঁর উপর পড়িয়াছে এই বন্দীদের ভার।

নানক ও মর্দানা এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। মুঘল সৈন্যের ছাউনীর কাছে যাওয়া মাত্র দুইজনকে তাহারা ধরিয়া ফেলিল। নানকের পরিধানে পীতবর্ণের আলখাল্লা, মাথায় পাগ্‌ড়ী, গলায় স্ফটিকের মালা। সাধুর বেশ দেখিয়া সৈন্যেরা প্রাণে মারিল না, টানিতে টানিতে তাঁহাকে ও মর্দানাকে সেনাধ্যক্ষ মীর খাঁর নিকট হাজির করিল।

মীর খাঁ আদেশ দিলেন, "এ দুটোকে এখনই বন্দীনিবাসে পাঠিয়ে দাও। সেখানে গিয়ে গম পেষাই করুক, আমার সেনাদের রসদ সংগ্রহের

কাজ এগোবে।"

সেনা-ছাউনি হইতে বন্দীনিবাস প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। নানকের মাথায় চাপানো হইয়াছে একটি বড় বোঝা, আর মর্দানাকে দেওয়া হইয়াছে ঘোড়ার সহিসের কর্ম্ম।

নানক কিন্তু পরমানন্দে বোঝা মাথায় নিয়াই আগাইয়া চলিয়াছেন। কিছুদূরে গিয়া কহিলেন, "মর্দানা, অনেকক্ষণ প্রভুর নাম গান করা হয়নি। তুমি এমন চুপচাপ কেন? রবাব বাজাও, আমি গাইছি।"

"গুরুজী, আমার হাত যে আটকা রয়েছে। ঘোড়ার লাগাম হাত থেকে ছেড়ে দিলে ঘোড়া পালাবে, তাহলে কি এরা আর আমাদের কাউকে আস্ত রাখবে?"

"মর্দানা, দেখছি, এখনো তুমি অলখ্ পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারোনি। তোমার কোন চিন্তা নেই। 'ওয়াহ্ গুরু' বলে হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম মাটিতে ফেলে দাও, যিনি সব কিছু চালাবার মালিক, তিনি ঘোড়া ঠিকমত চালিয়ে নেবেন।"

লাগাম ফেলিয়া দিয়া ভক্ত মর্দানা কাঁধে-ঝুলানো রবাব যন্ত্রটি টানিয়া নিলেন। এ যন্ত্রের মধুর নিক্কণের সাথে নানক ধরিলেন তাঁহার প্রাণ-প্রভুর স্তুতি-সঙ্গীত।

শিখ-গুরুর জীবনী 'জনমসাখী' এ সময়কার অলৌকিক ঘটনার এক বিবরণ দিয়াছেন—সেনাদল পরিবৃত হইয়া বন্দী নরনারী সারিবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে, নানকের মাথার বোঝা আর বোঝা হইয়া নাই—মাথা হইতে খানিকটা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহার চলার সঙ্গে সঙ্গে এই বোঝাও আগাইয়া চলিয়াছে। আর মর্দানা যে অশ্বের ভার পাইয়াছে তাহাও এই ভজন গানের তালে তালে কদম ফেলিয়া আপন মনে চলিয়াছে। লাগাম বা সহিসের চালনার প্রয়োজন উহার নাই। এই অলৌকিক দৃশ্যটি সেনাধ্যক্ষেরাও দেখিয়াছেন। সুযোগমত বাবর শাহকে তাঁহারা এ কথা জানাইতে ভুলিলেন না।

সমস্ত কথা শুনিয়া বাবরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "এমন শক্তিমান হিন্দু-পীর সঈদপুরে রয়েছেন, আগে এ কথা জানলে এত হত্যাকাণ্ড এখানে আমি হতে দিতাম না। তিনি তাঁর নাম কি বলেছেন?"

"নানক নিরংকারী"।

"এই অদ্ভুতকর্ম্মা সাধকের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। এখনি আমায় নিয়ে চল তাঁর কাছে।"

অন্যান্য বন্দীদের পাশে বসিয়া নানক একমনে গম পিষিতেছেন। বাবর দেখিলেন, ভাবতন্ময় সাধক, নানক গুন্‌গুন্ করিয়া ঈশ্বরের স্তুতি গাহিয়া চলিয়াছেন। আর পরম বিস্ময়ের কথা, এ গম পেষণের যন্ত্রকে হাত দিয়া ঘোরানোর কোন প্রয়োজন হইতেছে না। জাঁতা স্বয়ংক্রিয়, আপনিই তাহা ঘুরিয়া চলিয়াছে। নানক শুধু মাঝে মাঝে উহার মধ্যে গম ঢালিয়া দিতেছেন।

নিকটে গিয়া বাবর শাহ সেলাম জানাইলেন। সবিনয়ে জানিতে চাহিলেন, তাঁহার কি উপকারে তিনি লাগিতে পারেন?

নানকের সে দিকে লক্ষ্যই নাই। আপন ভাবরসে বিভোর হইয়া গাহিতেছেন হৃদয় গলানো সঙ্গীত।

ভাবোচ্ছল সাধুর আননে দেখা দিয়াছে দিব্য জ্যোতির ছটা, ভগবানের স্তুতিগান তুলিয়াছে এক অপূর্ব্ব স্পন্দন। বাবর শাহ নির্নিমেষে এই মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া আছেন।

গান থামিলে সেনাধ্যক্ষেরা নানকের কাছে বাবরের পরিচয় দিলেন। সম্রাট আসন গ্রহণ করিলে নানক প্রশান্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "সম্রাট, আপনি খোরাশান শাসন করে এসেছেন, এবার হিন্দুস্থানের উপর ছড়িয়ে দিয়েছেন বিভীষিকা। হত্যার রক্ত, আর মর্ম্মন্তুদ কান্না আপনার হৃদয়ে দয়া জাগিয়ে তোলেনি। কিন্তু সম্রাট, এই শক্তির দম্ভ আপনার কতকাল থাকবে, বলুন তো? আপন শক্তিবলে লোদী শাসকদের হাত থেকে আপনি রাজত্ব কেড়ে নিচ্ছেন, কিন্তু আপনার

এ শক্তিও তো একদিন হয়ে পড়বে ক্ষীণ, দেহ ও মনে আপনি হবেন জীর্ণ, হতবল। তখন আবার এক নূতন শক্তি এসে কেড়ে নেবে আপনার বা আপনার উত্তর পুরুষের এই প্রতাপ। এই ক্ষণস্থায়ী রাজ প্রতাপের অহঙ্কারে যেন আপনি ভুলে থাকবেন না। সর্ব্বদা স্মরণ করে চলুন সেই স্রষ্টা পরমেশ্বরকে, যাঁর কাছে আপনার মত বাদশা হচ্ছেন কীটাণুকীট। মনে রাখবেন, সে-ই প্রকৃত বাঁচা বাঁচতে জানে, যে অনিবার্য্য মৃত্যুর কথা ভাবে—আর সদাই স্মরণ মনন করে পরম প্রভুকে।"

সত্যসন্ধ সাধকের রূঢ় সত্য কথায়, তাঁহার বাচনভঙ্গী ও ব্যক্তিত্বে বাবর মুগ্ধ। বারবার জানাইতে থাকেন হিন্দুস্থানের এই মহাপুরুষকে তাঁহার সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

বাবর শাহের বড় ইচ্ছা, নানককে সম্মান দেখানোর জন্য বহুমূল্য কোন উপঢৌকন দেন। তাই নিবেদন করিলেন, "আপনাকে একটা বিশেষ কিছু দান করে আমি কৃতার্থ হতে চাই, কোন বস্তু পেলে আপনি তুষ্ট হবেন, আমায় বলুন।"

"সম্রাট, সঈদপুরের এই হতভাগ্য বন্দী নরনারীর কল্যাণের কথাই সবচেয়ে আগে আমার মনে আসছে। আপনি দয়া করে এদের মুক্ত করে দিন।"

মুক্তির আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হইয়া গেল। নানকও সঈদপুরে ফিরিয়া গেলেন এই মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের সঙ্গে। যাওয়ার আগে বাদশাহকে প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন, আবার তিনি কয়েকদিন পরেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তখন উভয়ের বিস্তারিত আলাপ হইবে।

বড় মর্ম্মান্তিক সেদিনকার রণবিধ্বস্ত সঈদপুরের অবস্থা। শত শত গলিত মৃতদেহে রাস্তা-ঘাট পূর্ণ। ঘরে ঘরে জ্বলিতেছে আগুন। মৃত আত্মীয় স্বজনের শোকে চারিদিকে শুধু হাহাকার আর কান্না।

বড় বীভৎস, বড় করুণ এ দৃশ্য। ভক্ত মর্দানা আর ইহা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। নানককে শুধাইলেন, "গুরুজী, মুষ্টিমেয় পাঠান হয়তো

ভগবানের কাছে করেছে কোন অপরাধ, কিন্তু এজন্য হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ লোকের উপর পড়বে নির্ম্মম দণ্ডের আঘাত, ঈশ্বরের এ কেমন ধারা বিচার ?”

যে গৃহে উভয়ে আশ্রম নিয়াছেন, তাহার পাশেই রহিয়াছে তরুলতা-বেষ্টিত এক রম্য উপবন। সেদিকে তাকাইয়া নানক কহিলেন, “মর্দানা তোমার প্রশ্নের উত্তর আজ দেবো না। বাগানের কোণে দাঁড়ানো ঐ সুস্বাদু ফলের গাছটির দিকে লক্ষ্য কর। ফলগুলো সব সুপক্ক—রসে টইটম্বুর হয়ে রয়েছে। ঐ গাছের নীচে আজ রাতে তুমি শুয়ে থাকো। কাল ভোরে পাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর।”

সে রাত্রিটা মর্দানা বৃক্ষতলেই যাপন করেন। পাখীর চঞ্চুর আঘাতে ফলের রস মাঝে মাঝে নিঃসৃত হয়, ঝরিয়া পড়ে তাঁহার দেহে মিষ্টরসের গন্ধে পিপীলিকারা সারি বাঁধিয়া আসে। দুই চারিটি দংশন অনুভূত হয়। ঘুমের ঘোরে মর্দানা হস্ত সঞ্চালন করেন, ঘর্ষণের ফলে পিপীলিকার দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

ভোর বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়াই শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। নানক সহাস্যে কহিলেন, “মর্দানা, এসো দেখি, যেখানে তুমি রাত্রি যাপন করেছো সে জায়গাটা একবার ঘুরে আসি।”

বৃক্ষতলে ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে অজস্র মৃত পিপীলিকা। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় মর্দানা এগুলিকে নিষ্পেষণ করিয়াছেন। নানক এদিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া কহিলেন, “মর্দানা, চেয়ে দেখো, এখানেই রয়েছে তোমার কালকের প্রশ্নের জবাব। এমনি করেই সঈদপুরের হাজার হাজার নিরীহ মানুষ সেদিন হয়েছে হতাহত। সৃষ্টি আর ধ্বংসের টানাপোড়েনের মধ্যেই যে নিরন্তর চলছে অলখ্ পুরুষের অনাদ্যন্ত লীলা। মর্দানা, অখণ্ড সত্তায় যেখানে সব কিছু বিধৃত, ‘করতার’ নিজেই যেখানে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত, বিচার অবিচারের প্রশ্ন সেখানে উঠে না। দণ্ড আর পুরস্কারের কথাও অবান্তর।”

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নানক পরদিন আবার বাবর শাহকে দর্শন

দিলেন। হিন্দুস্থানের এই মহাভক্ত, মহাজ্ঞানী সাধককে দেখিয়া বাবর মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্য ও স্পর্শের প্রভাব সম্রাটকে অভিভূত করিয়াছে। রক্তস্নাত তরবারি এখন কোষবদ্ধ, জয়ের লিপ্সা সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে—আপনহারা হইয়া তিনি নানকের মুখে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ শুনিতে লাগিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রাণঢালা ভজন গানের সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করিল এক ইন্দ্রজাল।

ধর্ম্মকথা ও স্তুতিগান শুনিয়া বাবর শাহের হৃদয় আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। নানককে সম্ভ্রম দেখানোর জন্য নিজের প্রিয় নেশা, ভাঙ-এর রত্নখচিত কৌটাটি আগাইয়া দিলেন।

নানক সহাস্যে কহিলেন, "জাহাপনা আপনার এই ভাঙ খেয়ে আমার কোন নেশাই হবে না। এর চেয়ে অনেক বড় নেশায় যে আমি বুঁদ হয়ে আছি।"

"সত্যি নাকি? কোথায় আপনার সে নেশার বস্তুটি?"

"সম্রাট, আমার সে নেশার বস্তুটি হচ্ছে—অলখ্ পুরুষের প্রেম। তা রক্ষিত রয়েছে আমার হৃদয় পাত্রে। সেই নেশাতেই যে হয়ে আছি সদা ভরপুর।"

বলিতে বলিতে নানক ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। নাসিকায় তাঁহার নিঃশ্বাস আর বহিতেছে না। দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর প্রেমের এক বিস্ময়কর প্রকাশ নানকের দেহে। বাবর নীরবে, নির্নিমেষে এ দৃশ্য দেখিতেছেন।

মহাপুরুষের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বাবর তাঁহার নিকট কিছু উপদেশ চাহিলেন।

উত্তর হইল, "জাঁহাপনা, অগণিত নরনারীর শুভাশুভ নির্ভর করছে আপনার ওপর। সম্রাটের প্রকৃত কর্ত্তব্য পালনে যেন আপনার কোনদিন ত্রুটি না হয়। ন্যায় বিচার ও সাধু ফকীরের মর্য্যাদা দান সম্বন্ধে আপনি সদা সজাগ থাকুন। মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়া পরিহার করুন—এ সম্পর্কে বিশেষ করে আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই। পরাজিত

শত্রুর প্রতি কখনো নিষ্ঠুর হবেন না, ক্ষমাশীল থাকতেই চেষ্টা করবেন। সর্ব্ব কাজে, সর্ব্বত্র স্মরণ মনন করতে চেষ্টা করুন আপনার স্রষ্টাকে, পরম প্রভুকে। এই কটি কথা পালন করলে আপনার কল্যাণ হবে।"

বিদায়ের আগে বাদশাহ কহিলেন, "আপনার পবিত্র সঙ্গ ও উপদেশ-বাণী পেয়ে আমি পরম উপকৃত হলাম। যাবার আগে আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সামান্য কিছু ভেট আপনাকে দিতে চাই। তা গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন।"

নানক এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার ইঙ্গিত অনুযায়ী বাজিয়া উঠিল ভক্ত মর্দানার রবাব, গাহিলেন এক সত্তরচিত ভজন—

ওগো, সেই অদ্বিতীয় অলখ্ পুরুষ
আমায় ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সব কিছু।
শুধু যে তাঁরই দানের অপার ঐশ্বর্য্যে
আমরা হয়ে উঠি ভরপুর।
মানুষের কৃপার উপর যে করে নির্ভর
বিনষ্ট হয় তার ইহকাল আর পরকাল।
বিরাজিত রয়েছেন এক মহামহিম প্রভু,
রয়েছেন একমাত্র সেই কৃপালু দাতা,
আর সারা বিশ্ব দাঁড়ানো তাঁর সম্মুখে
নতশিরে ভিখারীর মত।
মহিমময় এই পরম প্রভুকে যে করে ত্যাগ,
অপরের দিকে করে দৃষ্টিপাত,
সকল মান মর্য্যাদায় দেয় সে জলাঞ্জলি
সম্রাট, রাজা, ওমরাহ্,
সবই করেছেন তিনি সৃজন,
দীনাতিদীন এই ক্ষুদ্র মানুষ
কি করে হবে তার সমান?
নানক কহেন, শোন সম্রাট বাবর,

তোমার মত অসহায় মানুষের কাছে
চাইতে আসে যে ভিক্ষা
নির্ব্বোধ সে—কাণ্ডজ্ঞান হবে না তার
কোন কালে।

পাঞ্জাবের প্রান্তদেশে নানক সেবার ভ্রমণ করিতেছেন। সঙ্গে রহিয়াছেন ভক্তপ্রবর মর্দানা। হাসান-আব্দল নামক এক উষর স্থানে তাঁহারা সেদিন উপস্থিত। কাছাকাছি কোথাও জল পাইবার উপায় নাই। মর্দানা এ সময়ে পিপাসায় বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

সম্মুখেই উঁচুটিলার উপরে এক ক্ষুদ্রকুটির। স্থানীয় লোকেরা কহিল, "ফকীর ওয়ালি কোয়ান্দারী এক মহা সমর্থ সাধক—অদ্ভুত তাঁহার 'কেরামৎ'। ঐ টিলার উপরে বাস করছেন বহুদিন। কাছাকাছি আর কোথাও কূয়ো নেই, শুধু একটিই আছে ফকীর সাহেবের দরগাতে।"

নানক শিষ্যকে কহিলেন, "এখানে আর কোথায় জল পাবে? একটু কষ্ট করে এগিয়ে যাও। ফকীর সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে জল পান করে এসো।"

মর্দানা উপরে উঠিয়া গেলেন। ফকীর সাহেবকে সেলাম জানাইয়া কহিলেন, "বাবা, আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত। শুনলুম আপনার কূয়ো রয়েছে। দয়া করে তাড়াতাড়ি এক লোটা জল আমায় দিয়ে দিন। আমার গুরু নানক-নিরংকারী নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।"

ফকীর ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কি! এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার গুরুর! এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ আমার সঙ্গে একটিবার দেখা করতে এলো না। সে কি আমার নাম শোনেনি? তাছাড়া, সামান্য ভদ্রতা জ্ঞানও কি তাঁর নেই? চলে যাও এক্ষুনি এখান থেকে। তোমার গুরুকে বলবে, কেরামৎ যদি কিছু অর্জ্জন করেই থাকে তৃষ্ণার্ত্ত শিষ্যের জন্য এখনি জলের যোগাড় করে দিক। আমার কূয়ো থেকে জল মিলবে না।"

অভিমানহত মর্দানা দরগা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সব কথা গুরুকে জানাইলেন।

নানকের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল স্মিত হাস্যের রেখা। কহিলেন, "মর্দানা, ভক্তিভরে একবার 'সৎ' নাম-উচ্চারণ কর, তারপর যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো সেখানকার মাটি একটু খুঁড়েফেল। তৃষ্ণা নিবারণের জল মুহূর্তেই পাবে—ফকীরের কুয়ো আসবে এখানে।"

শিখ-গ্রন্থ 'জনমসাখী' এই অলৌকিক ঘটনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন :

মর্দানা গুরুর আদেশ পালন করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, তাঁহার পদতল হইতে অজস্র ধারায় নির্গত হইতেছে জলস্রোত। এই জল পান করিয়া এবার তাঁহার তৃষ্ণা দূর হইল।

কিছুক্ষণ পরেই অদূরস্থিত টিলার উপর হইতে শোনা গেল ফকীরের ক্রুদ্ধ চীৎকার। তাঁহার কূপ ইতিমধ্যে একেবারে জলশূন্য হইয়া গিয়াছে। যোগবিভূতি বলে নানক উহার জল আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন, আর উহা নির্গত হইতেছে মর্দানার খনন করা গর্ত্ত দিয়া।

ফকীর ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। এবার নানককে হত্যা করার জন্য উপর হইতে এক বৃহৎ প্রস্তর নীচের দিকে ঠেলিয়া দিলেন। সবেগে উহা নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িল। নানকের গায়ের উপর পড়িতে যাইবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নানক হস্ত প্রসারণ করিলেন, বিশাল প্রস্তর খণ্ড যেন যাদুমন্ত্র বলে স্তম্ভিত হইল—থামিয়া দাঁড়াইল।

বড় অদ্ভুত, বড় বিস্ময়কর এই দৃশ্য। ফকীর ওয়ালি কোয়ান্‌দারীর সমস্ত তেজ বীর্য্য কর্পূরের মত কোথায় উবিয়া গেল। এবার ভীতভাবে নানকের কাছে তিনি নতি স্বীকার করিলেন, তাঁহার তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়া হইলেন কৃতার্থ।

নানকের পাঞ্জা বা হাতের ছাপ এ সময়ে ঐ প্রস্তরের উপর পতিত হইয়াছিল। আজিও ঐ ঘটনাস্থলে পাঞ্জা চিহ্নাঙ্কিত বৃহৎ প্রস্তরটি বর্ত্তমান আছে, আর তাহারই পাশে রহিয়াছে নানকের যোগবলের নিদর্শন সেই ঝরণার জলধারা। হাসান-আব্‌দলের এই বিশেষ স্থানটির নাম দেওয়া

হইয়াছে পাঞ্জা সাহেব। আজও বহু ধর্ম্মপরায়ণ শিখ ইহাকে এক পুণ্য তীর্থ বলিয়া গণ্য করেন।

করতারপুরের কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া নানক মাঝে মাঝে তাঁহার পদযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতেন, ঘুরিয়া বেড়াইতেন পথে প্রান্তরে, জনপদে আর তীর্থে তীর্থে। দীন দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁহার দরদ ছিল অপরিসীম। পরিব্রাজনের মধ্য দিয়া সদাই জনজীবনের সাথে ঘটিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, আর্ত্ত ও মুমুক্ষুর উদ্ধারের সুযোগ তিনি পাইতেন। লৌকিক ও অলৌকিক, তাঁহার এই দুই জীবনেরই স্পর্শ-প্রভাব ছড়াইয়া পড়িত তাঁহার যাত্রাপথের দুই পাশে।

সে-বার নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে নানক পুরীধামে আসিয়াছেন। জগন্নাথ দর্শনের জন্য একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। নাটমন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই হইলেন ভাবাবিষ্ট।

এদিকে মহা সমারোহে আরতি শুরু হইয়া গেল। সবাই শ্রদ্ধাভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেছে, কিন্তু নানকের সেদিকে কোন হুঁসই নাই। পরমানন্দে তিনি নিজ আসনে বসিয়া আছেন, আর নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে প্রেমাশ্রু।

মন্দিরের একদল পাণ্ডা ও পরিছা কিন্তু নানকের উপর বড় চটিয়া গিয়াছে। এ আবার কিরূপ সাধু? শ্রীজগন্নাথের আরতির সময় উঠিয়া দাঁড়ায় না, কাণ্ডাকাণ্ড বোধ কি কিছুই নাই?

আরতি থামিয়া গেলে নানককে তাহারা ঘিরিয়া দাঁড়ায়। তিরস্কারের সুরে বলে, "শুধু ঐ হলদে আলখাল্লায় সাজলে আর গলায় মালা দিয়ে বেড়ালেই সাধু হওয়া যায় না। এজন্য চাই প্রকৃত ভক্তি আর শরণাগতি। আপনি আরতির সময় মহাপ্রভুকে সম্মান দেখালেন না, এ কেমন কথা?"

নানক উত্তর দিলেন, "ভাই আমার জগন্নাথ কি শুধু এখানে, আর এই কাষ্ঠমূর্ত্তিতেই বিরাজিত? তিনি যে সারা বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে আপন

মহিমায় রয়েছেন দেদীপ্যমান।”

একথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবতন্ময় হইয়া উঠিলেন। কণ্ঠে উচ্চারিত হইল অপরূপ স্তব গান—

“গগন মৈ থালু রবি চংদু দীপক বনে
তারিকামংডল জনক মোতী।
ধূপু মলআনলো পবণু চবরো করে
সগল বনরাই ফলংত জ্যোতী।
কৈসী আরতি হোই ভবখংডনা তেরী আরতী।
অনহতা সবদ বাজংত ভেরী।”
—সোহিলা, মহলা-১

অর্থাৎ, হে আমার প্রভু, গগন হয়েছে তোমার আরতির থালা, রবি চন্দ্র এই দুই দীপ জ্বলছে সেথায় নিরন্তর। তারকামণ্ডল সুশোভিত রয়েছে মুক্তাখচিত চাঁদোয়ার মত। মলয়জ চন্দন তোমার ধূপ—তারই সৌগন্ধ বয়ে নিয়ে পবন করছে তোমার চামর ব্যজন। হে জ্যোতির্ম্ময় প্রভু, পুষ্পসম্ভার সাজিয়ে বনস্পতিরা নিবেদন করছে তোমায় আরতির পুষ্পার্ঘ্য। হে ভবখণ্ডন প্রভু, হে মুক্তিদাতা, অনির্ব্বচনীয় তোমার আরতি, এ আরতি বেজে উঠেছে অনাহত ধ্বনির মধ্য দিয়ে।

সমবেত সাধু সন্ত ও দর্শনার্থীরা এ অপূর্ব্ব স্তবগান শুনিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতঃপর জানা গেল, পীতবসনধারী এই ভক্তিসিদ্ধ সাধক আর কেহ নয়, ইনি উত্তরভারতের বহুবিশ্রুত মহাপুরুষ—নানক নিরংকারী।

সে-বার নানক মথুরা অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র জন্মভূমি এই মথুরা। লীলাময় প্রভুর বহু লীলার স্মৃতি এই পুণ্য-স্থানের আকাশে বাতাসে ছড়ানো রহিয়াছে। এখানে পৌঁছিয়া নানক আনন্দে নিমগ্ন হইলেন

একদিন যমুনায় স্নান সমাপন করিয়া তিনি গৃহে ফিরিতেছেন। হঠাৎ অদূরে ছিন্নবাস পরিহিত এক অন্ধ ভিখারীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। গৃহস্থেরা পথের ধারে ছাইপাশ ফেলিয়া গিয়াছে, তাহাই হাতড়াইয়া লোকটি দুই এক কণা খাদ্যের সন্ধান করিতেছে।

নানক থমকিয়া দাঁড়াইলেন, করুণায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। ভিখারীর কাছে গিয়া কহিলেন, "বাবা, এ তুমি কি করছো? ছাই-পাশ না ঘেঁটে ঠাকুরের নাম গেয়ে রাস্তায় ভিক্ষে মেগেও তো খেতে পার।"

লোকটি কাতরস্বরে কহিল, "প্রভু, সেই করেই তো চলতো। অদৃষ্ট মন্দ, এবার কিছুদিন যাবৎ দুই চোখ অন্ধ হয়েছে। বাইরে বেরুবার যো নেই। তাই ঘরের পাশেই আস্তাকুঁড় ঘেটে দেখছি। দুদিন উপবাসী ছিলাম, আর ঘরে থাকতে পারলাম না। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।"

নানকের দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিয়াছে। করোয়া হইতে এক অঞ্জলি জল নিয়া অন্ধ ভিখারীর নয়নে ছিটাইয়া দিলেন।

ভিখারী তখনই বিস্ময়ে আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "তবে কি স্বপ্ন আমার সত্যই সফল হোল। আমি যে দুই চোখে পারিষ্কার সব দেখতে পারছি। আমি তো আর অন্ধ নই। আপনি তবে প্রভু নানকজী? আপনারই আশা পথ চেয়ে যে আমি দিন গুনছি।" নানকের চরণতলে সাষ্টাঙ্গে সে প্রণত হইল।

"কি ব্যাপার বাবা, বলতো?"

"প্রভু, আমি কয়েকদিন আগেই স্বপ্নে এক প্রত্যাদেশ পেয়েছি। গোবিন্দজী আমায় ডেকে বলেছেন, 'ওরে দুঃখ করিসনে। শিগ্‌গীরই মথুরায় উপস্থিত হবেন নানক নিরংকারী, তিনি করবেন তোর অন্ধত্ব মোচন।' আমার পরম ভাগ্য, আপনার দর্শন লাভ করলাম।"

ভিখারীটিকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া নানক রওনা হইবেন, এমন সময় সে তাঁহার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। কাতরস্বরে কহিল, "প্রভু, দুটি চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে দিলেন, সে ভালো কথা। কিন্তু আমার এ দেহ জীর্ণ হয়ে এসেছে, শেষের দিন আসছে ঘনিয়ে। এই দুটো চোখও

তো এবার এ দেহের সঙ্গেই ভস্মীভূত হবে চিতানলে। কৃপা যখন করেছেনই, ভেতরকার চোখও এবার ফুটিয়ে দিন—পরম প্রভুর দর্শন যাতে লাভ করি সে সাধন দিন, সে শক্তি দিন।"

মথুরার জনগণের মধ্যে এই ভিখারীটিই নানকের নিকট হইতে সর্ব্ব প্রথম সাধন প্রাপ্ত হয়। উত্তরকালে এক সার্থক শিখ সাধক রূপে পরিচিত হইয়া উঠে।

নানকের ভগবৎতত্ত্ব ও সাধনার মূলকথা তাঁহার রচিত জপজীর প্রথম শ্লোকে নিহিত রহিয়াছে—

"এক ওঁ সতি নামু করতা
পুরখু নিরভউ নিরবৈরু
অকাল মূরতি অজুন
ৈসভং গুর প্রসাদি।"

অর্থাৎ, এক ওঁকার; এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর রূপে তিনি বিরাজিত। সৎ তাঁহার নাম, তিনি সৃষ্টি কর্ত্তা, তিনিই অনাদ্যন্ত পুরুষ। তিনি ভয় রহিত, বৈররহিত। মূর্ত্তি তাঁহার কালের দ্বারা নয় পরিচ্ছন্ন। তিনি অযোনিসম্ভব—স্বয়ম্ভু। গুরুর প্রসাদে তাঁকে কর জপ।

তত্ত্বোপলব্ধির প্রধান উপায়রূপে নানক নির্দ্দেশ করিয়াছেন নামজপ। গুরুমুখী হইয়া গুরুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এই জপ সাধন করিতে হইবে, বার বার একথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন—

"সুনি ঐ জোগ জুগতি তানি ভেদ।
সুনি ঐ সাসত সিমৃত বেদ।
নানক ভগতা সদা বিগাসু।
সুনি ঐ দুখ পাপকা নাসু।"

—পৌড়ী ৯, জপজী।

অর্থাৎ, সৎ-নাম শ্রবণ করিলে অযোগ্য ব্যক্তিও হয় স্তুতিযোগ্য,

এ নাম শ্রবণে যোগোক্ত ষট্‌চক্রভেদ হয় সম্ভব, জানা যায় বেদের নিহিতার্থ। নানক কহে, পরমেশ্বরের নাম শ্রবণে ভক্তের হৃদয়াকাশে আনন্দ থাকে সদা বিরাজিত, দুঃখ ও পাপের হয় বিনাশ।

মানবের জীবনতপস্যার প্রকৃত স্বরূপ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—"ইন্দ্রিয় সংযম ভাঁটি এবং ধৈর্য্য স্বর্ণকার—মতি, শুভবুদ্ধি অথবা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নেহাই, বেদ অর্থাৎ শাস্ত্রানুশাসন হাতুড়ি, পরমেশ্বরের ভয় হইতেছে হাঁপর, তপস্যা হইতেছে অগ্নির তাপ—এই সকলের সাহায্যে প্রেমভাণ্ডে অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে গুরু-উপদেশরূপ অমৃত ঢেলে সত্য টাঁকশালে শবদ, অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম প্রস্তুত করে। যাদের উপর সদগুরুর কৃপাদৃষ্টি হয়, তারাই করতে পারে এই কার্য্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তপস্যা। নানক বলেন, কৃপাময় অকালপুরুষ কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাদের করেন কৃতকৃত্য।"—পৌড়ী ৩৮, শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজীঃ অনুবাদ, অধ্যাপক চাকলাদার।

নানকের মতে এই তপস্যার আগের ও পরের কথা হইতেছে সাধকের আত্ম নিবেদন আর পরম প্রভুর কৃপা।

নানক বলেন, "লক্ষ লক্ষ বার শৌচ করলেই পবিত্র হওয়া যায় না, মৌন অবলম্বন করলেই চিত্তচাঞ্চল্যের হয় না বিকাশ, বিষয় বাসনা ও ক্ষুধার হয় না নিবৃত্তি সপ্তপুরীর ঐশ্বর্য্য লাভ করেও। কোন রকমের চতুরতাই অন্তকালে জীবের সঙ্গে যায় না পরপারে। একবার ভাবো —কি করে ঈশ্বরের কাছে হওয়া যায় সত্যনিষ্ঠ, কি করে মায়ার মিথ্যা আবরণ করা যায় ছিন্ন। নানক কহেন, সদা পরমেশ্বরের আদেশ মেনে চলো, সে আদেশ যে তিনি লিখে দিয়েছেন প্রতি জীবেরই অদৃষ্ট ফলকে।"—জপজী, পৌড়ী ১

কিন্তু অদৃষ্ট ফলকের এই লিখন, প্রারব্ধের এই ইঙ্গিত, বুঝিয়া নিবার শক্তি তো বদ্ধ জীবের নাই। তবে কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে? নানকের উত্তর সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, "সৎনাম জপ করতে করতে মানুষের দৃষ্টি হয়ে আসে স্বচ্ছ, তার ফলে তাতে হয় গুরুকৃপার আলোকসম্পাত।

তখন সর্ব্ব মিথ্যার আবরণ আর মায়া-মোহ মুহূর্ত্তে যায় টুটে।”

নানকপন্থী শিখদের ‘গুরুগ্রন্থসাহিব’ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই মহান গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিতেন, “যত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেছি, তাদের ভেতর ‘গ্রন্থসাহিবে’র মত সুন্দর ও মধুর আর একখানি আছে কিনা সন্দেহ। সদ্‌গুরু ব্রহ্ম, আবার মানুষের মধ্যে পিতা মাতা, রাজা চিকিৎসক সমস্তই ব্রহ্ম, একথা গুরু নানকের।” ভক্তদিগকে এই গ্রন্থপাঠে গোস্বামীপ্রভু সদাই উৎসাহিত করিতেন। কহিতেন, “বাংলাভাষায় ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, হিন্দী ভাষায় তুলসীদাসের রামচরিতমানস’ আর গুরুমুখী ভাষায় গুরু-নানকের ‘গ্রন্থসাহিবে’র মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভক্তিগ্রন্থ আর দ্বিতীয় নেই।”

শিখদের পঞ্চমগুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী ‘গ্রন্থসাহিব’ সঙ্কলন করেন এবং ইহাতে সন্নিবেশিত হয় পূর্ব্বতন গুরুদের অমূল্য বাণীসমূহ। প্রবীণ গুরুভ্রাতা গুরুদাসজী দ্বারা এইগুলি অনুলিখিত হয়। এই গ্রন্থই ‘আদি গ্রন্থসাহিব’ নামে পরিচিত। দশম গুরু গুরুগোবিন্দ সিংহের রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া ভাই-মণিসিং আর একটি গ্রন্থসাহিব সঙ্কলন করেন। এটি হইতে পূর্ব্বেকার সঙ্কলনকে পৃথক করিয়া বুঝানোর জন্য অর্জ্জুনজীর গ্রন্থকে ‘আদি’ বলা হয়। অর্জ্জুনজী তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্বতন শিখ গুরুদের বাণী ছাড়া ভিন্নপন্থী ভক্ত সাধকদের বাণীও পরিবেশন করিয়াছেন।

‘গ্রন্থসাহিবে’র বাণীগুলি শিখেরা বিভিন্ন রাগের মধ্য দিয়া গান করেন। নিষ্ঠাবান ভক্তগণ ‘রহিরাস’ এবং ‘সোহিলা’ যথাক্রমে প্রত্যূষে ও শয়ন-কালে শ্রদ্ধাভরে পাঠ করিয়া থাকেন।

ভাই-গুরুদাসের রচিত ‘উঅর’ এবং ‘কোবিৎ’ ভক্তিমান শিখদের পরম প্রিয়। অন্যান্য বিশিষ্ট শিখ ধর্ম্মসাহিত্যের মধ্যে রহিয়াছে সেওয়াদাসের ‘জনমসাখী’, ভাই-সন্তোখ্‌ সিং-এর ‘গুরুপ্রতাপ সূরয’ ইত্যাদি।

নানকের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন ভাই-বুধা (উত্তর-কালে নানক ইঁহার নামকরণ করেন রামদাস), অঙ্গদ, নানকের পুত্র

শ্রীচাঁদ প্রভৃতি। ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধন-সামর্থ্যের দিক দিয়া এই সব শিষ্য পশ্চিম ভারতে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন। ইঁহাদের জীবনে গুরুকৃপায় যে লীলা বিস্তারিত হইয়াছিল তাহার নানা বিস্ময়কর কাহিনী আজো শুনিতে পাওয়া যায়।

একনিষ্ঠ ভক্ত ভাই-বুধাকে সঙ্গে নিয়া নানক সে-বার পরিব্রাজনে বাহির হইয়াছেন। এক বিস্তীর্ণ মাঠের উপর দিয়া উভয়ে চলিয়াছেন। হাঁটিতে হাঁটিতে পরিশ্রান্তও কম হন নাই। ভাই-বুধার তো তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। তখন গ্রীষ্মকাল, চারিদিকের পুকুর ডোবা সব একেবারে শুকাইয়া উঠিয়াছে, কাছাকাছি কোথাও কোন গ্রামও দেখা যাইতেছে না। ভাই-বুধা শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, তাইতো, এ সময়ে এখানে জল কোথায় পাওয়া যাইবে?

নানক আশ্বাস দিয়া শান্তস্বরে কহিলেন, "ভয় পেয়ো না, সামনে কিছুটা দূর চলে যাও, জল দেখতে পাবে।"

ভাই-বুধা আগাইয়া গেলেন, পুষ্করিণী একটি ঠিকই মিলিল কিন্তু জলের চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে একেবারে শুকাইয়া রহিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া গুরুকে নিবেদন করিলেন।

নানক হাসিয়া কহিলেন, "দেখতে পাচ্ছি, তুমি গুরু আর সৎ-নামের উপর এখনো নির্ভর করতে শিখলে না। 'ওয়াহ্ গুরু' বলে আবার সেখানে যাও, নিবিষ্ট হয়ে জপ করে চলো সৎ-নাম। অবশ্যই পাবে তোমার তৃষ্ণা নিবারণের জল।"

গুরুদেবের নির্দেশ মত ভাই-বুধা আবার সেখানে উপস্থিত হইলেন। এবার কিন্তু ঐ পুকুরের দিকে তাকাইয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলেন, উহার তলদেশ হইতে বেগে উৎসারিত হইতেছে স্নিগ্ধ, সুপেয় জলধারা।

অতঃপর নিকটস্থ গ্রামাঞ্চলে নানকের এ অলৌকিক শক্তিপ্রকাশের কথা ছড়াইয়া পড়ে। লোকে দলে দলে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখার জন্য ভীড় করিতে থাকে।

এই পুনরুজ্জীবিত পুষ্করিণীর নাম দেওয়া হয়—অমৃত-সায়র।

উত্তরকালে চতুর্থ শিখগুরু রামদাস এটিকে এক সুবৃহৎ জলাশয়ে পরিণত করেন, ইহার মধ্যস্থলে নির্ম্মাণ করেন এক অপরূপ শিল্পকলাময় মন্দির।* এই মন্দিরই শিখদের চিরশ্রদ্ধার 'দরবার সাহিব', আর এই পুণ্যতীর্থ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে অমৃতসর নামে।

শিষ্যদের মধ্যে অঙ্গদ ছিলেন গুরু নানকের পরম প্রিয়। গুরুনিষ্ঠা ও সাধন-সামর্থ্যের দিক দিয়া তাঁহার তুলনা ছিল বিরল। নানকের বহুতর কঠোর পরীক্ষায় তাঁহার এই বীর ভক্তকে বার বার সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতে দেখা গিয়াছে।

গুরু-নানক অঙ্গদকে ভক্তপ্রধান মনে করেন এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে অঙ্গদই হইবেন গুরুর গদির অধিকারী, একথা কাহারো অজানা নাই। কেহ কেহ এজন্য একটু ঈর্ষা বোধও করেন। নানক সেদিন ইহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের ব্যবস্থা করিলেন।

নদীর ধারে বসিয়া সকলে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে রত আছেন। দেখা গেল, দূরে জলস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে এক মৃত মানুষের দেহ।

নানক সহাস্যে কহিলেন, "আচ্ছা, বলতো, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, আমার আদেশমত ঐ মৃতদেহকে সুস্বাদু আহার্য্য ভেবে নিয়ে ভক্ষণ করতে পারে?"

বড় অদ্ভুত গুরুর এই প্রশ্ন! প্রস্তাবিত আহার্য্যের বীভৎসতার কথা ভাবিয়া শিষ্যেরা প্রায় সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন।

সকলে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছেন। অঙ্গদ জোড়হস্তে নিবেদন

*পরবর্ত্তী কালে শিখদের পরাভূত করিয়া আমেদশাহ এই পবিত্র মন্দিরের ধ্বংস সাধন করেন। অমৃতসর পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের অধিকারে আসিলে তিনি এই বিধ্বস্ত মন্দিরকে পুনর্গঠিত করেন, সোনার পাতে উহার গম্বুজ মোড়াইয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে শিখ-স্বর্ণমন্দির নামে উহা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

করিলেন, "গুরুজী, আপনার আদেশ এ দাস সব সময়েই পালন করতে প্রস্তুত।"

বিস্ময়ে ভয়ে সবাই তো একেবারে অবাক! নানকের ইঙ্গিতে অঙ্গদ নদীগর্ভে ঝাঁপ দিলেন, মৃতদেহ টানিয়া তুলিলেন ডাঙায়।

গলিত দেহ হইতে উৎকট দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। সকলে তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় দিতে বাধ্য হইলেন।

নানক এবার গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এতক্ষণ তোমরা তোমাদের চোখ দিয়ে এ বস্তুটি দেখেছো। এবার দেখো—অঙ্গদের চোখ দিয়ে।"

মুহূর্ত্তমধ্যে এক ইন্দ্রজাল যেন সেখানে ঘটিয়া গেল। এ কি কাণ্ড! সে পূতিগন্ধময় মৃতদেহ আর নাই। এ যে এক পুরাতন কাষ্ঠখণ্ড, আর ইহা হইতে নির্গত হইতেছে মনোরম চন্দনগন্ধ!

গুরুগতপ্রাণ, ভক্তিসিদ্ধ সাধক অঙ্গদকে ঘিরিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরের কথা। গুরু নানকের মহাজীবনে এবার ঘনাইয়া আসিয়াছে বিরতির পালা। শীঘ্রই এ মরদেহ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এ কথা তিনি বুঝিয়াছেন।

এক শুভলগ্নে, সকল শিষ্যকে নিয়া তিনি এক প্রকাশ্য 'দেওয়ান'-এর অনুষ্ঠান করিলেন। প্রিয়তম শিষ্য অঙ্গদকে হাতে ধরিয়া বসাইয়া দিলেন নিজের আসনে, শিখসঙ্ঘের নব নির্ব্বাচিত গুরুরূপে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে নিজে করিলেন অভিবাদন। তারপর ধর্ম্মসভা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে গিয়া বসিলেন নদীতীরের এক বৃক্ষমূলে।

দিকে দিকে বার্ত্তা রটিয়া গেল—ভক্তদলের পরমাশ্রয়, গুরু নানক এবার মরদেহ ত্যাগ করিবেন। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সমবেত হইল।

গুরু তাঁহার শেষ ধর্ম্মোপদেশ এবার দান করিলেন, সমাপ্ত হইল তাঁহার প্রিয় ভজন। তারপর নয়ন দুইটি নিমীলিত হইল চিরনিদ্রায়।

শিখদের 'জনমসাথী' বলিয়াছেন,—যে বৃক্ষতলে নানক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, ধীরে ধীরে তাহাতে নব পুষ্পপত্র মুঞ্জরিত হইয়া উঠে। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া দর্শনার্থীরা আনন্দে অভিভূত হয়।

কথিত আছে, নানকের তিরোধানের পর তাঁহার মৃতদেহের সৎকার নিয়া সমবেত হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক ও কলহ দেখা দেয়। অতঃপর গুরুর শেষ দর্শনের জন্য তাঁহার মৃতদেহের বস্ত্রাবরণ অপসারিত হইলে জনতার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে অপার বিস্ময়। কই, দেহের তো কোন চিহ্নই সেখানে নাই। সমস্ত কলহ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের সম্ভাবনা ঘুচাইয়া দিয়া একেবারে উহা অদৃশ্য হইয়াছে। এবার এই বস্ত্রাবরণকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করা হয়। একখণ্ড নিয়া শিখগণ তাঁহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সৎকার করেন, অপর খণ্ডটিকে মুসলমান প্রথমত সমাহিত করা হয় ভূগর্ভে।

রাবী নদীর তীরে ভক্তগণ নানকের তিরোধানের স্থানটিতে চমৎকার একটি মন্দির ও আর একটি 'সমাধ্' নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু এই স্মারক মন্দির দুইটিকে বেশীদিন ধরিয়া রাখা যায় নাই, ভাঙনের ফলে কবে একদিন নদীগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

নিরাকার, পরমপুরুষের ভক্ত ছিলেন নানক-নিরংকারী। তাই বুঝি নিজের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি-মন্দিরের শেষ চিহ্নটুকও মুছিয়া নিয়া তিনি হইলেন পরম নিশ্চিন্ত।

শ্রীজীব গোস্বামী

বর্ত্তমান বরিশাল জেলার খানিকটা এক সময়ে চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। আর ইহারই একাংশ, বাকলায় বিরাজমান ছিল কুমারদেবের পুরাতন অট্টালিকা।

ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ হইতেই চন্দ্রদ্বীপের জীবনস্রোতে ভাঁটা পড়িয়া যায়। সুবিশাল পুরীর পূর্ব্বেকার সে গৌরব অন্তর্হিত হয়। একদিন এখানে ধন জন রাজৈশ্বর্য্যের অবধি ছিল না—আত্ম-পরিজন ও দাসদাসীর কলগুঞ্জনে প্রাসাদটি সদাই থাকিত মুখরিত। অতীত দিনের সে সব কথা এখন পরিণত হইয়াছে উপকথায়।

বাকলা প্রাসাদ ঘিরিয়া রোজই নামিয়া আসে রাত্রির ঘন অন্ধকার। জনবিরল পুরীর কক্ষকোণে, স্তিমিত দীপের আলোকে বর্ষীয়সী মহিলাটি পুরাণের পাতা খুলিয়া বসেন। আর স্নেহময়ী জননীর গা ঘেঁষিয়া বসিয়া প্রিয়দর্শন বালকটি রোজই শুনে শাস্ত্রের অমৃত কাহিনী। পাঠ শেষ হইলে বসিয়া বসিয়া ভাবে আপন বংশের পুণ্যোজ্জ্বল গৌরব কথা। ভারত বিখ্যাত রূপ সনাতন তাহারই দুই জ্যেষ্ঠতাত। কাঙাল বৈষ্ণবের বেশে বৃন্দাবনধামে ইঁহারা ছুটিয়া যান। চৈতন্যপার্ষদ এই দুই ভ্রাতাই হইয়া উঠেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রধান পরিচালক। সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষদ্বয়ের কাহিনী বালক শুনে, আর হৃদয় তাহার এক অজানা পুলকে বারবার শিহরিয়া উঠে।

বিধবা মাতার নয়নমণি এই বালকের নাম জীব। আপন পরিবারের রাজবৈভব সে পায় নাই, পায় নাই কোন সিংহাসনের উত্তরাধিকার। কিন্তু উত্তর জীবনে এই বালকেরই করতলগত হয় এক বিরাট ভক্তি-

সাম্রাজ্য। প্রায় চারিশত বৎসর আগে বৃন্দাবনধামে ভক্তি-আন্দোলনের মর্ম্মকেন্দ্রে তিনি হন অধিষ্ঠিত, পরিচিত হন গৌড়ীয় বৈষ্ণবনেতা শ্রীজীব গোস্বামীরূপে।

সমকালীন বৈষ্ণব সাধকদের পুরোধারূপে শ্রীজীব কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন। মনীষার দীপ্তিতে, ত্যাগ বৈরাগ্য ও সাধনার আলোকসম্পাতে সহস্র সহস্র সাধকের জীবনে জাগাইয়া তোলেন নূতনতর প্রাণস্পন্দন। শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জীবনেই নয়, সারা বাংলাদেশের ধর্ম্ম-সমাজ-সংস্কৃতিময় জীবনে এক নূতন অধ্যায় তিনি রচনা করেন। পিতৃব্য রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কাছেই তাঁহার শিক্ষা, তাঁহাদেরই সাধনার তিনি ধারক ও বাহক। কিন্তু ভারতীয় দর্শন ও সাধনার ক্ষেত্রে এই মহাসাধক তাঁহার নিজস্ব প্রতিভারও এক অবিস্মরণীয় ছাপ রাখিয়া যান।

শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়-যুগের কথা। সনাতন ও রূপ দুই ভ্রাতারই সাধন জীবনে তখন ঘটিতেছে রূপান্তর। মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়া উভয়ে ধন্য হইয়াছেন। অন্তরে সদাই বহিতেছে ভক্তিধর্ম্মের রসস্রোত—কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহারা একেবারে মাতোয়ারা।

বল্লভদেব ছোট ভাই, তাঁহাকেও তাঁহারা নিজেদের এই সাধনপথে সঙ্গে নিতে চাহেন। কিন্তু সে কাজ বড় সহজ নয়। বল্লভ মনে প্রাণে শ্রীরামের ভক্ত, এই ইষ্টকেই তিনি আঁকড়িয়া ধরিয়া বসিয়া আছেন। আবার মহাপ্রভুর আকর্ষণও কম নয়, তাঁহার পরম মনোহর মূর্ত্তি ও প্রেমের স্পর্শ বল্লভের প্রাণ কাড়িয়া নিয়াছে।

রূপ আর সনাতনের একান্ত ইচ্ছা, তিন ভাই একসঙ্গে একই ইষ্টের উপাসক হন। অগ্রজেরা বল্লভকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভাল বাসেন, তাঁহার কল্যাণ কামনাও চিরকাল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের আহ্বানেই বা কি করিয়া সাড়া না দেন? কিন্তু বল্লভের ইষ্টনিষ্ঠাই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয়, মহাপ্রভুর পরমাশ্রয়ের লোভকেও তিনি সরাইয়া রাখেন দূরে, সজল নয়নে অগ্রজদের কাছে নিবেদন করেন—

"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা
কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাও বড় ব্যথা ॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥"

অনুপম বল্লভদেবের এই ইষ্টভক্তি আর একৈকনিষ্ঠা। এই নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া অন্তর্য্যামী, প্রভু শ্রীচৈতন্য সেইদিন এই ভক্তবীরের নাম রাখিলেন—অনুপম। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক, এই শক্তিমান সাধক পুরুষই জীব গোস্বামীর পিতা।

অপর দুই ভ্রাতার মত অনুপমও গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের অধীনে কাজ করিতেন। সরকারী টাঁকশালের দায়িত্বভার ছিল তাঁহার উপর, তিনি ছিলেন সেখানকার অধ্যক্ষ।

সংসার ত্যাগ করিয়া রূপ যেবার মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় মাগিতে যান, তখন অনুপমও হন তাঁহার সঙ্গী। দুই ভাই পরমানন্দে নানা তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান, তারপর উপস্থিত হন বৃন্দাবনে। এখান হইতে গৌড়ে ফিরিবার পথে ঘটে এক মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা, অল্পকাল রোগে ভুগিয়া অনুপমের প্রাণবিয়োগ হয়।

জীবের বয়স তখন প্রায় পাঁচ বৎসর। এবার এই শিশু পুত্রটিকে বুকে করিয়া জননী বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়ে বাস করিতে থাকেন।

'ভক্তিরত্নাকর' রচয়িতা, ঠাকুর নরহরি চক্রবর্ত্তী শ্রীজীবের বালক কালের বড় সুন্দর চিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়া বালক সঙ্গীদের সাথে সে খেলা করে। মনের আনন্দে বসিয়া বসিয়া তৈরী করে কৃষ্ণ বলরামের যুগলমূর্ত্তি। তিলক-চন্দন, পুষ্প-আভরণে ঐ মূর্ত্তি সাজাইয়া তোলে, আনন্দে উচ্ছল হইয়া পড়ে। জন্মান্তরের পুণ্য আর দুর্লভ ভক্তিরসের অধিকারী হইয়াই যেন সে জন্মিয়াছে।

দিনের পর দিন তাহার পিতা ও পিতৃব্যদের ভক্তি সাধনার কথা বালক জননীর কাছে বসিয়া বসিয়া শোনে। মনের অজ্ঞাতে বৈরাগ্যের

বীজটি ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। মায়ের মনে ভয়ের অন্ত নাই, বালক তাঁহার বৈরাগী মন নিয়া কখন কি করিয়া বসে কে জানে? কান্থাকরঙ্গ সম্বল করিয়া শেষটায় বংশের ধারা অনুসরণ করিয়া না বসে।

জননীর মনে পড়ে, কৃপাময় মহাপ্রভু সেবার রামকেলীতে আসিয়া উপস্থিত হন, দর্শন ও স্পর্শনের মধ্য দিয়া রূপ সনাতনকে তিনি আত্মসাৎ করিয়া যান। জীব তখন দুই বৎসরের শিশু। সকলের সঙ্গে জীবের জননীও সেদিন মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। প্রণাম নিবেদনের পর নিজের শিশুটিকেও তাঁহার চরণতলে শোয়াইয়া দিলেন।

প্রসন্ন মধুর হাস্যে মহাপ্রভু এই শিশুর প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত। এই অমৃতনিষ্যন্দী দৃষ্টি সেদিন পুত্রের জীবনে কোন রূপান্তর ঘটাইয়া দিয়া গেল তাহা কে জানে?

বালককাল হইতেই দেখা যায়, জীব বড় স্বভাবভক্ত ও উদাসীন। পিতা পিতৃব্যদের মতই সংসারে তাহার বিরাগ। এই বয়সেই ডোর-কৌপীন ও সন্ন্যাস জীবনের উপর তাহার বড় টান। সুযোগ পাইলেই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের বেশে সাজিতে তাহার মহা উৎসাহ। ঘরে বসিয়া খেলার সাথীদের সাথে এই ভূমিকাই সে অভিনয় করে।

কিন্তু এত কিছু ভাবিয়াই বা কি লাভ? ভবিতব্যকে কে কবে খণ্ডন করিতে পারিয়াছে? উদ্গত নয়ন জল গোপন করিয়া জননী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকেন।

পাঠশালায় জীবের পড়াশুনা শুরু হয়। দিব্যকান্তি বালকের আয়ত নেত্রে রহিয়াছে ভাবময় উদ্দীপনা; তীক্ষ্ণ নাসিকা ও প্রশস্ত ললাটে তেজস্বিতা আর অসামান্য প্রতিভার ছাপ। পণ্ডিত ও পড়ুয়া সবার কাছেই সে সমান প্রিয় হইয়া উঠে।

মেধা ও বুদ্ধির এমন প্রখরতা প্রায়ই দেখা যায় না। অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য ও স্মৃতি সে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। কি করিয়া যে ইহা সম্ভব হয়, সকলে ভাবিয়া অবাক হন।

বিশ বৎসর বয়সে শ্রীজীবের স্থানীয় চতুষ্পাঠীর পড়া শেষ হইল।

তখনকার দিনে নবদ্বীপ বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের আদি লীলাভূমি এই স্থান, সেজন্যও এখানকার জনপ্রিয়তার সীমা নাই।

এবার শ্রীজীবের উচ্চতর শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করা দরকার। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি নবদ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ভক্ত তরুণ ইতিমধ্যেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, সংসারধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করিবেন না, ভক্তি সাধনায় দীক্ষা নিয়া থাকিবেন চিরকুমার। নিজে হইতে এবার তাই কাঁধে তুলিয়া নিলেন ত্যাগব্রতের ভিক্ষাঝুলি, কটিদেশে জড়ানো রহিল বৈষ্ণবীয় দৈন্যের চিহ্ন ডোর-কৌপীন। গৃহ ত্যাগ করিয়া এই যে শ্রীজীব সেদিন পথে বাহির হইলেন, উত্তরজীবনে আর তিনি কখনো সংসারে ফিরিয়া আসেন নাই।

নবদ্বীপে পৌঁছিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। ভাগ্য সত্যই বড় সুপ্রসন্ন। খড়দহ হইতে নিত্যানন্দপ্রভু দলবল নিয়া কয়েকদিন হইল সেখানে আসিয়াছেন। সদানন্দময় প্রভুকে ঘিরিয়া সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে আনন্দের এক মধুচক্র। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে তিনি এ সময়ে অবস্থান করিতেছেন, দর্শন পাওয়া মাত্র ছুটিয়া গিয়া শ্রীজীব তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সম্মুখে—নিত্যানন্দের হৃদয়ে তাই আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল। শুরু হইল উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তন। শ্রীজীবের শিরে চরণ রাখিয়া করিতে লাগিলেন আশীর্ব্বাদ।

নবদ্বীপে গৌরলীলার যতগুলি চিহ্নিত স্থান রহিয়াছে জীবকে সমস্তই তিনি সোৎসাহে নিজের সঙ্গে করিয়া দেখাইলেন।

মহাপ্রভুর স্মৃতিভরা এক একটি তীর্থভূমি শ্রীজীব দর্শন করেন, আর তাঁহার সারা দেহমন ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

পরের দিন করজোড়ে নিত্যানন্দকে তিনি নিবেদন করিলেন, "প্রভু! তোমার পুণ্যময় সঙ্গ নিয়ে মহাপ্রভুর আদি লীলার পবিত্র স্থান সবই

দেখলাম। এবার সারা অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠেছে অন্ত্যলীলাস্থল দেখবার জন্যে। তুমি আমায় আজ্ঞা দাও, নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর পুণ্য-স্মৃতি বুকে করে সাধন ভজনে আমি নিমজ্জিত হয়ে যাই। আরো একটা বাসনা আমার আছে, যদি কৃপা করে তুমি তা পূরণ কর। আমায় তোমার সেবকরূপে তোমার কাছেই থাকতে দাও। তোমার পরমাশ্রয়ে রেখে, দাও আমায় কৃষ্ণসুধা রস।"

আগামী দিনের বৈষ্ণব আন্দোলনের এই চিহ্নিত নায়ক, আর তাঁহার বিপুল সম্ভাবনার কথা বুঝিয়া নিতে নিত্যানন্দপ্রভুর সেদিন ভুল হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছেন, এ তরুণের মধ্যে যে শক্তির উৎস রহিয়াছে তাহা একদিন সারা বৈষ্ণব সমাজের বুকে ঢালিয়া দিবে প্রাণরস। রূপ-সনাতনের উত্তরসাধক—শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমরাজ্যের ভাবী নিয়ামক এই শ্রীজীব। অনাগত দিনের এক মহান ভূমিকা তাঁহার রহিয়াছে।

প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া নিত্যানন্দ কহিলেন, "না—না শ্রীজীব। নীলাচলে গিয়ে ভাবোন্মত্ত হয়ে বসে থাকলে তোমার চলবে না। গৌড় দেশে তো এখনো আমিই রয়েছি। তুমি যাও বৃন্দাবনে। জানতো, মহাপ্রভু তোমার বংশকেই এই বৃন্দাবনধাম দিয়ে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন কর, ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হও। আজকের দিনে সব চাইতে বড় কাজ হচ্ছে বৈষ্ণব সমাজকে সুসংগঠিত করে তোলা। বৃন্দাবনে বসে মহাপ্রভুর পার্ষদ রূপ সনাতন তাই করছেন। তোমার স্থান আজ তাঁদেরই পাশে। ঐশ্বরীয় কর্ম্মে রয়েছে তোমার এক বৃহৎ দায়িত্ব।"

শ্রীজীব সবিনয়ে বলেন, "কিন্তু প্রভু, আমি যে দীনাতিদীন। তেমন ভার গ্রহণের যোগ্যতা আমার কই?"

"ভেবো না বৎস, এ হচ্ছে মহাপ্রভুর কাজ, তিনি নিজেই সব করিয়ে নেবেন। তবে বৃন্দাবনে গিয়ে কর্ম্মভার গ্রহণের আগে তুমি কিছুদিন কাশীধামে থেকে বেদ বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন কর। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের শাস্ত্রভিত্তি, তার দার্শনিক তত্ত্ববিচার তোমার মনীষার সাহায্যে গড়ে উঠুক,

এটাই আমি আন্তরিকভাবে চাই। রূপ সনাতনের পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকার নিয়েই তুমি শুধু আসনি, তোমার অলোকসামান্য প্রতিভা নিয়েও তুমি এসেছো। সে প্রতিভার স্ফুরণ আমি আজ তোমার চোখে মুখে ললাটে দেখতে পাচ্ছি। তুমি আর দেরী না করে রওনা হও। কাশীতে গিয়ে মধুসূদন বাচস্পতির কাছ থেকে নাও বেদান্তের পাঠ।"

কাশীধামে মধুসূদন বাচস্পতির তখন প্রবল প্রতাপ। পণ্ডিত শিরোমণি, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের তিনি ছিলেন প্রিয়তম শিষ্য। মহাপ্রভুর কৃপাধন্য হওয়ার পর সার্ব্বভৌমের জীবনে ঘটে এক মহা রূপান্তর। অদ্বৈততত্ত্ব ও ভক্তি সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া বেদান্তের নব ব্যাখ্যা তিনি প্রচার করিতে থাকেন। গুরুর সমীপে তাহাই শিক্ষা করিয়া মধুসূদন বাচস্পতি কাশীধামের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপে চিহ্নিত হইয়াছেন।

নিত্যানন্দপ্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীজীব এবার বারাণসীতে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য উপনীত হইলেন।

অদ্ভুত মনীষা এই তরুণ বিদ্যার্থীর। বাচস্পতি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যান। চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই মহাপ্রতিভাধর বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী বেদান্ত শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া উঠেন। পঁচিশ বৎসর বয়সেই তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—

"কাশীতে শ্রীজীবেরে প্রশংসে সর্ব্ব ঠাঁই ॥
ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই ॥"

[চৈতন্যচরিত্রামৃত]

শাস্ত্রাধ্যয়নের পর্ব্ব শেষ করিয়া, বেদ বেদান্তে কৃতী হইয়া তরুণ তাপস কাঙাল সাধকের বেশে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তখন তাঁহার পিতৃব্যদ্বয়—সনাতন ও রূপ গোস্বামীর একচ্ছত্র প্রভুত্ব। শ্রীচৈতন্য কিছুদিন আগে নীলাচলে লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, গোস্বামীদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে এক শোকের ছায়া। একত্র হইয়া সকলে এবার ভাবিতেছেন, কি করিয়া মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম্ম আন্দোলনের বিস্তার সাধন

করা যায়, ভিত্তিকে করা যায় দৃঢ়তর।

গোস্বামীরা শাস্ত্ররচনা ও সাধন প্রণালী নির্ণয়ে ব্যস্ত, আর দিনের পর দিন বৃন্দাবনে জড়ো হইতেছেন বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধকদল। নব নব বিগ্রহ-মন্দির ও কুঞ্জ গড়িয়া উঠিতেছে চারিদিকে।

এই সময়ে শ্রীজীব সেখানে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমেই ভক্তিভরে তিনি রূপ ও সনাতনের পদবন্দনা করিলেন।

অভিজাত বংশের একমাত্র বংশধর শ্রীজীব। একি ত্যাগ তিতিক্ষা তাঁহার! কৃষ্ণ সেবার জন্য একি অদ্ভুত আর্ত্তি! রূপ সনাতনের আনন্দ আর ধরে না। তখনি সোৎসাহে তাঁহাকে নিয়া বাহির হইলেন, কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিয়া প্রাচীন আচার্য্যদের সহিত তাঁহার পরিচয় সাধন করাইয়া দিলেন। শ্রীজীবের নয়নাভিরাম মূর্ত্তি, অতুলনীয় প্রতিভা ও শুদ্ধাভক্তি সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিল।

বৃন্দাবনের তখন সুবর্ণযুগ চলিয়াছে। আগে হইতেই লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী এই পবিত্র ধামে আসিয়া বাস করিতেছেন। তারপর ক্রমে ক্রমে হইয়াছে প্রবোধানন্দ, সনাতন, রূপ ও রঘুনাথ ভট্টের আগমন। চৈতন্যদেবের তনুত্যাগের পর একে একে এখানে সমবেত হইয়াছেন গোপাল ভট্ট, কাশীশ্বর, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভৃতি। গোস্বামী-প্রধানদের মধ্যে সর্ব্বশেষে আবির্ভূত হইলেন সর্ব্বকনিষ্ঠ, শ্রীজীব।

সেদিনকার বৈষ্ণবদের মধ্যে এই নবাগত তরুণ সাধক এক আলোড়নের সৃষ্টি করেন। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ব্রজমণ্ডলের ভক্তি-সাম্রাজ্যের ভাবী নায়করূপে তাঁহার ভূমিকাটি চিহ্নিত হইয়া যায়।

সনাতন নির্দ্দেশ দিলেন, "রূপ, শ্রীজীবকে আমি আজ থেকে তোমার হাতেই সমর্পণ করলাম। তাকে তুমি বৈষ্ণবীয় দীক্ষা দাও, গড়ে তোল এখানকার দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মের জন্য।"

সিদ্ধ সাধক, রূপ গোস্বামীর মন্ত্রদীক্ষা হইয়া উঠে চৈতন্যময়। নবীন

সাধকের সর্ব্বসত্তায় ইহা প্রেমভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। গুরু-উপদিষ্ট সাধন পথে শ্রীজীব নিষ্ঠাভরে অগ্রসর হইয়া চলেন। ভক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অচিরে তাঁহার অধিগত হয়। তাঁহার সহজাত মনীষার সহিত মিলিত হয় রূপ গোস্বামীর প্রদত্ত সাধনবল।

ভারতে নানা অঞ্চল হইতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা সে সময়ে ব্রজ-মণ্ডলে উপস্থিত হইতেন। রূপ গোস্বামী শাস্ত্রবিদ্ বৈষ্ণব আচার্য্যদের নেতা, পণ্ডিতেরা আসিয়া প্রথমে দাঁড়াতেন তাঁহারই সম্মুখে। কিন্তু রূপের এই শাস্ত্রীয় বিতর্কে কোন উৎসাহ নাই। প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠা বলিয়াই এই পরম বৈষ্ণব গণ্য করেন। তাই কেহ কখনো তর্ক বিচারে আহ্বান করিলে তিনি সাড়া দিতে চাহিতেন না, আনন্দের সহিত জয়পত্র লিখিয়া দিয়া বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতকে তুষ্ট করিতেন।

গুরুগতপ্রাণ শ্রীজীবের কাছে ইহা অসহ্য। অনধিকারী পণ্ডিতের দল কেন ফাঁকি দিয়া এভাবে গুরুর কাছ হইতে জয়পত্র নিবে ? শ্রীজীব নিজে ভগবৎ-দত্ত মহাপ্রতিভার অধিকারী। এই নবীন বয়সে আত্মবিশ্বাসও রহিয়াছে উদগ্র। তাই সুযোগ পাইলে কখনো এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের তিনি ছাড়িতেন না। রূপ গোস্বামী কাছে না থাকিলে আর কথা ছিল না, পণ্ডিতদের তিনি পর্য্যুদস্ত করিয়া ছাড়িতেন।

একবার এরূপ করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়েন। রূপ গোস্বামী সে সময়ে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র রচনা শুরু করিয়াছেন। প্রিয় শিষ্য শ্রীজীব নিকটেই বসিয়া থাকেন, গুরুকে সেবা যত্ন করার সঙ্গে সঙ্গে করেন নানারূপ সাহায্য। কখনো পুঁথি খুঁজিয়া দেন, কখনো দেন আকর গ্রন্থের সন্ধান, কখনো করেন অনুলিখন।

এমন সময়ে একদিন সেখানে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব নেতা, বল্লভ ভট্ট আসিয়া উপস্থিত। ভট্টজী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, বৈষ্ণব সমাজের এক প্রতিষ্ঠাবান আচার্য্য। রূপ গোঁসাই তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আলাপ আলোচনা করিতে করিতে রূপের সদ্যরচিত গ্রন্থের কথাও উঠিল। কিছুটা পড়িয়া শোনানো হইলে, বল্লভ ভট্ট উহার

মঙ্গলাচারণ শ্লোকের দুই চারিটি ভুল দেখাইয়া দিলেন।

শ্রীজীব একপাশে বসিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। ভট্টজীর অভিমত কিন্তু তাঁহার কাছে মোটেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু উপায় কি? গুরুদেবের সম্মুখে তিনি মুখ খুলিতে পারেন না। মনের উত্তেজনা চাপিয়া চুপ করিয়াই বসিয়া আছেন।

রূপ গোস্বামী কিন্তু সবিনয়ে ভট্টজীর সিদ্ধান্তই মানিয়া নিলেন, কহিলেন, "আচার্য্যবর, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। অনবধানতার জন্য এ ভুলটি চোখে পড়ে নি। আজ বড় উপকার করলেন আমার।"

উহা সংশোধন করিতেও দেরী হইল না।

ইতিমধ্যে বেলা বাড়িয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়ি ঠাকুরের ভোগরাগের যোগাড় করিতে হইবে। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া গোস্বামীপ্রভু যমুনায় স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। ভজন কুটিরে শুধু বসিয়া রহিলেন বল্লভ ভট্ট আর শ্রীজীব।

এইবার প্রার্থিত সুযোগ মিলিল। গুরুদেব দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়ার সাথে সাথেই শ্রীজীব ভট্টজীকে বিতর্কে আহ্বান করিলেন। ভক্তিশাস্ত্র হইতে অজস্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিলেন, তাঁহার গুরুর লেখায় কোন ভুল ভ্রান্তি নাই। লোকোত্তর শ্রীজীবের মনীষা, অকাট্য যুক্তিজাল। শাণিত মন্তব্যের আঘাতে বল্লভ ভট্ট বড় দমিত হইয়া গেলেন।

বিচারে এমনভাবে পরাজিত হইয়া ভট্টজীর ক্ষোভের অন্ত রহিল না। বারবারই কেবল ভাবিতে লাগিলেন, 'এমন অমানুষী প্রতিভা তো কখনো দেখিনি। কে এই শাস্ত্রবিদ্ যুবক? জীবনে কখনও আমি এমন প্রতিভার প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইনি।'

রূপ গোস্বামী এবার নদীতীর হইতে ফিরিতেছেন। বল্লভ ভট্টের মনের ক্ষোভ ও উত্তেজনা এখনো কমে নাই, নিকটে গিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা গোস্বামীজী, এই তরুণ বৈষ্ণবটি কে, বলুন তো? অসাধারণ এঁর বিদ্যাবত্তা, তেমনি অপ্রতিরোধ্য এঁর সিদ্ধান্ত।"

ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে রূপের দেরী হইল না। বুঝিলেন, নিশ্চয়

শ্লোক সংশোধনের প্রশ্ন নিয়া শ্রীজীবের সহিত ইতিমধ্যে ভট্টজীর বিচার বিতর্ক হইয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে বৃদ্ধ রূপ গোস্বামীর দৈন্যময় ভক্তিবিহ্বল রূপটি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

ভজন কুটিরে আসিয়া শ্রীজীবকে নিকটে ডাকাইলেন। তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "মূর্খ, অর্ব্বাচীন! শুধু শুধু প্রবীণ আচার্য্যকে কেন তুমি আক্রমণ করতে গিয়েছ? এতটুকু সংযম যদি ভেতরে না থাকে, তবে কেন নিলে এই ত্যাগ-বৈরাগ্যময়, দৈন্যময় বৈষ্ণব জীবন? কি লাভ তোমার এই তিলক, মালা আর কণ্ঠি ধারণের অভিনয়ে? তোমার মত মূঢ়ের মুখদর্শন আমি করতে চাইনে। দূর হও আমার সামনে থেকে!"

রূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না। এই সামান্য অপরাধের জন্য শ্রীজীবকে তখনি স্থান ত্যাগ করিতে হইল।

গুরুর আদেশ শিরে ধারণ করিয়া শিষ্য সেদিন দৈন্যভরে এক অরণ্য মধ্যে আশ্রয় নিয়াছেন। শুরু করিয়াছেন কৃচ্ছ্রব্রত ও কঠোর ভজন সাধন। পানাহারের কোনরূপ চেষ্টা নাই, ধীরে ধীরে দেহটিকে তিনি শুকাইয়া আনিতেছেন। অন্তরে জ্বলিতেছে আত্মগ্লানির তুষানল।

নিত্যকার ভজন শেষ হইয়া গেলে শ্রীজীব আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পর্ণ-কুটিরে বসিয়া থাকেন, আর ভাবেন তাঁহার আত্মশোধনের কথা, ইষ্ট প্রাপ্তির কথা—

"দেহ হইতে প্রাণ ভিন্ন করিয়া ত্বরিতে।
প্রভু পাদপদ্ম পাব এই চিন্তা চিতে॥"

—ভক্তি রত্নাকর

সনাতন গোস্বামী এ সময়ে একদিন কি এক কাজে এই অরণ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। লোকমুখে শুনিলেন, এক কৃচ্ছ্রব্রতী বৈষ্ণব সাধক এখানে মরণ-পণ সাধনায় রত।

শুনিয়াই তাঁহার কৌতূহল জাগিল। পর্ণ-কুটিরের দ্বারে আসিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ কি? এ যে তাঁহাদের শ্রীজীব! দেহখানি

একেবারে অস্থি-চর্ম্মসার, চিনিবারই যো নাই। শ্রীজীব ক্রন্দন করিয়া পিতৃব্যের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

সমস্ত ঘটনা শোনার পর সনাতন গোস্বামীর করুণা হইল। আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "বৎস শ্রীজীব, তুমি মনে কোন খেদ রেখো না। মহাপ্রভুর কৃপায়, এই দুঃখের ভিতর দিয়েই তোমার জীবনে আসছে বৃহত্তর কল্যাণ। কোন ভয় নেই। তুমি আরো কিছুকাল এখানে থাকো, এমনি দুঃখদহনের ভেতর দিয়ে শুদ্ধতর হয়ে আবার ফিরে এসো। আমি তোমার কথা রূপকে অবশ্যই বলবো।"

বৃন্দাবনে ফিরিয়াই রূপের সাথে সনাতন গোস্বামীর দেখা। প্রথমেই শ্রীজীবের শঙ্কাজনক অবস্থার কথা বলিলেন না। প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভালো কথা, রূপ, তোমার ভক্তিরসামৃত-গ্রন্থের সমাপ্তির আর কত বাকী? ভক্তসমাজ যে এ গ্রন্থের আশায় দিন গুনছে।"

সনাতন জানেন, এই মহান গ্রন্থের রচনায় শ্রীজীব ছিলেন রূপের প্রধান সহায়ক। তাঁহার অভাবে নিশ্চয়ই মহা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, কাজের গতিও মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। সুকৌশলে আসল কথাটি উত্থাপন করাই তাঁহার অভিপ্রায়।

রূপ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, মনে ইতিমধ্যে শ্রীজীবের জন্য কিছুটা কষ্টও হইয়াছে।—

"শ্রীরূপ কহেন প্রায় হইল লিখন।
জীব রহিলেই শীঘ্র হয় শোধন।
গোস্বামী কহেন জীব জীয়া মাত্র আছে।
দেখিনু তাহার দেহ বাতাসে হালিছে।"

—ভক্তিরত্নাকর

সনাতন গোস্বামীর ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। প্রাণপ্রিয় শিষ্যের সমস্ত কথাই রূপ গোস্বামী সেদিন বসিয়া বসিয়া শুনিলেন। অন্তরে বড় করুণা জাগিয়া উঠিল। এবার তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিজের কাছে ডাকাইয়া আনিলেন। দুঃখের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া শ্রীজীবের সাধন

জীবনের স্বর্ণসম্পদ সেদিন আরো উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বৃন্দাবনের অরণ্যে কৃচ্ছ্রসাধনার পর্ব্ব শেষ করিয়া শ্রীজীব যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি এক নূতন মানুষ। ঐকান্তিক ভক্তি ও আত্মবিলুপ্তির পরম চেতনা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবনে। সাধনবল আর মনীষার সেখানে ঘটিয়াছে অপরূপ সমন্বয়। গুরুর দেওয়া আঘাতের মধ্য দিয়া শ্রীজীবের অন্তরে এবার জুড়িয়া বসিয়াছে মানবপ্রেম ও মানব কল্যাণের পরম বোধ।

শিষ্যের এই রূপান্তর দর্শনে রূপ গোস্বামীর আনন্দ আর ধরে না। এবার হইতে তাঁহার জন্য পৃথক বিগ্রহসেবার ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিলেন —এই ঠাকুরের নাম শ্রীরাধা-দামোদর।

লীলাময়, পরম সুন্দর এই বিগ্রহটি কিছুদিন আগে রূপ গোস্বামীকে স্বপ্নে দর্শন দেন। সারা অন্তর তাঁহার এই শ্রীমূর্ত্তির রূপে রসে উদ্বেল হইয়া উঠে। পরদিনই ব্যাকুল হইয়া শিল্পী ডাকাইয়া আনেন, তৈরী করান তাঁহার স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তি। তারপর নিজের ভজনকুটিরে এ বিগ্রহকে স্থাপন করিয়া কিছুদিন সেবা পূজা করিলেন। এবার এই সেবাপূজার ভার প্রদান করিলেন প্রিয় শিষ্যের উপর। গুরু-পূজিত এই বিগ্রহের সেবার অধিকার পাইয়া শ্রীজীবের আনন্দের সীমা রহিল না।

বৃন্দাবনের শৃঙ্গার বটের এক কোণে, রূপ গোস্বামী ও শ্রীজীবের ভজনকুঞ্জের কাছে রাধা-দামোদরের এক সুরম্য মন্দির স্থাপন করা হইল। পরবর্ত্তীকালে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে বৃন্দাবনবাসীরা অস্থির হইয়া উঠেন। এই অত্যাচার এড়ানোর জন্য মন্দিরের মূল বিগ্রহটি বৈষ্ণবেরা জয়পুরে সরাইয়া দেন, সেস্থলে স্থাপিত হয় এক প্রতিভূ-বিগ্রহ। ইঁহার সেবাই বৃন্দাবনের মন্দিরে এখনো চলিতেছে।

ইতিমধ্যে বৈষ্ণব সমাজে নামিয়া আসে এক দুর্দ্দৈব, সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া সনাতন গোস্বামী একদিন নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ‘চরণ পাহাড়ী’ শিলা ছিল এই প্রবীণ বৈষ্ণব মহাপুরুষের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। তাঁহার তিরোধানের পরে জীব গোস্বামী এটিকে শিরে ধারণ

করিয়া নিয়া আসেন, স্থাপন করেন নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে।

কথিত আছে, বৃদ্ধ ও অশক্ত হইয়া পড়িলে সনাতন তাঁহার চির অভ্যাস মত প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে পারিতেন না। তাই গোবিন্দজী কৃপা করিয়া তাঁহার কাছে আবির্ভূত হন, তাঁহাকে এই চরণ-পাহাড়ী প্রদান করেন। প্রতিদিনকার ভজন শেষে, প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায়, সনাতন তাঁহার ইষ্টদেবের দেওয়া এই শিলাখণ্ডকেই পরিক্রমা করিতেন। শ্রীজীবের রাধা-দামোদর মন্দিরে এই গোবর্দ্ধন প্রতীক আজিও বিরাজিত রহিয়াছে। সকল বৈষ্ণব ভক্তদের কাছেই এই শিলা এক পরম পবিত্র বস্তু, বৃন্দাবনের এক শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

নূতন মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে জীব গোস্বামী গড়িয়া তোলেন তাঁহার বিরাট গ্রন্থশালা। প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থরাজী এখানে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়।

শাস্ত্রগ্রন্থের এই সঞ্চয় কবে যে কি ভাবে শূন্য হইয়া গিয়াছে, আজ আর তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সনাতন ও রূপ বিগত হইয়াছেন। নন্দকূপবাসী প্রবীণ আচার্য্য প্রবোধানন্দও লীলা সম্বরণ করিলেন। লোকনাথ, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি তখন বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত, লোকান্তর যাত্রার জন্য তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখনকার গোস্বামীদের মধ্যে একমাত্র শ্রীজীবই পূর্ণবয়স্ক ও কর্ম্মক্ষম। প্রবীণ বৈষ্ণব মহাপুরুষদের কৃপায় প্রেমভক্তির সাধনা তাঁহার সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রেও তিনি এ সময়ে অদ্বিতীয়।

ব্রজমণ্ডলে এখন শ্রীজীবের সমকক্ষ বৈষ্ণব নেতা আর কেহ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের দায়িত্ব নিবার মত এমন শক্তিধর আচার্য্যই বা আর কে আছে? তাই নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই ব্রজমণ্ডলের অধিকর্ত্তা-রূপে সকলে সে সময়ে তাঁহাকে মানিয়া নেয়।

রূপ ও সনাতন একাধারে ছিলেন মহাপণ্ডিত ও মহাসাধক। ইঁহাদের

শাস্ত্রচর্চ্চা, ভক্তিগ্রন্থ রচনা ও সাধনার ফলে বৃন্দাবন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে, ভক্তি-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করে। আর জীব গোস্বামীর সময়েই এই খ্যাতি চরমে পৌঁছে, ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই শক্তিধর আচার্য্যের সাধনা ও লোকোত্তর প্রতিভার কাছে সমকালীন শিক্ষিত সমাজ মস্তক অবনত করে।

বহু ভক্ত বৈষ্ণব তখন বৃন্দাবনের মহাতীর্থে ধীরে ধীরে সমবেত হইতেছে। কেহ আসে ভক্তি-ধর্ম্মে দীক্ষা নিবার জন্য, কেহ চায় ভক্তি-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন। সবাইকেই কিন্তু শরণ নিতে হয় জীব গোস্বামীরই কাছে। দুই বাহু প্রসারিয়া এই মহান নেতা মুমুক্ষু মানুষমাত্রকেই আশ্রয় দিতে থাকেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা প্রায়ই বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন, শাস্ত্রবিদ্ বৈষ্ণবদের সহিত তাঁহাদের বিচার-বিতর্ক চলে। গোস্বামী সমাজের মুখপাত্র শ্রীজীব, তাঁহাকেই ইঁহাদের সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার সাধনবল ও অমানুষী প্রতিভার কাছে অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী তার্কিক নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে এসময়ে আবির্ভূত হয় বহু নূতন লেখক ও টীকা-ভাষ্যকার। কিন্তু যখনি যাহা কিছু রচিত হয়, সুধী সমাজে প্রশ্ন ওঠে, এ সম্পর্কে শ্রীজীব কি বলেন? তাঁহার সমর্থন কই? শ্রীজীবের অনুমোদন ছাড়া কোন গ্রন্থ, কোন তত্ত্বই প্রামাণ্য বা পঠিতব্য বলিয়া গণ্য হয় না। নানা অঞ্চল হইতে সাধনতত্ত্ব ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা চাহিয়া পত্রাদি প্রেরিত হয় তাঁহারই কাছে। দলে দলে তরুণ বৈষ্ণবেরা আসেন এই মহা মনীষীর পরমাশ্রয়ে।

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সাধননিষ্ঠা ও খ্যাতির কথা প্রায়ই সম্রাট আকবরের কানে আসে। কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা তাঁহার ক্রমে বাড়িয়া যায় এবং আনুমানিক ১৫৭৩ সালে তিনি সদলবলে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। এসময়ে বৈষ্ণব আচার্য্যদের মুখপাত্ররূপে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ

করেন শ্রীজীব। যেমন মনোহর এই মহাবৈষ্ণবের দিব্যশ্রীমণ্ডিত মূর্ত্তি, তেমনি করুণসুন্দর তাঁহার দৈন্যময় বেশ। তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা ও তেজস্বিতা দেখিয়া বাদশাহ মুগ্ধ হইয়া যান।

বৃন্দাবনের ইতিহাসবেত্তা গ্রাউস সাহেব লিখিয়াছেন, আকবর এই সময়ে রাধা-গোবিন্দের লীলাভূমি নিধুবন দর্শন করার জন্য উৎসুক হন। শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামীরা সম্মতি দান করেন এবং বাদশাহের চোখে কাপড় বাঁধিয়া লীলাস্থলীর এক কোণে দাঁড় করিয়া দেওয়া হয়।

এই ভূমিতে দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র আকবর শাহ অনুভব করেন এক বিস্ময়কর অলৌকিক অভিজ্ঞতা। ভিন্নধর্ম্মী সম্রাটকে স্বীকার করিতে হয় যে, সত্যই তিনি এক অতি পবিত্র লীলাভূমি স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য সেদিন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মুসলমান সম্রাটদের অনুমতি ছাড়া বৃন্দাবনে আগে হিন্দু মন্দির নির্ম্মাণ করা যাইত না। আকবর এবার এই বাধা অপসারণ করিলেন। সানন্দে অনুমতি দিলেন, এবার হইতে বৃন্দাবনে ভক্তেরা স্বেচ্ছামত দেব-দেউল নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন।

সম্রাট বড় প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, বৃন্দাবনে তাঁহার এই আগমনকে স্মরণীয় করিয়া রাখেন। এজন্য যে কোন উদ্যোগ আয়োজন ও অর্থব্যয় করিতে তিনি প্রস্তুত। গোস্বামীদের সবিনয়ে প্রশ্ন করিলেন, তাঁহাদের প্রার্থনীয় কিছু আছে কিনা?

শ্রীজীব উত্তর দিলেন, "সম্রাট, আমরা দীনহীন কাঙাল বৈষ্ণব, সর্ব্বস্ব ছেড়ে যাতে প্রভুর শরণ নিতে পারি তাই যে আমাদের সাধনা। আমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, চাইবারও কিছু নেই।"

আকবর সহজে ছাড়িবেন না। বারবারই তিনি কহিতে লাগিলেন, "আপনারা যা হোক একটা কিছু আমার কাছে চেয়ে নিন, তাহলে আমি বড় খুশী হবো।"

"সম্রাট, শ্রীধাম বৃন্দাবনে বৈষ্ণবেরা যাতে নিরুপদ্রবে ধর্ম্মাচরণ ও শাস্ত্রচর্চ্চা করতে পারেন, সেদিকে আপনি একটু দৃষ্টি রাখলে ভাল হয়।

প্রাচীন কালের হিন্দু রাজারা একান্ত নিষ্ঠায় তপোবন রক্ষা করতেন। আমরা চাই, আপনিও তাই করুন। আরও একটা কথা, বৃন্দাবনের অরণ্যে মৃগয়া করতে এসে অনেকে প্রাণী হত্যা করেন। কায়মনোবাক্যে অহিংস বৈষ্ণবেরা এতে বড় ব্যথিত হন। এই প্রাণীহত্যা আপনি দয়া করে বন্ধ করুন। এই আমাদের প্রার্থনা।"

সম্মতি তখনি মিলিয়া গেল।

বাদশাহের ফর্ম্মান জারি হইল, ব্রজমণ্ডলে আর প্রাণীহত্যা করা চলিবে না। পবিত্রস্থানের গাছপালা কাটাও নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

শ্রীজীব প্রভৃতি বৈষ্ণব গোস্বামীদের প্রেমশ্রীমণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিয়া আকবর মুগ্ধ হন। বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাপুরুষদের চিত্র অঙ্কনের জন্য তিনি রাজধানী হইতে সুদক্ষ চিত্রকরও প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোস্বামীদের প্রতিচ্ছবি নেওয়া বড় কঠিন, কেহই ইহাতে রাজী হন নাই। এ সময়ে শ্রীজীব বাদশাহকে বুঝাইয়া এক পত্র দেন। তিনি লেখেন—ত্যাগ বৈরাগ্য ও দৈন্য বৈষ্ণবদের সাধনার এক প্রধান অঙ্গ; ছবি না নিতে পারায় সম্রাট যেন ক্ষুণ্ণ না হন।

বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের এই স্মৃতি দীর্ঘকাল আকবরের চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই। উত্তরকালে একবার তাঁহার সখ হয়, তিনি হিন্দু সাধকের সাজে সাজিবেন। এ সময়ে মালা-তিলকধারী বৈষ্ণব গোস্বামীর বেশকেই তিনি বাছিয়া নিয়াছিলেন।

অসামান্য সাধনা ও মনীষার অধিকারী শ্রীজীবের জীবনে মিলিত হইয়াছিল সংগঠন-কুশলতা ও ব্যবহারিক জ্ঞান।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ও শাস্ত্রগ্রন্থ রচনায় তাঁহার উৎসাহের অবধি ছিল না। তখনকার দিনে এসব গ্রন্থের বেশীর ভাগ তালপত্র বা ভূর্জ্জপত্রে লেখা হইত, তাই গ্রন্থের অনুলিখন ও প্রচার বড় সহজ কাজ ছিল না। শ্রীজীবের চেষ্টায় মুঘল রাজধানী হইতে কাগজ আনীত হয় এবং ইহার ফলে বৃন্দাবনের শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচার ত্বরান্বিত হইয়া উঠে।

সনাতন ও রূপের গ্রন্থাদি রচনার সময়ে জীবগোস্বামী তাঁহাদের সাহায্য করিতেন, তাঁহাদের এই মহান ব্রতের উদ্‌যাপনে তিনি ছিলেন এক অপরিহার্য্য সহকারী।

সনাতনের পাণ্ডিত্য আর রূপের কবিত্বের বিস্ময়কর সমাহার দেখা গিয়াছিল জীবগোস্বামীর জীবনে, আর এই অনন্যসাধারণ উত্তরাধিকারের সঙ্গে মিলন ঘটিয়াছিল অপরিসীম নিষ্ঠার। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্ম্মাণে এমন সাফল্য তিনি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমাগত প্রায় ষাট বৎসরকাল শ্রীজীব শাস্ত্রচর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। পঁচিশটিরও বেশী মূল্যবান শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রণীত, সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত হয়। ইহার মধ্যে রহিয়াছে তাঁহার সন্দর্ভ বিচার গ্রন্থ, টীকা, ব্যাকরণ, ভাষ্য, সংগ্রহ ও স্তব এবং 'শ্রীগোপাল চম্পূ' ইত্যাদি লীলাগ্রন্থ।

'ভাগবতসন্দর্ভ' এই মহামনীষীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। চিরকালের বিদ্বজ্জন সমাজে, দর্শন ও ধর্ম্মগ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে ইহা তাঁহাকে এক অসামান্য মর্য্যাদা দান করিয়াছে।

রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বসূরীরা বৈষ্ণব মতবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ভক্তি-গ্রন্থে দেখা গিয়াছে লীলা বর্ণনা; লীলার দৃষ্টান্ত হইতে ভক্তি ও রসতত্ত্বের উদ্ধার সাধনও তাঁহারা যথেষ্ট করিয়াছেন। বৈষ্ণবীয় বিচার ও ভজনরীতি সংশ্লিষ্ট বিধি নিষেধের সঙ্কলনও এই সব সাধক ও মনীষীরা কম করেন নাই। কিন্তু সকলেরই মনে প্রশ্ন জাগিতে থাকে—শ্রীচৈতন্যের নব-প্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার খুবই হইতেছে, কিন্তু ইহার উপযোগী দার্শনিক তত্ত্ববিচারের গ্রন্থ তেমন কই?

সনাতন ও রূপ তখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। দেহ আর তেমন কর্ম্মক্ষম নাই। তাছাড়া, আজকাল ভজনরসেই সদা মগ্ন থাকেন। দার্শনিক তত্ত্ববিচারের গ্রন্থরচনার ভার তাই বয়োকনিষ্ঠ, সুপণ্ডিত গোপাল ভট্টের

উপর তাঁহারা দিয়াছিলেন, ভট্ট গোস্বামী এ মহা দায়িত্বপূর্ণ কাজ শুরু করিয়াছিলেন মাত্র, ইহা সমাপ্ত হয় শ্রীজীবের দ্বারা—তাঁহার 'ষটসন্দর্ভ গ্রন্থ'ই এই বহু প্রতীক্ষিত বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থ। তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি এই ছয়টি সন্দর্ভে ইহাকে ভাগ করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া শ্রীজীব 'ক্রমসন্দর্ভ' নামেও ভাগবতের এক টীকা রচনা করেন। একত্রীকৃত এই সন্দর্ভসমূহই জীব গোস্বামীর বিশ্ববিখ্যাত 'ভাগবতসন্দর্ভ'। ভক্তিদর্শনের সারভাগ এই মহাগ্রন্থে নিহিত রহিয়াছে। সাধ্য সাধনতত্ত্বের নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে অনবদ্য বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া।

বৃন্দাবনের প্রেমভক্তির সাম্রাজ্য এই সময়ে দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আর সাধন-শক্তি, মনীষা ও কর্ম্ম শক্তিবলে শ্রীজীব প্রায় একক ভাবে ধারণ করিয়া আছেন তাহার পরিচালন-রশ্মি।

ইহার পর ঐশী কর্ম্মের সহায়করূপে বৃন্দাবনের রঙ্গমঞ্চে তিন মহা-বৈষ্ণবের আবির্ভাব ঘটে। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীজীবের পাশে আসিয়া দাঁড়ান।

কাটোয়ার নিকটেই চাকন্দি নামক গ্রাম। এখান হইতে আসেন মহাভক্ত শ্রীনিবাস। এই দিব্যকান্তি তরুণ বৈষ্ণবের প্রাণে জাগিয়া উঠে কৃষ্ণ-প্রেমের তৃষ্ণা, চৈতন্যপার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুরের কৃপা তিনি প্রাপ্ত হন। ইহার পর ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ে ছুটিতে ছুটিতে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। সেদিন গোবিন্দজীর মন্দিরে দর্শন করিতে গিয়া শ্রীজীবের চরণে তিনি পতিত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে শ্রীজীবের দৃষ্টিতে এই তরুণ সাধকের পরম সম্ভাবনাটি ধরা পড়িয়া গেল।

গোস্বামী গোপাল ভট্টকে বলিয়া এই নবাগত সাধককে তিনি দীক্ষা দেওয়াইলেন, নিজে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন ভক্তিশাস্ত্র।

ইহার কিছু পরেই আগমন হয় নরোত্তমের। উত্তরবঙ্গের গরাণহাটি পরগণার প্রতাপশালী জমিদার কৃষ্ণানন্দের তিনি একমাত্র পুত্র।

গৃহত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের বেশে নরোত্তম সেদিন ব্রজে আসিয়া উপস্থিত। আপন ত্যাগ তিতিক্ষা ও নিষ্ঠার বলে লোকনাথ গোস্বামীর তিনি পরম প্রিয় হইয়া উঠেন, তাঁহার কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার অধ্যাপনার ভারও শ্রীজীব সোৎসাহে নিলেন।

তৃতীয় চিহ্নিত সহকারী—শ্যামানন্দ। উড়িষ্যার ধারেন্দা-বাহাদুরপুর গ্রামের দরিদ্র সদ্‌গোপ বংশে তাঁহার জন্ম। পূর্ব্বনাম 'দুঃখী কৃষ্ণদাস'। বিষয়-বিরক্ত এই কাঙাল সাধক বৃন্দাবনে চলিয়া আসেন, ভাগ্যবলে লাভ করেন রঘুনাথদাস গোস্বামীর কৃপা। দাস গোস্বামী বুঝিলেন, কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম আন্দোলনের এক চিহ্নিত নেতা। সাধনার শেষে আবার তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে জনজীবনের মাঝখানে, নব ধর্ম্মের প্রচার তাঁহাকে করিতে হইবে। এ কাজের জন্য চাই প্রস্তুতি, আর চাই তত্ত্বদর্শনের জ্ঞান। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাঁহাকে শ্রীজীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কৃপালু শ্রীজীব স্বয়ং এই মহাভক্তকে প্রদান করিলেন দীক্ষা আর পরমাশ্রয়।

জীব গোস্বামীই তখন ব্রজভূমির অনেক কিছুর নিয়ামক। তাঁহার কৃপায় শ্রীনিবাস ভূষিত হইলেন 'আচার্য্য' উপাধিতে, নরোত্তম পরিচিত হইয়া উঠিলেন 'ঠাকুর নরোত্তম'-রূপে। আর উড়িয়া সাধক কৃষ্ণদাসের তিনি নামকরণ করিলেন 'শ্যামানন্দ গোস্বামী'।

ইতিমধ্যে নবরচিত বৈষ্ণবশাস্ত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম হয় নাই। সংস্কৃত গ্রন্থকারদের পরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁহার অপূর্ব্ব বাংলা গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বৃন্দাবনে এক প্রবল আলোড়ন তুলিয়া দেয়।

জীব গোস্বামী স্থির করিলেন, বিপুল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যকে এবার হইতে বাংলার বৈষ্ণব সমাজে প্রচার না করিলে চলিবে না। ভক্তি-ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় ভিত্তি রচনা করা, পরিবর্দ্ধন ও প্রচারের মধ্য দিয়া উহাকে জন-জীবনে ছড়াইয়া দেওয়া এক মহা দায়িত্বপূর্ণ কাজ। মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে এ

কাজ রূপ ও সনাতন অনেকটা আগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রেমভক্তির পথকে তাঁহারা সুগম করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সাধক ও আচার্য্যেরাও গ্রন্থাদি কম লিখেন নাই। কিন্তু ভক্তি-শাস্ত্রের এই অমূল্য সম্পদকে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে না পৌঁছাইয়া দিলে মহাপ্রভুর ইচ্ছার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় কই ?

কিন্তু কাহাকে এই গুরুভার দেওয়া যায় ? শ্রীনিবাস মহাভক্ত—সুপণ্ডিত এবং কর্ম্মকুশল। শ্রীজীব তাঁহাকেই এই শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারের যোগ্যতম ব্যক্তিরূপে নির্ব্বাচন করিলেন।

শ্রীনিবাসের গুরু, গোপালভট্ট গোস্বামীর অনুমতি আগে হইতেই নিয়া রাখা হইল।

গোবিন্দ মন্দিরে সেদিন বিশিষ্ট ভক্তগণ ভাগবত পাঠ শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়াছেন। শ্রীজীবের ইঙ্গিতে কয়েকজন গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন, গৌড়দেশে ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার অবিলম্বে শুরু করা দরকার। একবাক্যে সকলে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিন তরুণ আচার্য্যকে এ দায়িত্ব গ্রহণে আহ্বান জানাইলেন।

তিন বন্ধুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ কি বিপদে আজ পড়িলেন। যমুনাতটে, গোবর্দ্ধনে, রাধাকুণ্ডতীরে তাঁহারা স্বেচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়ান, মনের আনন্দে লীলাস্থলগুলি দর্শন করিয়া ফিরেন। ভজনসিদ্ধ গোস্বামীদের সান্নিধ্য লাভও তাঁহাদের বৃন্দাবনে থাকার এক মস্ত বড় আকর্ষণ। বড় সাধের এই বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এ প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

কিন্তু উপায় নাই। গুরুস্থানীয় প্রবীণ গোস্বামীরা সকলে মিলিয়া অনুরোধ করিতেছেন, সর্ব্বোপরি তোলা হইয়াছে মহাপ্রভুর আদিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপনের কথা। এ তাঁহারা কি করিয়া ঠেলিবেন? শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে সম্মত হইতে হইল।

শ্রীজীবের কৌশল ও কুশলতার গুণে এই দুরূহ কর্ম্মব্রতের সূচনা হয়। এ কর্ম্মের প্রভাব সারা বাংলাদেশের বুকে এক নূতন প্রাণস্পন্দন

আনিয়া দেয়, নূতনতর সাংস্কৃতিক চেতনা জাগাইয়া তোলে।

একটি কাঠের সম্পূটে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি থরে থরে সাজানো হইল তারপর গোস্বামীদের আশীর্ব্বাদ নিয়া শুভক্ষণে তিন বন্ধু গৌড়ের কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করিলেন।

দীর্ঘ পদযাত্রার পর সকলে বিষ্ণুপুর মল্লরাজের রাজ্য সীমান্তে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল।

সযত্নে ও সতর্কতার সহিত বৈষ্ণবেরা সিন্ধুকটি নিয়া চলিয়াছেন, পথে দস্যুদের শ্যেন দৃষ্টি ইহার উপর পড়িল। তবে কি সাধুরা কোন গোপন ভাণ্ডার নিয়া কোথাও চলিয়াছে? গভীর রাত্রে সেদিন বনমধ্যে তাহারা বৈষ্ণবদলের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, শাস্ত্রগ্রন্থে পূর্ণ সম্পূটটি লুট করিয়া নিয়া যায়।

এ দস্যুরা প্রকৃতপক্ষে মল্লরাজ বীর হাম্বীরেরই অনুচরবর্গ। লুণ্ঠিত সিন্ধুকটি খুলিয়া তাহারা হতাশ হয়। ধন রত্ন কিছুই নাই, আছে শুধু গাদা গাদা শাস্ত্রগ্রন্থ।

এদিকে এই অমূল্য গ্রন্থাদির শোকে শ্রীনিবাসের আহার-নিদ্রা প্রায় ত্যাগ হইয়াছে। তাড়াতাড়ি এই দুঃসংবাদ বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীকে জানানো হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধুদের মধ্যে নামিয়া আসিল এক গভীর শোকের ছায়া।

কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীনিবাসের চেষ্টায় এই গ্রন্থগুলিকে উদ্ধার করা হয়। বিষ্ণুপুর-রাজ একদিন শ্রীনিবাসের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতেছিলেন। শ্রীনিবাসের মধুর ভাষণ ও ব্যাখ্যায় সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যান, রাজাও হন ভক্তিবিহ্বল। এবার আচার্য্যকে ডাকিয়া গ্রন্থ লুণ্ঠনের ইতিহাস তিনি খুলিয়া বলেন, অপহৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ফিরাইয়া দেওয়া হয়। মল্লরাজ শ্রীনিবাসকে গুরুরূপেও বরণ করিয়া নেন এবং গোড়ার দিকে তাঁহারই সহায়তায় নূতন করিয়া মহাপ্রভুর প্রেম-ভক্তির প্রচার এখানে শুরু হয়।

বৃন্দাবনে এই শুভ সংবাদ দেওয়া হইল। এবার জীব গোস্বামীর আনন্দের অবধি নাই। সবাইকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন, "ছাখো,

গ্যাখো। রাধা-দামোদরজী ও মহাপ্রভুর কৃপায় সেদিনকার এই গ্রন্থ-লুণ্ঠনের মধ্য দিয়েই আজ নেমে এসেছে রাজ-সহায়তা। শ্রীভগবানের কাজ এবার ত্বরান্বিত হতে যাচ্ছে।"

ইতিমধ্যে নরোত্তম ঠাকুর উত্তরবঙ্গে গিয়া পৌছেন, ভক্তির বন্যা সেখানে বহাইয়া দেন। তাঁহার কীর্ত্তনের তরঙ্গে সেদিন সারা বাংলাদেশ উদ্বেল হইয়া উঠে। আর শ্যামানন্দ গোস্বামী অবতীর্ণ হন উড়িষ্যার কর্ম্ম-ক্ষেত্রে। লক্ষ লক্ষ লোক এই মহাবৈষ্ণবের আশ্রয় পাইয়া ধন্য হয়।

পূর্ব্বাঞ্চলের এই তিনটি আচার্য্য ছিলেন শ্রীজীবের ভক্তিসাম্রাজ্যের প্রধান প্রতিনিধি। সমস্ত কিছু কর্ম্ম উদ্‌যাপনের আগে তাঁহারা গ্রহণ করিতেন শ্রীজীবের নির্দ্দেশ, তাঁহার অনুমোদন ছাড়া কোন বৃহৎ কাজই এ সময়ে সম্পন্ন হইতে পারিত না।

নূতন গ্রন্থ, নূতন কীর্ত্তন-পদ যখন যাহা কিছু রচিত হইত, তখনই তাহা প্রেরিত হইত বৃন্দাবনে। শ্রীজীবের প্রীতি সম্পাদন ও সমর্থনের পর শুরু হইত তাহার প্রচার। আর এই ত্রয়ী প্রতিনিধির পশ্চাতে, তাঁহাদের প্রেরণার উৎসরূপে, সদা বিরাজিত থাকিতেন জীবগোস্বামী। সুদূর বঙ্গ ও উড়িষ্যার সহিত স্বীয় আত্মিক যোগসূত্রটিকে বজায় রাখিয়া জীব গোস্বামী এমনি করিয়া মহাপ্রভুর কর্ম্মধারাকে দীর্ঘদিন উজ্জীবিত রাখিয়াছিলেন।

ভক্তিশাস্ত্রের সঙ্কলন ও প্রচার, নব-প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তার, সব কিছুই শ্রীজীব তাঁহার নিজ জীবনে দেখিয়া যান। তাঁহারই প্রেরণায় রাজা মানসিংহের দ্বারা প্রস্তুত হয় গোবিন্দজীর বিরাট মন্দির। বৃন্দাবনের দিকে দিকে রাধাকৃষ্ণের নয়নাভিরাম দেউলমালা নির্ম্মিত হইতে থাকে, গড়িয়া উঠে এক সুসম্বদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ।

ঐশী ব্রতের উদ্‌যাপন অনেকাংশে সাধিত হইয়াছে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিমূলও হইয়া উঠিয়াছে দৃঢ়তর। এইবার জীব গোস্বামীর চিহ্নিত

জীবনের ভূমিকা সমাপ্তির মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদীর্ঘ পঁচাশী বৎসরের কর্ম্মময় মহাজীবন এবার চাহিতেছে চিরবিশ্রাম।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিত্যলীলায় প্রবেশের চিহ্নিত দিনটি ধীরে ধীরে আসিয়া পড়ে। ইষ্টধ্যানে আবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবনের এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষ তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রাণপ্রিয় রাধা-দামোদরের মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার মরদেহ সেদিন শান্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সমাহিত করা হয়।

সিদ্ধ কৃষ্ণদাস

সপ্তদশ শতকের উড়িষ্যার সনাতন কানুনগো ছিলেন এক গ্রাম্য জোতদার। জাতিতে তিনি করণ। ক্ষেত খামার ও টাকাকড়ি এই জীবনে যথেষ্টই করিয়াছেন। বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ বলিয়া দশখানা গাঁয়ের লোক তাঁহাকে সম্মান দেখায়, ভক্তিমান বৈষ্ণব বলিয়া শ্রদ্ধাও যথেষ্ট করে।

প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পা দিতে না দিতেই সনাতনের মরজীবনে হঠাৎ একদিন ছেদ পড়িয়া যায়। আত্মপরিজন ও বন্ধুবান্ধবের হৃদয়ে নামিয়া আসে শোকের কালোছায়া।

পত্নী জরী দাসী সেদিন এ নিদারুণ শোকের আঘাতে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। চিরকালই তিনি পতিগতপ্রাণা, পতির বিরহে কি করিয়া জীবন ধারণ করিবেন ভাবিয়া পান না। স্থির করিলেন, স্বামীর সাথে জ্বলন্ত চিতায় উঠিয়া এ দেহ বিসর্জ্জন দিবেন।

সনাতন কানুনগোর স্ত্রী 'সতী' হইতে যাইতেছেন, আশপাশের গ্রামগুলিতে এ সংবাদ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। চিতার পাশে সমবেত হইল কৌতূহলী এক বিরাট জনতা।

সাধ্বা পত্নী মৃত সনাতনের চিতাশয্যায় উঠিয়া বসিয়াছেন। ধূপ, গুগ্‌গুল আর চন্দনের সৌরভে চারিদিক আমোদিত। মশালের আলোক, জনতার কোলাহল আর বাদ্যভাণ্ডের উচ্চ রবে শ্মশানঘাট মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। চিতায় অগ্নিসংযোগের আর দেরী নাই।

চিতায় উপবিষ্টা জননী হাতছানি দিয়া তিন পুত্রকে কাছে ডাকিলেন। এবার শেষ বিদায় তাঁহাকে নিতে হইবে।

একের পর এক তিন পুত্রেরই মাথায় তিনি নিজ হস্তে শিরোপা বাঁধিয়া দিলেন। প্রথমে দুজনকে কহিলেন, "বাবা, সদা ধর্ম্মপথে থেকে, ঈশ্বরে নির্ভর রেখে তোমরা ঘর সংসার কর।"

তৃতীয় পুত্র, বালক বটকৃষ্ণের বেলায় কিন্তু দেখা গেল স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। কহিলেন, "বাবা, তোমার স্থান গৃহে নয়, বৃক্ষতলে। যত শীগ্‌গির পার তুমি ব্রজে চলে যাও। সেখানে গিয়ে শুরু কর কান্থাকরঙ্গধারী বৈষ্ণবের দৈন্যময় জীবন। মহাপ্রভু তোমায় কৃপা করবেন।"

অবোধ বালক বটকৃষ্ণ পিতার মৃত্যুর পর হইতেই শোকে শঙ্কায় হতভম্ব হইয়া আছে। এবার জননীর বিদায় কালের কথা কয়টি তাহার হৃদয়ে চিরতরে গাঁথা হইয়া গেল।

দাউ দাউ করিয়া চিতার আগুন এবার জ্বলিয়া উঠে। সে আগুনের লেলিহান শিখায় বটকৃষ্ণের পিতা মাতার মরদেহ পুড়িয়া ছাই হইতে থাকে। সমবেত কণ্ঠে উঠে সতীর জয়ধ্বনি, ঢাকের নিনাদে কান পাতা দায় হয়। অসহায় বালকের ক্রন্দন এ হুল্লোড়ে তলাইয়া যায়।

অগ্রজদের স্নেহ ও আদরে বটকৃষ্ণ মানুষ হইতে থাকে। পরিজনেরা নিবিড় স্নেহ দিয়া সতত তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিতেছে বটে, কিন্তু এই গৃহ-পরিবেশ বালকের ভাল লাগে না। হৃদয়ে দিনের পর দিন জাগিয়া ওঠে এক তীব্র আকুলতা। চিতায় উপবিষ্টা 'সতী'-মায়ের শেষ বাণীটি বারবার কানে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরে—ব্রজধামে তাহাকে যাইতে হইবে, নিতে হইবে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের জীবন।

জনক জননীর মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। বটকৃষ্ণ এখন ষোল বৎসরের কিশোর। ওড়িয়া ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে সে পড়াশুনা করে। কিন্তু কি জানি কেন, এই গৃহ, আত্মপরিজনের এই সান্নিধ্য আর তাহার ভাল লাগিতেছে না।

পূর্ব্ব জন্মের ত্যাগ-বৈরাগ্যের সাত্ত্বিক সংস্কার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে, বিষয়বিরক্তি পৌঁছে চরমে। তারপর আপন মনের সঙ্কল্প নিয়া বটকৃষ্ণ

একদিন গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করে। পদব্রজে ধাবিত হয় বহু আকাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবনের পথে।

মুক্তির জন্য প্রাণ তাহার আজ অধীর। ব্রজমণ্ডলের অমৃতময় আকাশ বাতাস আর পরম পবিত্র ভূমি বারবার জানাইতেছে আহ্বান। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চরণস্পৃষ্ট, বহুবাঞ্ছিত ব্রজের রজে এই দেহখানি লুটাইয়া না দেওয়া অবধি তাহার আর স্বস্তি নাই।

বৃন্দাবনে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে মহৎ আশ্রয়ও অচিরে মিলিয়া যায়। ব্রহ্মকুণ্ডবাসী বৈষ্ণবচরণদাস বাবাজীর চরণে সে শরণ নেয়, ভজন শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইয়া যায়।

বাবাজী এ কিশোর সাধকের নামকরণ করিলেন, কৃষ্ণদাস।

কয়েক বৎসর পরে বাবাজী মহারাজ তনুত্যাগ করিলেন। গুরুর তিরোধানের পর কৃষ্ণদাসের তীব্র ইচ্ছা জাগিল, জয়পুরে স্থানান্তরিত গোবিন্দজীর শ্রীবিগ্রহ একবার দেখিয়া আসিবেন।

আকুল প্রাণে ভক্তপ্রবর জয়পুর শহরে ছুটিয়া আসিলেন। এই পরম মনোহর বিগ্রহ যেন তাঁহার কাছে একেবারে জীবন্ত। দর্শন করিয়া আশ আর মিটে না, নয়নে ঝরিতে থাকে প্রেমাশ্রুর ধারা। দিনের পর দিন প্রভুর অঙ্গনেই তিনি পড়িয়া থাকেন।

কৃষ্ণদাস কেবলি সেবালুব্ধ হইয়া উঠিতেছেন, হৃদয় কিছুতেই শান্ত হয় না। বার বার ভাবেন,'আহা! প্রভুর কৃপায় যদি তাঁহার শ্রীবিগ্রহের অষ্টকালীন সেবার ভার পান, তবে এ জীবন ধন্য হয়।'

এ বিগ্রহ জয়পুরের মহারাজার স্থাপিত, তাঁহার অনুমতি ছাড়া সেবার এ অধিকার কৃষ্ণদাসকে কে দিবে? তাছাড়া, তিনি যে এক নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব। রাজা তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাতই বা করিবেন কেন? কৃষ্ণদাস দুশ্চিন্তায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন।

প্রার্থিত অনুমতি কিন্তু হঠাৎ একদিন মিলিয়া গেল। মহারাজা সেদিন প্রভুজীর দর্শনের জন্য মন্দিরে আসিয়াছেন। দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি,

কৃষ্ণদাসের প্রতি তাঁহার চোখ পড়িল। শ্রীবিগ্রহের দিকে তরুণ বৈষ্ণব একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছেন, আর ভাবাবেশে দেহে উদ্‌গত হইতেছে সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। এই বিগ্রহ সেবার জন্য কৃষ্ণদাসের আগ্রহ, তাঁহার দৈন্য ও আর্ত্তির কথা মহারাজা সবই শুনিলেন। কি জানি কেন, তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। শ্রীবিগ্রহের সেবার ভার তিনি এই নবাগত তরুণ বৈষ্ণবের উপর সমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণদাসের আনন্দের আর সীমা রহিল না। এখানে ক্রমান্বয়ে দশ বৎসর তিনি কাটাইয়া দেন।

সেদিন রাজ প্রাসাদের এক বিশেষ পূজার দিন। মহা সমারোহে, ষোড়শোপচারে গোবিন্দজীর ভোগ লাগানো হইয়াছে। পূজা শেষে কৃষ্ণদাস উৎসাহভরে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! এই পবিত্র প্রসাদ ভক্ষণের পর হইতেই দেখা দিল এক মহা বিপদ। সেবানিষ্ঠ পরম ভক্তের সারা দেহে মনে জাগিয়া উঠিল তীব্র কামের বেগ। কোনমতেই যে এ চাঞ্চল্য দূর হইতে চাহে না। এ কোন্ সঙ্কটে তিনি পড়িলেন? পরিত্রাণেরই বা উপায় কি?

কৃষ্ণদাস তখন তরুণ যুবা, বয়স তাঁহার প্রায় ৩০ বৎসর। নিজের দিক হইতে দেখিতে গেলে, কোন অনাচারই তো তিনি করেন নাই, একনিষ্ঠ ভজন সাধন ও বিগ্রহ সেবা নিয়াই পড়িয়া আছেন। তবে কেন তাঁহার সাধন পথে এই বিঘ্ন?

কোন্ মহাত্মার কাছেই বা এ সমস্যার কথা জানাইবেন, সাহায্য চাহিবেন? এখানে এমন কোন উচ্চস্তরের সাধক নাই যিনি তাঁহার সমস্যা সমাধানের সূত্র বলিয়া দিতে পারেন!

অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণদাসকে জয়পুর ত্যাগ করিতে হইল, আসিয়া উপস্থিত হইলেন ব্রজমণ্ডলের কাম্যবনে। সিদ্ধ মহাত্মা জয়কৃষ্ণ দাসের খ্যাতি তাঁহার আগে হইতেই জানা ছিল, এবার সোজা তাঁহার ভজন কুটিরে পৌঁছিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন, নিলেন একান্ত শরণ।

আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা সিদ্ধ বাবাজীর কাছে নিবেদন করা হইল।

তারপর কৃষ্ণদাস কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভু, বৈষ্ণবচরণদাস বাবাজীর কাছ থেকে যে শিক্ষা, যে সাধন পেয়েছিলাম, একাগ্রচিত্তে তাই নিয়েই আমি পড়ে আছি। জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় বা অনাচার করিনি। তবে কেন গোবিন্দজী আমায় এমন শাস্তি দিচ্ছেন?"

জয়কৃষ্ণদাস উত্তরে কহিলেন, "আচ্ছা বাবা, একটা গাছকে তাজা অবস্থায় কেটে, জলে কিছুদিন ভিজিয়ে রেখে তারপর যদি কেউ তাতে আগুন দেয়, তখনি কি তা জ্বলে উঠবে? শুষ্ক না হওয়া অবধি তো তাতে আগুন ধরবে না? জীব জন্ম জন্ম ধরে সংসার সাগরে তলিয়ে আছে। বিষয়-মোহ ত্যাগ করিয়ে আগে তাকে শুকনো করে নিতে হবে, তবে তো ভক্তির আগুন তাতে জ্বলে উঠবে। জানো তো বাবা, বৈষ্ণব ভজন যিনি জীবকে শিখিয়ে গেলেন, সেই মহাপ্রভুও স্বয়ং কি রকম সাধন-কঠোরতা দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ছিল,—তিনবার শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন। আর তাঁর মহাভক্ত রঘুনাথদাস?—আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন।"

"কিন্তু প্রভু, আমার দুর্দ্দশা যে হলো মহাপ্রসাদ থেকে—শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের প্রসাদ গ্রহণ করার পরই যে এ দুর্দ্দৈবের শুরু। অথচ চিরদিন জেনে আসছি—মহাপ্রসাদ চিন্ময় বস্তু। তবে কেন এই ব্যতিক্রম?"

"বাবা, এর উত্তর তো মহাপ্রভুর নিজের কথাতেই রয়েছে—'বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।' মহাপ্রসাদ চিন্ময় হয় প্রভুর নিজের জিহ্বায়, জ্ঞানহীন সাধকের জিহ্বায় তার স্বরূপ ধরা দেবে কেন?"

"বুঝতে পারলুম না প্রভু, কৃপা করে আরো একটু বিশদভাবে বলুন।"

"ছাখো, ঠাকুর চিন্ময় বিগ্রহ। তাঁর কাছে তো চিন্ময় ছাড়া কোন কিছু নেই। তাছাড়া, তিনি যে মহা সমর্থ, বৈশ্বানরের মত সব কিছুই যে করতে পারেন আত্মসাৎ। বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় আমাদের মত অজ্ঞানদের ক্ষেত্রে। বাবা, নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করতেই হবে, তা ঠিক। কিন্তু সদাই নেবে তার কাণকামাত্র, তুলসী মঞ্জরী দিয়ে স্পর্শ করে। জৈব দেহের খোরাক হিসেবে নিলে তার ফল যে ভুগতেই হবে।"

"তা হলে, প্রভু আমার ওপর এবার কি আদেশ হয় ?"

"ভয় নেই বাবা। ভক্ত যে প্রভুর নিজ জন। এ দেহ-মনের চাঞ্চল্য তিনি দিয়েছেন, আবার তাতে নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি এনে দেবেন তিনিই। তুমি এখানকার ঐ দোমন-বনে বসে কঠোর ভজনে লেগে যাও। অচিরে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এবার হইতে এই অরণ্যে বসিয়া চলিতে থাকে কৃষ্ণদাসের বিস্ময়কর তপশ্চর্য্যা। দিন রাতের অধিকাংশ সময় রাধাকৃষ্ণের ভজন ও লীলা-ধ্যানে কাটিয়া যায়। দুই চারদিন পর পর নন্দগ্রামে গিয়া গৃহস্থ বাড়ী হইতে কিছু আটা চাহিয়া আনেন। কখনো তাহা জলে গুলিয়া গলাধঃ-করণ করেন, কখনো বা আগুনের উপর রাখিয়া আঙা করিয়া খান। এই খাদ্যের সঙ্গে তরকারী হিসাবে থাকে কয়েকটি নিমের পাতা।

এমন কৃচ্ছ্রসাধন ও অর্দ্ধাশনে দেহ কত দিন ঠিক থাকিবে ? কৃষ্ণদাস ক্রমে বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। কিছুদিনের মধ্যে দৃষ্টিশক্তিও আর তেমন রহিল না। ফলে ভিক্ষায় বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

ভজন কুটিরের নিকটেই রহিয়াছে একটি কুণ্ড। কোনমতে হাতড়াইয়া গিয়া কঠোরতপা সাধক এক ফাঁকে সেখানে জল পান করিয়া আসেন। কিছুদিন পরে দেহ এত ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, ঐ কুণ্ডের ধারে গিয়া জল পান করার সামর্থ্যও তিনি হারাইয়া ফেলেন।

এই জীর্ণ শীর্ণ মৃতকল্প দেহ নিয়াও কিন্তু কৃষ্ণদাস তাঁহার নিয়মিত ভজন চালাইয়া যাইতেছেন। নয়নের জ্যোতি ঠাকুর কাড়িয়া নিয়াছেন বটে, কিন্তু এত দুঃখ দহনের পরেও অন্তরের আলোক-দীপ তো জ্বালাইয়া দিতেছেন না! এতকাল বড় আশায় তিনি বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছেন। তিনি যে ভক্ত, তিনি যে ঠাকুরের নিজ জন! যত কাঙাল যত পতিতই হোন না কেন, কৃপাময়ের কৃপা যে তাঁহার উপর বর্ষিত হইবেই।

কৃষ্ণদাসের সেদিনকার এই কৃচ্ছ্রব্রত, আকুল ক্রন্দন ও ভজন সাধন ব্যর্থ হয় নাই। ব্রজমণ্ডলেশ্বরী রাধারাণীর হৃদয় অবশেষে বিগলিত হয়,

কৃপাময়ীর কৃপার ধারা ঝরিয়া পড়ে এই মহাভক্তের শিরে।

ভাবতন্ময় সাধক সেদিন ভজনে বসিয়া আছেন। সহসা তাঁহার ক্ষুদ্র পর্ণ কুটিরে বহিয়া যায় স্বর্গীয় আনন্দের হিল্লোল।

রুম্‌ঝুম্‌ শব্দে নূপুর বাজাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এক অনুপমা, দিব্য-দর্শনা নারীমূর্ত্তি। কোমল কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করেন, "এ বাবাজি, লে, ইয়ে পরসাদ পা লে। মেরা মাঈজী তেরা দুখ্‌ দেখ্‌কে হামারা হাথ্‌সে ইয়ে ভেজ দিয়া।" অর্থাৎ বাবাজী, এ প্রসাদ তুমি গ্রহণ কর। তোমার দুঃখ দেখে আমার মাঈজী এ সব পাঠিয়ে দিয়েছেন, এখনি তুমি খেয়ে নাও।

এক অপার্থিব আনন্দের তরঙ্গে কৃষ্ণদাসের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। এ অনুরোধ তখনি তিনি পালন করিলেন। প্রসাদের পাত্রটি হাতে নিয়া তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলেন, তারপর ব্রজের রজে ঘষিয়া মাজিয়া সন্তর্পণে উহা এক পাশে রাখিয়া দিলেন।

অলৌকিক নারীমূর্ত্তি তাঁহার আরো কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। অন্তরঙ্গ সুরে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা বাবাজী, দিনরাত তো এখানে ভজন করে চলেছো, কিন্তু ভজন-যন্ত্র এই দেহটাকেও তো জীইয়ে রাখতে হবে। তুমি গাঁয়ে ভিক্ষা মাগতে যাওনা কেন, বলতো?"

"মা, চোখে যে কিছুইদেখতে পাইনে। ভিক্ষায়বেরুবো কি করে?"

"বেশ তো। এবার থেকে চোখে দেখতে পেলে তবে ভিক্ষায় যাবে তো? ঠিক করে বলো।"

"নিশ্চয় যাবো।"

"তবে শোন বাবা, মাঈজী এক অদ্ভুত নেত্রাঞ্জন দিয়েছেন তোমার জন্য। এখনি আমি তা লাগিয়ে দিচ্ছি। ঘণ্টা খানেক তুমি চোখ দুটো বুজে থাকো, তারপর ফিরে পাবে তোমার দৃষ্টিশক্তি।"

যে কথা সেই কাজ। দিব্যদর্শনা নারী তখনি এক অঞ্জন বাবাজীর নয়নে লেপিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার শোনা গেল তাঁহার নূপুরের গুঞ্জন। কাছে

আসিয়া কহিলেন, "বাবাজী, বাবাজী! একবার চোখ মেলে তাকাও। কি দেখবে ছ্যাখো।"

এ কি অলৌকিক রহস্য! নয়ন উন্মীলন করিয়াই কৃষ্ণদাস দেখিলেন, পূর্ব্বের দৃষ্টিশক্তি তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন, চারিদিকের সকল বস্তুই দেখিতেছেন পূর্ব্ববৎ। কিন্তু যে স্নেহময়ী দেবীর মধুর বচনে তিনি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন, দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়াছেন, তিনি কই? কোথায় তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন?

সারা কুটিরটি এ সময়ে এক দিব্য সৌরভে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কোথায় এই অপূর্ব্ব সৌরভের উৎস? কোথায় সে দেবী? কৃষ্ণদাসের অন্তর আর্ত্তি ও ক্রন্দনে ভরিয়া উঠে। ভাগ্যের একি নিষ্ঠুর পরিহাস। পরম বস্তু হাতের কাছে আসিয়াও কোথায় অপসৃত হইল?

অনশনে অনিদ্রায় আরো তিনদিন কাটিয়া গেল, এই অলৌকিক নারীমূর্ত্তির রহস্য উদ্ঘাটন না করিয়া তিনি ছাড়িবেন না।

তৃতীয় দিনের গভীর রাত্রি। বাবাজীর নয়ন সমক্ষে হঠাৎ উন্মোচিত হইল এক অত্যুজ্জ্বল আলোকের বর্ত্ম, আর ইহার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন এক দেবী। তাঁহার সহাস্য আনন হইতে আনন্দ ও মাধুর্য্যের রসধারা উৎসারিত হইতেছে।

প্রসন্নমধুর কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "বাবা কৃষ্ণদাস, আর কেন মনে ক্ষোভ রাখছো—তোমার কাছে যে আমি আপনা হতেই ছুটে এসেছি। এবার হতে যে আমি তোমার, তুমি আমার। আমার অভিন্নহৃদয়া সখী ললিতা তার করস্পর্শ দিয়ে তোমায় চক্ষুদান করেছে। সেই সঙ্গে আমার শক্তিও কি তুমি লাভ করোনি? বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখন গোবর্দ্ধনে চলে যাও। সেখানে যে সব বৈষ্ণব আমার ভজন করে যাচ্ছেন, প্রেমসাধনার সহজ পথটি তাঁদের কাছে তুমি উন্মুক্ত করে দাও। এবার হতে নিরন্তর আমার মাধুর্য্যরসে তুমি ডুবে থাকো।"

প্রিয়াজী, শ্রীরাধিকা এই কথা কয়টি বলিয়াই অন্তর্দ্ধান হইলেন। সিদ্ধ কৃষ্ণদাসের হৃদয়ে উত্তাল হইয়া উঠিল সর্ব্বপরিপ্লাবী প্রেম সমুদ্র।

অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় টলিতে টলিতে তিনি গোবর্দ্ধনের চাকলেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনের চারিদিকে এসময়ে বহু ভজনপরায়ণ ও সুপণ্ডিত বৈষ্ণবেরা বসবাস করেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইঁহাদের সকলেরই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। রাগ-মার্গীয় ভক্তিসাধনার বহুতর শাস্ত্রগ্রন্থ ইতিমধ্যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে,এখানে এ গ্রন্থাদি নিয়া বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে সর্ব্বদা আলোচনা হয়, নানা বিচার বিতর্ক চলে।

কৃষ্ণদাস বাবাজীর মনে এক এক দিন বড় তীব্র খেদ জাগিয়া উঠে! তাইতো! সংস্কৃত ভাষা না পড়িয়া কি ভুলই করিয়াছেন। তাই আজ বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থগুলিই রহিয়াছে তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে। এগুলি পাঠ করিতে পারিলে বৈষ্ণবশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম তিনি কত সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেন! অবশেষে একদিন স্থির করিলেন, নিয়মিত ভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করিবেন। প্রাচীন শাস্ত্রের গহন অরণ্য তাঁহাকে ঘুরিয়া আসিতেই হইবে। এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের কাছে পাঠ নেওয়াও শুরু করিলেন।

কিন্তু অচিরে দেখা দিল এক জটিল সমস্যা! ব্যাকরণ অধ্যায়ন করিতে গেলে নিত্যকার ভজনে বিঘ্ন দেখা দেয়। আবার সাধন ভজনে জোর দিলে পাঠকার্য্য হইতে থাকে ব্যাহত।

বাবাজী বড় দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। এক একদিন মনের উদ্বেগ তাঁহার চরমে উঠে। ভাবেন যমুনার জলে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া সকল জ্বালার অবসান ঘটাইবেন।

সেদিন গভীর রাত্রে, ভজন শেষে বাবাজী কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন অমনি সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন ললিতাজী।

স্মিতহাস্যে তিনি কহিলেন, কৃষ্ণদাস, কেন শুধু শুধু তোমার অন্তরে এ খেদ, এ জ্বালা পোষণ করছো বলতো। শাস্ত্রের তত্ত্ব অনন্ত, আর এই তত্ত্ব শুধু উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সিদ্ধ সাধকেরই অধ্যাত্মসত্তায়। এজন্য তোমার আবার যমুনায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার কথা মনে আসে কেন?

আমার আশীর্ব্বাদ রইলো,আজ থেকে তোমার ভেতরে শাস্ত্রতত্ত্ব আপনা থেকেই স্ফুরিত হবে। আর শোন, তোমা দ্বারা বহু লোকের উপকার হবে। বিশেষ করে তোমার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব সাধকদের কাছে নিগূঢ় ভজনমুদ্রা প্রকাশিত হবে।”

দেবীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধ বাবাজীর অন্তরে জাগিয়া উঠিল এক পূর্ণ প্রশান্তি,অন্তস্তল হইতে উদ্‌গত হইল নূতনতর দিব্য আনন্দের স্রোতধারা।

গোবর্দ্ধনের অরণ্যে এক ঝুপড়ি বাঁধিয়া সাধক কৃষ্ণদাস সে সময়ে আপন মনে ভজনানন্দে মাতিয়া আছেন। হঠাৎ সেখানে এক দাক্ষিণ দেশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব পণ্ডিতদের পরাজিত করার জন্য তিনি তাল ঠুকিয়া বেড়াইতেছিলেন। এ সময়ে সকলে তাঁহাকে বলিয়া দিল, বৈষ্ণব শাস্ত্রের সত্যকার দিক্‌পালেরা সবাই রহিয়াছেন রাধাকুণ্ডে ও গোবর্দ্ধনে। সেখানে না গেলে প্রকৃত শক্তিমান প্রতিপক্ষের সন্ধান তিনি পাইবেন না।

খোঁজ খবর নিয়া এই দক্ষিণী পণ্ডিত সেদিন গোবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত। সিদ্ধ কৃষ্ণদাসকে জানাইলেন তর্ক-যুদ্ধের আহ্বান।

কৃষ্ণদাসের বিরক্তির সীমা রহিল না। নির্জ্জন বনে বসিয়া পরম আনন্দে ভজন করিতেছেন, এখানে আবার এ কি উপদ্রব!

নিজের ব্যস্ততার কথা বলিয়া পণ্ডিতকে বিদায় দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। পণ্ডিত মোটেই ছাড়িবার পাত্র নন, নিজের প্রাধান্য সপ্রমাণ না করিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিবেন না।

কৃষ্ণদাসকে কহিলেন, “বৃন্দাবনের পণ্ডিতদের বহু প্রশংসাবাদ শুনে তাঁদের সঙ্গে আমি শাস্ত্রালাপ করতে এসেছিলাম। দেখলাম, শ্রুতির বিচার বিশ্লেষণ এখানে খুব করা হয়ে থাকে, কিন্তু তাঁদের ভেতর এমন কেউ নেই যে শুদ্ধভাবে শ্রুতি উচ্চারণ করতে পারেন।”

সিদ্ধবাবা সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।

সত্যিই তো আপনার মত বেদজ্ঞ পণ্ডিত এ অঞ্চলে আর কই? তবে আপনার কথা শুনে আমার বড় কৌতূহল জেগেছে। যদি কৃপা করে সামবেদের তুচারটি মন্ত্র পাঠ করে শোনান, তবে বড় কৃতার্থ হই।"

পণ্ডিত তখনি সোৎসাহে বেদমন্ত্র উচ্চারণ শুরু করিলেন, সুললিত কণ্ঠের ধ্বনিতে ভজনকুটির ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

আবৃত্তি শেষ হওয়ামাত্র সিদ্ধবাবা গম্ভীরভাবে কয়েকটি জায়গায় তাঁহার মন্ত্রোচ্চারণের স্বরগত ভুল দেখাইয়া দিলেন।

পণ্ডিত বড় থতমত খাইয়া গিয়াছেন। কহিলেন, "এর চাইতে শুদ্ধতর স্বরে সামবেদ কেউ উচ্চারণ করতে পারে বলে আমি জানিনে। যদি সামর্থ্য থাকে, আপনি নিজেই উচ্চারণ করে দেখিয়ে দিন দেখি!"

কৃষ্ণদাস ভক্তিভরে হাতজোড় করিয়া কিছুক্ষণের জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। তারপর সামবেদের ঐ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া চলিলেন। যেমন অপরূপ তাঁহার ভঙ্গী তেমনি স্বরের বিশুদ্ধতা।

আগন্তুক পণ্ডিত বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন। সবিনয়ে কৃষ্ণদাসের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিয়া কহিলেন,"আমি উপলব্ধি করেছি,আপনার বিদ্যা জাগতিক নয়,এ একেবারে অলৌকিক। আপনাকে পরাস্ত করা কোন লৌকিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব বলে আমি মনে করিনে।"

অতঃপর পণ্ডিতের তর্ক ও শাস্ত্রবিচারের মোহ কাটিয়া যায়,ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিয়া তিনি স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

সিদ্ধবাবার কাছে নবীন বৈষ্ণব সাধকেরা মাঝে মাঝে অধ্যয়ন করিতে আসেন। তিনি কিন্তু সকল পাঠেরই লক্ষ্যবস্তুরূপে স্থাপন করেন রাধাকৃষ্ণের যুগলতত্ত্ব। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়া উঠে তাঁহারা ব্যাকরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাকে তিনি টানিয়া আনেন নিত্যলীলার কোঠায়। শিক্ষার্থী সাধননিষ্ঠ বৈষ্ণবদের কাছে নব নব ভজনমুদ্রা তিনি উদ্‌ঘাটিত করেন। তাঁহার পাঠ ও শিক্ষার মধ্য দিয়া

ভক্তদের অন্তরে স্ফুরিত হইতে থাকে মধুর ভজনের বহুতর নিগূঢ় তত্ত্ব।

শুধু নবীন বৈষ্ণবই নয়, সমবয়স্ক প্রবীণ বৈষ্ণব আচার্য্যেরাও সিদ্ধবাবার অভিনব শাস্ত্র ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইতেন।

রাধাকুণ্ড অঞ্চলে তখন জগদানন্দ দাস বাবাজীর প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট। এই প্রাচীন বৈষ্ণব এক একদিন রহস্য করিয়া কহিতেন, "ছাখো কৃষ্ণদাস, আমরা শাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করি প্রধানতঃ বুদ্ধির সাহায্যে, আর তুমি এসব তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর মহাপ্রভুর বরপ্রভাবে। তুমি নিত্যলীলা নিজে দর্শন কর, তাই তোমার ব্যাখ্যা ও ভাষণে তারই ছাপ বেশী করে পড়ে। সে অলৌকিক রাজ্যে আমাদের প্রবেশের অধিকার নেই। তবে একথা আমি বলবোই, ভাই, তুমি হচ্ছো বরপ্রাপ্ত—পরাপেক্ষী, আর আমরা ব্যাখ্যা করি নিজেদেরই মেধা ও বিচারশক্তি থেকে! তাই আমাদের সাথে তোমার তুলনা তো চলবে না।"

এইরূপ কৌতুক-কলহ তাঁহাদের প্রায়ই হইত।

তখনকার দিনে রাগানুগা ভজনের ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস বাবাজীর জুড়ি ব্রজমণ্ডলে খুব কমই ছিল। নবীন ও প্রবীণ সকল জিজ্ঞাসু বৈষ্ণব সাধকই তাঁহার কাছে আসিয়া জুটিতেন, রাগমার্গীয় ভজনের পদ্ধতি সোৎসাহে শিখিয়া নিতেন।

বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় লীলাগ্রন্থ আলোচনা করিয়া সিদ্ধবাবা এ সময়ে একটি বিশিষ্ট ধরণের ভজনপদ্ধতি সঙ্কলন করেন। রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা অনুধ্যানের মধ্য দিয়া সাধকেরা যাহাতে আগাইয়া যাইতে পারে, সে ব্যবস্থা ইহাতে করা হয়।

রাগানুগা ভজন শিখিতে যাহারা এ সময়ে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইত, তাহাদের জন্য এই সিদ্ধ মহাপুরুষের যত্ন ও আন্তরিকতার অবধি ছিল না। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকলের অগ্রগতি ও ভুলভ্রান্তি তিনি লক্ষ্য করিতেন, সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাইয়া ভজনার্থীরাও উপকৃত হইত।

যে সব সাধক এ সময়ে বাবাজী মহারাজের চরণতলে আশ্রয় লাভ

করেন, তাঁহাদের অনেকেই উত্তরকালে ব্রজমণ্ডলের সিদ্ধ সাধকরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। এই সাধকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—গোবর্দ্ধনের দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস, মদনমোহন ঠোরের নিত্যানন্দ দাস, ঝাড়ুমণ্ডলের বলরাম দাস, সূর্য্যকুণ্ডের মধুসূদন দাস, কালনার ভগবানদাস বাবাজী, লালাবাবু (কৃষ্ণদাস) ইত্যাদি।

ভজনরত কৃষ্ণদাস বাবাজীর সিদ্ধ দেহে প্রায়ই প্রকাশ পাইত নানা অলৌকিক সেবা-চিহ্ন। এক একদিন এ সব দর্শন করিয়া সঙ্গী ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার শ্রীহরিদাস দাস তাঁহার 'বৈষ্ণব-জীবনী' গ্রন্থে সিদ্ধবাবা কৃষ্ণদাসের একাধিক অলৌকিক সেবা-লীলার কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন:

সেদিন ভজনে উপবিষ্ট বাবাজী মহারাজ ধ্যানদৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের হোলি লীলা উপভোগ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাবে ও ভঙ্গীতে নিজেও হইয়া গিয়াছেন রাধারাণীর অনুগতা এক মঞ্জরী। হোলীর আনন্দরঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে যেমন ঢেউ তুলিয়াছে, তেমনি সারা দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে আবীর কুঙ্কুম ও চন্দন কর্পূর।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সিদ্ধ বাবাজী তাহার ভজন কুটির হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। ভক্ত বৈষ্ণব ও আচার্য্যেরা তাঁহার চরণ বন্দনার জন্য ভক্তিভরে দণ্ডায়মান। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, বাবাজী মহারাজের সারা দেহে ফাগ-উৎসবের রঙ। আর তাঁহার ডোর-কৌপীন ও বহির্ব্বাসও একেবারে সুগন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।

কৌতূহলী হইয়া সকলে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন, নানা প্রশ্ন বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি শুধু সলজ্জভাবে উত্তর দিলেন, "বাবা, ভজনে বসে এইমাত্র হোলী লীলার কথা ভাবছিলুম। এসব আর কিছু নয়, রাধারাণীর কৃপাচিহ্ন।"

প্রবীণেরা কহিলেন, এসব চিহ্ন বাবাজী মহারাজের ভজন-সিদ্ধির

প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়—মহাপুরুষের ভাবদেহের বৃত্তি ও লক্ষণ বাহ্যদেহেও স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আর একদিনের কথা। ভজনরত সিদ্ধবাবার সূক্ষ্ম সত্তায় অপ্রাকৃত ব্রজের পরম রমণীয় দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। তিনি ধ্যানানন্দে দেখিতেছেন, রাধারাণী ও শ্রীগোবিন্দ পরমানন্দে মানস-গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতেছেন। সখী ও মঞ্জরীর দল মনোহর পরিচ্ছদ ও আভরণ ইত্যাদি হাতে করিয়া তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। তদ্‌গত ভাবনার মধ্য দিয়া সিদ্ধবাবাও এসময়ে বনিয়া গিয়াছেন অন্যতম 'লীলা-সহচরী'। সুগন্ধি আতরের শিশিটি হাতে করিয়া তিনি অপেক্ষা করিতেছেন— জলকেলির শেষে শ্রীরাধা কৃষ্ণ ঘাটে উঠিলে এই আতর তাঁহাদের অঙ্গে ছিটাইয়া দিবেন। কিন্তু এই আনন্দঘন যুগলমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সিদ্ধ কৃষ্ণদাসের দেহে দেখা দিল সাত্ত্বিক প্রেমবিকার—স্তম্ভন। দেহ তখন একেবারে অসাড়। হস্তস্থিত আতরের শিশিটি হঠাৎ কখন এ সময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এত বেলা হইয়া গিয়াছে, অথচ বাবাজী ভজন কুটির হইতে বাহির হইতেছেন না। সেবক ভক্তেরা ব্যস্ত হইয়া স্নানের জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিলেন। দুয়ার খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করামাত্র সকলেরই নাকে আসিল আতরের তীব্র গন্ধ।

কারণ জিজ্ঞাসা করায় বাবাজী মহারাজ সখেদে উত্তর দিলেন, "কি করবো ভাই, বল ? আমি যে মহা অপরাধী, সেবার যোগ্যতা কিছুমাত্র নেই। শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্নানলীলায় রত ছিলেন, আমি অপেক্ষা করছিলুম আতরের শিশি হাতে নিয়ে। নিজ দোষে তা ভেঙ্গে ফেলেছি, সব আতর পড়ে গেলো চারদিকে ছড়িয়ে। সেই গন্ধই তোমরা পাচ্ছো।"

ধ্যানাবিষ্ট বাবাজীর অলৌকিক শক্তি এক একদিন গোবর্দ্ধনের ভক্ত ও সাধকমণ্ডলীতে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া বসিত।

সেদিন তিনি একাকী নিজের করোয়াটি হাতে নিয়া মানসগঙ্গায়

স্নান করিতে গিয়াছেন, হঠাৎ কখন জাগিয়া উঠিল তীব্র ধ্যানাবেশ। মনশ্চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল রাধাকৃষ্ণের জলকেলির দৃশ্য। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া জলে পড়িয়া গেলেন।

সেবক ভক্তেরা সেদিন কেহ সিদ্ধবাবার সঙ্গে আসেন নাই, কাজেই তাঁহার এ আকস্মিক জলসমাধি কাহারও চোখে পড়ে নাই। কিন্তু এত দেরী তাঁহার কখনো হয় না। সকলেই মহা চিন্তিত হইয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কই তিনি? ভক্ত ও শিষ্য-মণ্ডলীতে তুমুল আলোড়ন পড়িয়া গেল। সিদ্ধবাবাজী কোথায় আত্ম-গোপন করিলেন, তাহা এক দুর্ভেদ্য রহস্য!

পাহাড়, প্রান্তর বনাঞ্চল কোথাও খোঁজাখুঁজির বাকী রহিল না। এভাবে সাতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

সেদিন মধ্যাহ্ন সময়ে ভক্ত ও অনুরাগীর দল মানসগঙ্গার তীরে বসিয়া জল্পনা কল্পনা ও খেদোক্তি করিতেছেন। সিদ্ধবাবার অদর্শনে সকলেই বড় ম্রিয়মাণ।

হঠাৎ কিছু দূরে জলমধ্য হইতে তাঁহাকে উঠিতে দেখা গেল, যেন এইমাত্র স্নান সমাপন হইয়াছে। সকলের বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টির সম্মুখে ধীর পদক্ষেপে তিনি তীরে উঠিয়া আসিলেন। হাতে রহিয়াছে তাঁহার সেই পুরাতন করোয়াটি।

ভক্তেরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিকটে ছুটিয়া গেলেন। কহিলেন, "বাবাজী মহারাজ, আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমরা সব হয়রাণ হয়ে গিয়েছি। শুধু গোবর্দ্ধনেই নয়, আশেপাশের কোন স্থানই অনুসন্ধান করতে ছাড়িনি। কি আশ্চর্য্য! এ সাতদিন কোথায় ছিলেন?"

নির্বিবকার চিত্তে সিদ্ধ বাবাজী উত্তর দিলেন, "সে কি বাবা? আমি যে একটু আগেই ভজন কুটির থেকে বেরিয়েছি। এইমাত্র চান্ সেরে আসছি। সাতদিন আমায় দেখোনি, এ তোমরা কি বলছো?"

বাবাজী মহারাজের অন্তর্দ্ধান কাহিনী নিয়া জল্পনা-কল্পনার সীমা রহিল না। কিন্তু এ রহস্য সেদিন কেহ ভেদ করিতে পারে নাই।

ভরতপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ বড় ভক্তিপরায়ণ, বৈষ্ণব সেবা ও মন্দির বিগ্রহাদি স্থাপনের সৎকাজে তাঁহার উৎসাহের অন্ত নাই। একদিন সিদ্ধবাবার ভজনকুটিরে আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "বাবাজী মহারাজ, বৃন্দাবনের বহু সাধু মোহান্ত কৃপা করে আমার সেবা গ্রহণ করেছেন, দানব্রত উদ্‌যাপনের সুযোগ আমায় দিয়েছিলেন। আমার বড় ইচ্ছে, আপনার সেবার জন্য কিছু অর্থ দান করি। কৃপা করে আপনি আজ আমার সেবা অঙ্গীকার করুন।"

সিদ্ধবাবা মহা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না—না বাবা, আমরা হচ্ছি কান্থাকরঙ্গধারী দীন বৈষ্ণব। আমাদের জন্য আবার অর্থ ব্যয় করা কেন? আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই, বাবা! তুমি বরং দীন দরিদ্র ব্রজবাসীদের দান কর। তাদের সেবা করলেই আমার সেবা করা হবে। আহা! এই ব্রজবাসীরাই যে হচ্ছে রাধা গোবিন্দের প্রকৃত আপন জন। যদি পার এদের জন্যই কিছু কর।"

একথা শোনার পর ভরতপুরের রাজা বৃন্দাবনধামের বহু দরিদ্র অধিবাসীকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ইহার পর আবার একদিন তিনি গোবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত। সবিনয়ে সিদ্ধবাবাকে কহিলেন, "বাবাজী মহারাজ, আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী এখানে আমার সাধ্যমত সাহায্য অনেককে দিয়েছি। কিন্তু প্রভু, এতে আমার তৃপ্তি হয়নি, মন ভরেনি। আমার প্রাণ কেবলই চাইছে, আপনি নিজের জন্য কিছু অঙ্গীকার করুন।"

"বেশ তাই হবে, মহারাজ। তোমার তো শুনেছি অনেক রাণী আছে। এদের মধ্যে সব চাইতে যে তোমার প্রিয়, তাকে একলাটি আমার কাছে আজ পাঠিয়ে দিও।"

এ প্রস্তাবের রহস্য কিছু বুঝা গেল না, কিন্তু রাজা তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীকে পাঠাইতে রাজী হইলেন।

রাণী তরুণী, পরম রূপলাবণ্যবতী। পর্দ্দানসীনভাবে চলাফেরা করাই তাঁহার অভ্যাস। সেইদিনই একটি দীর্ঘ বস্ত্রবাস দিয়া ভজন

কুটিরের চারিদিক ঘিরিয়া দেওয়া হইল। এখানেই হইবে উভয়ের সাক্ষাৎ। সিদ্ধবাবার ভজন কুটির অবধি নিয়া আসা হইল।

রাণী লছিমা একাকিনী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নূপুর কিঙ্কিনীর নিক্কনে চমকিয়া উঠিয়া বাবাজী তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। একি অপরূপ সৌন্দর্য্য এই তরুণীর! এত রূপ কি মানুষের হয়? মুহূর্ত্ত মধ্যে বাবাজীর অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিল পরম মাধুর্য্যময়ী, কৃষ্ণপ্রিয়া রাধারাণীর স্মৃতি। তাঁহারই ধ্যানে তৎক্ষণাৎ তিনি নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

বাবাজীর সারা দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে অশ্রু-স্বেদ-পুলক প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার। আর এই অদ্ভুত প্রেমোন্মত্ততা দর্শনে রাণী লছমিনী হইয়া গিয়াছেন ভাবাবিষ্ট। বাহ্যজ্ঞান তাঁহার নাই, মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি নীরব নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

প্রায় এক প্রহর কাল এ অবস্থায় চলিয়া গেল। বাবাজী অথবা রাণী কাহারো কোনই সাড়া শব্দ নাই।

পরিচারিকারা ইতিমধ্যে মহা ব্যস্ত হইয়াছে। তাহারা বস্ত্রবেষ্টনী ফাঁক করিয়া দেখিল বাবাজী ও রাণী উভয়েই চিত্রার্পিতের মত রহিয়াছেন। দিব্য ভাবাবেশে তাঁহারা ভরপুর!

অতঃপর সিদ্ধবাবা ঐ একই আসনে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন। তিন দিন নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিবিষ্ট থাকার পর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে।

রাণীর সহিত তাঁহার এ সাক্ষাৎ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি উত্তর দেন, "রাণীর কাঁকন আর নূপুরের আওয়াজ শুনেই আমার মনে জেগে ওঠে প্রিয়াজীর কথা। তারপর রাণীর অনুপম সৌন্দর্য্য আর মাধুরিমা জাগিয়ে তোলে উদ্দীপনা, ব্রজেশ্বরীর মধুর স্মৃতি-ধ্যানে ডুবে গিয়ে আমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলি।"

সিদ্ধ মহাপুরুষের সেদিনকার ভাবময় দৃষ্টিপাত রাণী লছিমার জীবনে আনিয়া দেয় এক অপূর্ব্ব রূপান্তর। তাঁহার জীবনধারা এক নূতনতর

খাতে প্রবাহিত হয়। প্রেম ভক্তি সাধনার পরম পথটি তিনি গ্রহণ করেন।

ভরতপুর-রাণীর বৈষ্ণবায় সেবানিষ্ঠা ও দান-ধ্যানের নানা কীর্ত্তির কথা এখনো ব্রজমণ্ডলে শোনা যায়।

বৈষ্ণব সেবায় তাঁহার উৎসাহ ও নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। একবার কয়েকজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাত্মার ভোজনের জন্য কিছু অর্থ দান করিতে তিনি উদ্‌গ্রীব হন। কিন্তু এই বৈষ্ণবেরা একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন, বিষয়ীর অন্ন বা অর্থ তাঁহারা কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না।

রাণী ক্ষোভে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আপনাদের চরণে আমার এই প্রার্থনা, যদি আবার জন্মগ্রহণ করি তবে রাজকুলে যেন আর না পড়ি। দীনাতিদীনা হয়ে, বৈষ্ণব সেবার অধিকারিণী হয়েই যেন পরের বার আমি জন্মলাভ করি।"

মহাত্মারা এই দৈন্যময় উক্তিতে প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা কহিলেন, "মা, তোমায় তা হলে এক কাজ করতে হবে। তুমি গাভীর গোবর থেকে ঘুঁটে প্রস্তুত কর। তা বেচে যে অর্থ পাবে, তাই দিয়ে ঠাকুরের ভোগান্নের যোগাড় করে আনো। এই প্রসাদ ভোজনই হবে আমাদের প্রীতিপদ।"

রাণী লছিমার আনন্দ আর ধরে না। যাক্‌, তবু তো এই ভাবে তাঁহার জীবনের এক বহুপ্রার্থিত সুযোগ ঘটিয়া গেল। মহাত্মাদের সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। সিদ্ধবাবার নিকট রাণীর এই ভক্তিনিষ্ঠার সংবাদ পৌছিলে তিনি পরম তুষ্ট হন, বারবার তাঁহাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানান।

ব্রজমণ্ডলের অগণিত ভক্ত, দর্শনার্থী শিষ্যদের মধ্যে সিদ্ধবাবা তাঁহার কৃপা ছড়াইয়া যান। যে প্রেমভক্তির বীজ চারিদিকে তিনি রোপন করেন ধীরে ধীরে তাহা অঙ্কুরিত ও পুষ্পিত হইতে থাকে।

মহাপুরুষের সুদীর্ঘ ভজনময় জীবনলীলাটি ইহার পর আসিয়া পড়ে

শেষ অঙ্কে। যুগল ভজনের প্রেমমধুর পদ গাহিতে গাহিতে প্রবীণ ও নবীন সকল বৈষ্ণবদের পরম প্রিয় এই মহাসাধক প্রবিষ্ট হন রাধা-গোবিন্দের নিত্যলালায়। ব্রজমণ্ডলের পাদপীঠ হইতে রাগানুগা ভজনের একটি নিষ্কলঙ্ক প্রদীপ সেদিন নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

রামঠাকুর

কামাক্ষার শক্তিপীঠে সেদিন অম্বুবাচীর উৎসব চলিতেছে। হাজার হাজার নরনারী বৎসরের এই সময়টিতে এখানে আসিয়া জড় হয়। সারা পাহাড়-তীর্থ স্পন্দিত হইয়া উঠে এক নূতনতর চেতনায়।

নানা স্তরের মানুষ, নানা জাতি, নানা দেশের মানুষ, এখানে ভীড় জমাইয়াছে। পুণ্যলোভী ভক্ত, ধনজনপুত্রকামী গৃহস্থ যেমন এ উৎসবে আসিয়াছে, তেমনি দর্শন দিয়াছেন শত শত সাধক—ক্রিয়াবান তান্ত্রিক, উদাসী, যোগী ও বৈদান্তিক। প্রতি বৎসরই ভারতের দিক দিগন্ত হইতে ইঁহারা উপস্থিত হন মহাশক্তি কামাক্ষা-মাঈর চরণতলে। উৎসব শেষে আবার বাহির হইয়া পড়ে নিজ নিজ পরিব্রাজনের পথে।

ভক্তেরা সবাই পবিত্র কুণ্ডে স্নান তর্পণ সমাপন করে, তারপর দলে দলে যোগ দেয় দেবীর মহাপূজায়। পূজারীদের মন্ত্রোচ্চারণ ও স্তবগানে মন্দির-গর্ভ বার বার ধ্বনিত হইয়া উঠে। মেলাক্ষেত্রের কোলাহল আর মানুষের ভীড়ে পাহাড়ের বুকে জাগিয়া উঠে অপূর্ব্ব প্রাণচঞ্চলতা। জনবিরল সর্পিল বনপথে জনতার ধারা অবিরাম বহিয়া চলে।

এই জনস্রোতে গা ভাসাইয়া বালক রামচন্দ্রও সেদিন এখানে আসিয়াছে। পথে সাথী জুটিয়া গিয়াছিল কয়েকজন। এ কয়দিন সবাই এক সঙ্গেই চলাফেরা করিয়াছে, কিন্তু আজিকার এই ভীড়ে তাহারা কে কোথায় হারাইয়া গেল, সারাদিনের চেষ্টায়ও রাম তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

নিজের কাছে পয়সা কড়ি কিছুই নাই। ঐ সঙ্গীদের সাহায্যেই কোনমতে কিছু কিছু আহার এ কয়দিন জুটিতেছিল। কিন্তু এবার একেবারে

অনুপায়। সারা দিন উপবাসে কাটিয়াছে, রাত্রেও যে কোন কিছু আহার জুটিবে সে ভরসা নাই।

অম্বুবাচীর আজ নিবৃত্তি দিবস। 'রজস্বলা' দেবীপীঠের সম্মুখে মাথা ঠেকাইয়া পুণ্যার্থী নরনারী যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে। মেলার চত্বরে এবার ধরিয়াছে ভাঙন। আশেপাশের জঙ্গলে, বৃক্ষতলে বহু সাধু সন্ন্যাসী আস্তানা গাড়িয়াছিলেন, তাঁহারাও এবার ডেরা ডাণ্ডা উঠাইতে ব্যস্ত।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া আসিল। রাম ক্ষুৎপিপাসায় বড় পীড়িত, ক্লান্ত দেহটিকে আর যেন টানিয়া বেড়ানো যায় না। তাছাড়া, ভাগ্যে আজ যখন আহার জুটিবেই না, কি আর করা? বরং বাকী রাতটা জপ করিয়াই কাটাইয়া দেওয়া যাক।

মন্দিরের চবুতরার কোণে কোণে কুমারী পূজার স্থান। রাশিরাশি ফুল, বেলপাতা ও নৈবেদ্য সেখানে একাকার হইয়া রহিয়াছে। কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া নিয়া বালক এক কোণে বসিয়া পড়িল। শুরু হইল তাহার জপ ধ্যান।

গভীর রাত্রি। অন্ধকার আর নৈঃশব্দে মিলিয়া চারিদিক একেবারে থম্ থম্ করিতেছে। হঠাৎ অদূরে শোনা গেল কাহার গুরুগম্ভীর কণ্ঠের আহ্বান—"রাম!"

জপ তখনি থামিয়া যায়।

এত রাত্রিতে, অপরিচিত কণ্ঠে কে এভাবে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে? না—এ তাহারই শুনিবার ভুল?

উৎকর্ণ হইয়া সে বসিয়া আছে। আবার শোনা গেল সেই রহস্যময় কণ্ঠের আহ্বান। এবার আরো কাছে, আরও স্পষ্ট।—"বৎস রাম! শুনছো? উঠে এসো আমার কাছে।"

ক্ষণপরেই প্রাচীরের অন্তরাল হইতে আবির্ভূত হইলেন এক বিশালকায় সন্ন্যাসী। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাঁহার সারা অঙ্গে। দীর্ঘায়ত দেহে নামিয়া আসিয়াছে জটাজাল। সুঠাম

দেহ, আজানুলম্বিত বাহু। চক্ষু দুইটি জ্বলিতেছে যেন অগ্নি গোলকের মত। ললাটে রক্তচন্দনের সুবৃহৎ ফোঁটা, আর গলায় জড়ানো রুদ্রাক্ষের মালা। ভীমকান্তি, মহাশক্তিধর এক তান্ত্রিক পুরুষ তাহার সম্মুখে।

একি! এ মূর্ত্তি তো রামের অপরিচিত নয়! কয়েক বৎসর আগে রাত্রিতে স্বপ্নযোগে ইঁহাকেই সে দেখিয়াছে। স্বপ্নেই মহাপুরুষ তাহাকে বীজমন্ত্র দিয়া গিয়াছেন, আর সে মন্ত্রও ছিল চৈতন্যময়। বারো বৎসরের বালকের পূর্ব্ব জন্মের অধ্যাত্মসংস্কার এক মুহূর্ত্তে এ মন্ত্র সেদিন জাগ্রত করিয়া দিয়াছে। এই দৈবী মন্ত্র আর ঐ মন্ত্রদাতাকে যে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই। রামের হৃদয়পটে এই মহাপুরুষের মূর্ত্তি চিরতরে সেদিন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। ইঁহারই জন্য গৃহে আর তাহার মন টিকে নাই, কাজকর্ম্ম সন্ধানের অছিলায় সে গৃহত্যাগ করিয়াছে। স্বপ্নলব্ধ এই গুরুর খোঁজেই এতদিন সে ছিল ভ্রাম্যমাণ।

বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গিয়া মহাপুরুষের চরণতলে সে পতিত হইল। আজ সে তাহার জীবনের পরমাশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে!

আঁকাবাঁকা পার্ব্বত্য পথ বাহিয়া উভয়ে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখে আসিলেন। কাছেই জঙ্গলাকীর্ণ পাকদণ্ডির পথ সর্পিল ভঙ্গীতে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। মহাপুরুষ যাইতেছেন আগে আগে, আর রাম চলিয়াছেন তাঁহার পিছু পিছু।

বর্ষণক্লান্ত আষাঢ়ের আকাশতলে উঁকি দিতেছে মেঘ-ভাঙা চাঁদ। সারা বনপথ জ্যোৎস্নায় ভরা। দূরে পাহাড়ের সানুদেশ বাহিয়া আপন মনে ছুটিয়া চলিয়াছে প্লাবন-প্রমত্ত, উদ্দাম ব্রহ্মপুত্র।

কিছুদূর গিয়াই সম্মুখে পড়ে আর এক পাহাড়ের চড়াই। একটু আগাইতেই দেখা গেল ঘন জঙ্গলে ঢাকা এক পর্ব্বত গহ্বর। রামকে অনুসরণের ইঙ্গিত করিয়া মহাপুরুষ এই গুহারই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক নিরন্ধ্র অন্ধকার! চকমকি ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালানো হইলে দেখা গেল—সম্মুখে একটি প্রশস্ত ভূগর্ভ কক্ষ।

সারা পথে মহাপুরুষ একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নাই, রামও কোন কথা বলিতে সাহসী হয় নাই, মোহাবিষ্টের মত এতক্ষণ সে শুধু তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

স্নেহভরে মহাপুরুষ কহিলেন, "বৎস তুমি শ্রান্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। বিশ্রামের পর কিছু আহার কর, সুস্থ হও।"

বড় বিস্ময়কর তাঁহার সান্নিধ্য ও স্পর্শের প্রভাব। রামের দেহে এখন শ্রান্তি ও অবসাদের চিহ্নমাত্র নাই। অপার শান্তি ও তৃপ্তিতে মন তাঁহার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আদেশ হইল, "বৎস, এবার ওঠো। গুহার শেষ প্রান্তে গিয়ে ছাখো, মৃৎপাত্রে ছুটি ফল তোলা রয়েছে। তোমার ভোজন সমাধা করে নাও।"

ক্ষীণ দীপালোকে গুহার সবটা স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্ষুধা খুবই লাগিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এত রাত্রে রামের ভোজনে তেমন উৎসাহ নাই। নীরবেই সে বসিয়া রহিল।

হঠাৎ দেখা গেল এক অলৌকিক কাণ্ড। মুহূর্ত্তমধ্যে মহাপুরুষের দক্ষিণ হস্তটি হইয়া উঠিল জ্যোতির্ম্ময়—তারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘতর হইয়া উহা গুহার প্রান্তদেশে গিয়া ঠেকিল। ফলসহ মৃৎপাত্রটি অবলীলায় তুলিয়া আনিয়া রামের সম্মুখে তিনি স্থাপন করিলেন।

বালকের তুই চোখে ফুটিয়া উঠিল অপার বিস্ময়। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া উঠিল, এক নূতন উপলব্ধি। এ অলৌকিক দৃশ্যটির ভিতর দিয়া মহাপুরুষ আজ জানাইয়া দিলেন—তাঁহার বরাভয় এমনিভাবেই স্থানকাল নির্বিবশেষে নবীন সাধক রামকে রক্ষা করিবে, আর তাঁহার সর্ব্বগামী বাহুদ্বয় এই পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে গিয়াও আশ্রিতকে করিবে রক্ষা, দান করিবে স্নেহচ্ছায়া।

বিস্মিত বালক অপাঙ্গ দৃষ্টিতে মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া ফল ছুইটি গলাধঃকরণ করিল।

আবার আদেশ হইল, "চেয়ে ছাখো, অদূরেই তোমার জন্য তৃণ শয্যা

তৈরী হয়েছে। এবার শয়ন কর। তুমি যে আজ আসবে তা জানতাম। তাই আহার ও শয্যার ব্যবস্থা করাই ছিল।"

প্রত্যূষে বালকের ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, "রাম, এবার তোমায় তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। সামনের বনপথ দিয়ে সোজা নেমে চলে যাও, ব্রহ্মপুত্র নদে ডুব দিয়ে এসো। লগ্ন সমাগত, তোমায় আমি আজ দীক্ষা দান করবো।"

দীক্ষা গ্রহণের সময় রামের কিন্তু বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যে বীজমন্ত্র স্বগৃহে থাকাকালে সে স্বপ্নযোগে পাইয়াছে, সেই মন্ত্রই এবার মহাপুরুষ আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার কর্ণে প্রদান করিলেন।

সেদিনের এই দীক্ষাই বালকের জীবনে আনিয়া দেয় অসামান্য দৈবী কৃপার ধারা, উন্মুক্ত হয় আলোকলোকের সিংহদ্বার। সাধনা ও সিদ্ধির সরণি বাহিয়া তিনি প্রাপ্ত হন ব্রাহ্মীস্থিতি, দিকে দিকে সংপূজিত হন শ্রীরামঠাকুর নামে। মহাশক্তিধর সাধক ও ব্রহ্মজ্ঞরূপে ভারতের অধ্যাত্মসমাজে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

তন্ত্র ও যোগের যুগ্মরশ্মি রামঠাকুর অবলীলায় দুইহস্তে ধারণ করিতে সমর্থ হন। শক্তি ও জ্ঞানের যে অপরূপ লীলা নিজ জীবনের মাধ্যমে এই মহাসাধক প্রকটিত করিয়া যান তাহার তুলনা বিরল।

ঠাকুরের অধ্যাত্মজীবনের মহাশিল্পী, তাঁহার ঐ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি-মান গুরুদেবের প্রকৃত পরিচয় আজো উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। তিনি নিজে কখনো তাঁহাকে প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, শিবকল্প গুরুর প্রকৃত পরিচয়টি গোপন রাখিয়া নানা সময়ে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন অনঙ্গদেব নামে। অনঙ্গদেব, অর্থাৎ অঙ্গ নাই যাঁহার—বিদেহী সত্তারূপে সর্ব্বভূতে যিনি বিরাজিত। গুরুর এই সার্ব্বজনীন ও নৈর্ব্যক্তিক পরিচয়টিকেই এই নামকরণের মধ্য দিয়া ঠাকুর প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। 'ভগবানের স্বরূপশক্তি' বলিয়াও কখনো কখনো স্বীয় গুরুর কথা শ্রদ্ধাভরে তিনি উল্লেখ করিতেন।

ফরিদপুরের এক ক্ষুদ্র গ্রাম ডিঙামাণিক। এই গ্রামেরই এক

সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ বংশে মহাসাধক রামঠাকুর আবির্ভূত হন। পিতা রাধামাধব চক্রবর্ত্তী ছিলেন একজন ক্রিয়াবান তন্ত্রসাধক। উদারতা, পরোপকার এবং ভক্তিপরায়ণতার জন্য মাতা কমলাদেবীর খ্যাতিও গ্রামে কম ছিল না।

সিদ্ধ তন্ত্রাচার্য্য মৃত্যুঞ্জয় তর্কপঞ্চাননের কাছে দীক্ষা নিয়া রাধামাধব কঠোর সাধনায় ব্রতী হন, এক বিশিষ্ট তন্ত্রসাধকরূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তিলাভের নানা কাহিনী সে সময়ে শুনা যাইত।

শক্তিসাধক রাধামাধবের অন্তিম সময়ের ঘটনাটিও কম বিস্ময়কর নয়। দুঃসাধ্য রোগে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী, জীবনের কোনই আশা নাই। এসময়ে তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইল দুর্নিবার ইচ্ছা,—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে গুরুদেবের চরণধূলি একবারটি তিনি মস্তকে ধারণ করিবেন।

তন্ত্রাচার্য্য মৃত্যুঞ্জয় তখন বহু দূরে রহিয়াছেন। অপর একটি শিষ্যের গৃহে তাঁহার যাইবার কথা। স্টীমারের টিকিটও কেনা হইয়াছে। সিঁড়ি দিয়া ডেকে উঠিতে যাইবেন, হঠাৎ অনুভব করিলেন, পিছন হইতে সজোরে কে যেন তাঁকে আকর্ষণ করিতেছে, বহু চেষ্টায়ও এই আকর্ষণ এড়ানো যাইতেছে না।

হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুরের মানসপটে ভাসিয়া উঠিল তাঁহার প্রিয় শিষ্য রাধামাধবের রোগশয্যার দৃশ্য। তখনই তিনি ডিঙামাণিক অভিমুখে রওনা হইলেন।

গুরুদেব শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মৃত্যুপথযাত্রী শিষ্য মুহূর্ত্তের জন্য নয়ন উন্মীলন করিলেন। গুরুর চরণ শিরে ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করিয়াছেন।

রাধামাধব চক্রবর্ত্তীর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর।

রামঠাকুরের মাতা কমলা দেবীর জীবনেও দেখা গিয়াছিল আদর্শ চরিত্র ও অসামান্য ধর্ম্মনিষ্ঠা। শুনা যায়, মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে নিজের

আসন্ন মৃত্যু দিবসটির কথা এই মহিয়সী মহিলা সঠিকভাবে তাঁহার আত্মজনদের নিকট বলিয়া দিয়াছিলেন।

রাধামাধব ও কমলা দেবীর তৃতীয় পুত্ররূপে ১৮৬০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী রামঠাকুর ভূমিষ্ঠ হন। মনীষী, অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঠাকুরের জন্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"১২৬৬ বঙ্গাব্দে বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে তিনি মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন—তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত এই স্মৃতিকথা জাতিস্মরতার অদ্ভুত প্রকাশরূপে গ্রহণীয়।

"তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার বৃত্তান্তও অলৌকিক। রাধামাধব চক্রবর্তী মহাশয় প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া পঞ্চবটীতে যাইয়া উপাসনা করিতেন। ঐ সনের মাঘী দশমী তিথিতে কমলা দেবী প্রসব বেদনা অনুভব করিয়া স্বামীকে পঞ্চবটীতে যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু স্বামী ধীরভাবে তাঁহাকে অভয় ও আশ্বাস দিয়া পঞ্চবটীতে চলিয়া যান, কেবল পুকুরপারের আশ্রিত এক (নীচ জাতীয়) রমণীকে ঘরে রাখিয়া গেলেন। অল্প কাল মধ্যেই প্রসব হইয়া গেল—কোন শিশু নহে, পরন্তু থলিয়ার মত একটা চর্ম্মময় বস্তু। রমণীটি তাহা বাহির করিয়া এক বকুল গাছের তলে ফেলিয়া দিয়া আসিল এবং বৃষ্টির পর শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বালিল। এ থলিয়াটিকে বেষ্টিত করিয়া শৃগালের দল মুহুর্মুহু এক সুরে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল।

"বহুক্ষণ পরে একটি শৃগাল তাহা মুখে করিয়া দলবলসহ পঞ্চবটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বেশ বেলা হইয়াছে এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধ্যানস্থ। শৃগালের চীৎকারে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন, শৃগালের দ্বারা উপস্থাপিত থলিয়াতে দুইটি শিশু অক্ষত শরীরে ক্রমান্বয়ে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে জাতকের ক্রন্দনধ্বনিই প্রকৃত জন্মকাল ও লগ্ন সূচনা করে। ঠাকুর স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, জন্মকালে কোন নরনারীর দ্বারা তাঁহার নাড়ীচ্ছেদ হয়

নাই, হইয়াছিল মাতৃরূপিনী শিবা দ্বারা। তাঁহার সিদ্ধিস্থান পঞ্চবটীতেই তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।"

বাল্য ও কৈশোরকালে তেমন কিছু অসাধারণত্ব রামঠাকুরের জীবনে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায় নাই। গ্রামের আর পাঁচটি ছেলের মতই হাসি-কান্না ও খেলাধূলার মধ্য দিয়া তিনি কাল কাটাইয়াছেন।

ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারে, ভগবদ্‌ভক্ত পিতামাতার সন্তানরূপে তাঁহার জন্ম। পারিবারিক পরিবেশ ও পিতা-মাতার ধর্ম্মভাব বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনে সঞ্চারিত হয় নিতান্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে।

যমজ সন্তানদ্বয়, রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়া মাতা কমলা দেবী প্রায়ই রামায়ণ গান শুনিতে যান। রামের অন্তস্তলে চিরতরে দাগ কাটিয়া বসে এই অপূর্ব্ব পৌরাণিক আখ্যায়িকা, আর তাহার ভক্তিসমৃদ্ধ সঙ্গীত। বালকোচিত খেলাধূলার মধ্যে এক এক দিন দেখা যায় রামের অদ্ভুত খেয়ালিপনা। সঙ্গীদের একত্র করিয়া সে মৃত্তিকা নিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি তৈরী করে, তারপর পরমানন্দে শুরু হয় এই বালখিল্যদের পূজা ও নাম কীর্ত্তন।

রামের বয়স যখন মাত্র আট বৎসর রাধামাধব চক্রবর্ত্তী সে সময়ে লোকান্তরে গমন করেন। পিতার এই শোকাবহ মৃত্যুর ঘটনাটি তাঁহার অন্তরে সেদিন এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া যায়।

তিন চার বৎসর পরের কথা। বালক রাম সে রাত্রিতে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। হঠাৎ স্বপ্নযোগে দেখা দিলেন এক বিরাট-বপু সন্ন্যাসী। বালকের কানের কাছে মুখ নিয়া বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "বৎস প্রতিদিন নিবিষ্ট মনে এই শক্তিমন্ত্র জপ করে যাও, মুক্তির পথ তোমার অচিরে উন্মুক্ত হয়ে যাবে।"

অমোঘ এই স্বপ্নশ্রুত মন্ত্রের প্রভাব! বালক রামের আন্তর্জ্জীবনে ইহা তুলিয়া দেয় প্রবল আলোড়ন। এ মন্ত্রের জপ যেমনি স্বয়ংক্রিয়

তেমনি তাহা অন্তর্লীন শক্তির উদ্বোধক। জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কাররাশি এ মন্ত্র জাগাইয়া তুলিতেছে, আর সেই সঙ্গে আপনা হইতে উদ্‌গত হইতেছে আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, বন্ধ প্রভৃতি। অবিরল ধারে কেবলি নামিয়া আসিতেছে ধ্যানস্রোত। অথচ লৌকিক জীবনে এসব বস্তুর সঙ্গে বালকের এযাবৎ কোনদিনই পরিচয় ঘটে নাই।

নিজে সদা প্রচ্ছন্ন থাকিতে চেষ্টা করিলেও বাড়ীর লোকের কাছে রামের এই নূতনতর স্বরূপটি কিছুটা ধরা পড়িয়া যায়। ক্রমে তাঁহারা কিছুটা অভ্যস্ত হইয়াও উঠেন। ভাবিয়া নেন, এ বালক দৈবী কৃপাপ্রাপ্ত —দৈবী প্রসাদে কিছুটা শক্তি সে অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সে-বার দূর সম্পর্কের এক পিসিমা রামকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে চন্দ্রনাথ দর্শন করাইয়া আনিতে হইবে। তীর্থ দর্শন এবং পুণ্যলাভের লোভ রামচন্দ্রের কম নয়, সোৎসাহে তখনি তিনি এ প্রস্তাবে রাজী হইয়া পড়িলেন।

বড় দুর্গম পথ এই তীর্থের। জঙ্গলাকীর্ণ, পিচ্ছিল পার্ব্বত্য পথ বহু কষ্টে অতিক্রম করিতে হয়। বালক ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিয়া বৃদ্ধ পিসীমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিতেছেন। খানিক বাদেই অদূরে দেখা গেল গিরিশীর্ষ, আর চন্দ্রনাথের পবিত্র মন্দির। যাক, এবার তবে আসিয়া পড়া গিয়াছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধা একটা বড় পাথরের উপর বসিয়া পড়িলেন। ক্লান্ত হইয়াছেন, কিছুটা বিশ্রাম করিবেন।

কিন্তু পূজার উপচার গোছগাছ করিতে গিয়াই তো তাঁহার চক্ষু স্থির। কি সর্ব্বনাশ! মহাদেব সদাই থাকেন বেলপাতায় তুষ্ট—আর সেই বেলপাতা আনিতেই যে ভুল হইয়া গিয়াছে! এখন উপায়? কাছাকাছি কোথাও তো বিল্ববৃক্ষ নাই। পাহাড়ে উঠিতে এতক্ষণ দুজনেরই প্রাণান্ত হইয়াছে। নীচে গিয়া বেলপাতা সংগ্রহ করা, আবার এই চড়াই-এর পথ অতিক্রম করা যে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার!

হঠাৎ বৃদ্ধার স্মরণে আসিল রামের দৈবী কৃপা প্রাপ্তির কথা। সত্যিই তো, এ ঘোর সঙ্কটে সে কি তার ঠাকুরকে বলিয়া একটা ব্যবস্থা করিতে

পারে না? নহিলে যে তাঁহার পূজাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

অনুনয়ের স্বরে কহিলেন, "বাবা রাম, তুই আমায় আজ এ বিপদে উদ্ধার কর। যে করেই হোক, দুটো বেলপাতা আমায় এনে দে। আমি জানি, তুই ইচ্ছে করলে এ কাজ এখানে বসেই করতে পারিস।"

বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠে রামের চোখে মুখে। উত্তর দেন, "পাগলের মত কি যা তা সব বকছো তুমি পিসী। দেখলে তো, পথে কোথাও একটা বেলগাছ নেই। অচেনা জায়গা—জনমানব কাছাকাছি নেই, এখানে বেলপাতা আমি কোথায় পাবো?"

"আর আমায় জ্বালাস নে বাপ! তুই ধরে বসলেই ঠাকুর তোকে সন্ধান দেবেন। বেলপাতা না নিয়ে আমি মন্দিরে ঢুকতে পারবো না, এখান থেকেই নীচে লাফিয়ে পড়ে মরবো। আমার প্রাণ বাঁচা আজ। তুই ছাড়া আমার গতি নেই।"

বৃদ্ধার নয়ন দুইটি অশ্রুতে ছলছল। রামের মন ভিজিয়া গেল। কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া থাকিবার পর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিলেন অদূরস্থিত একটি নাতিবৃহৎ শিলাখণ্ড। কহিলেন, "ছাখো পিসী, ঐ পাথরের নীচেই আছে তোমার বেলপাতা।"

পাথরটি নাড়া দিতেই দেখা গেল, বিল্ববৃক্ষের একটি ক্ষুদ্র চারা সেখানে আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। নবোদ্গত কচি পাতা-কয়টি চয়ন করিয়া বৃদ্ধার আনন্দের সীমা রহিল না। বালক ভ্রাতুষ্পুত্রকে বার বার তিনি অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইতে লাগিলেন।

রাম ষোল বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। কি জানি কেন আজকাল এই গৃহজীবন আর মোটেই তাঁহার ভাল লাগিতেছে না ধীরে ধীরে তিনি কেবলই হইয়া উঠিতেছেন অন্তর্ম্মুখীন।

স্বপ্নের মাধ্যমে অহেতুক গুরুকৃপা এ জীবনে তিনি লাভ করিয়াছেন। মুক্তির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। আবার সেই সঙ্গে তেমনি আকুতি জাগিয়াছে একটিবার তাঁহার সেই স্বপ্নে দৃষ্ট কৃপালু

গুরুর চাক্ষুষ দর্শন লাভের জন্য। স্বপ্নের ছায়াছবি কবে গ্রহণ করিবে বাস্তব রূপ? কল্পমায়া কবে কায়া ধরিয়া আবির্ভূত হইবে জীবনের দ্বারে? আজ কেবল সেই চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

কার্ত্তিকপুরের স্কুলে রামকে ইতিপূর্ব্বে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল, কিন্তু পড়াশুনা আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। ঐশী কৃপা ও জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে বালকের জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে এক পরমবোধ, তাই পাঠমন্দিরের আকর্ষণ তাঁহার কাছে বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই। অচিরেই শিক্ষাপর্ব্বের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। বাড়ীর লোকে স্বভাবতঃই রামের জন্য চিন্তিত হইয়া উঠে। পড়াশুনা তো তাঁহার হইল না, এখন সে কি করিবে? জীবিকা অর্জ্জনেরই বা কোন পথ বাছিয়া নিবে?

বাড়ীতে এ সময়ে তখন তীব্র অর্থাভাব চলিতেছে। জননীর মুখ প্রায়ই থাকে বিষণ্ণ ও গম্ভীর। এবার বাড়ীর ছেলেদের সকলেরই কিছু কিছু রোজগার করা দরকার, নহিলে সংসার যে একেবারে অচল হইয়া পড়িবে। রামও স্থির করিয়াছেন, আর ঘরে বসিয়া থাকিবেন না। তাই চাকুরীর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ঘর ছাড়িয়া তো পথে বাহির হওয়া গেল, কিন্তু কাজকর্ম্ম জোটানো যায় কই? নানা স্থানে ঘোরাঘুরির পর কিশোর রাম সেদিন নোয়াখালির ফেনী সহরে আসিয়া উপস্থিত।

স্থানীয় এক উকিলের সঙ্গে পথে হঠাৎ আলাপ পরিচয় হয়।

রাম নিবেদন করেন, "দেখুন, আমি চাকরির খোঁজে এসেছি। কিন্তু শহরের কারুর সঙ্গে পরিচয় নেই। আপনি কি দয়া করে কোথাও আমার একটা থাকবার জায়গা করে দিতে পারেন?"

"তোমরা কোন জাত?"

"আমি ব্রাহ্মণ।"

"রান্না করতে পারবে? তা হলে আমার বাসায় থাকতে পারো, যতদিন না তোমার চাকরী জোগাড় হয়।"

উপায়ান্তর নাই। রাম তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেলেন। শুরু হইল তাঁহার পাচকবৃত্তি। ব্যবহারিক জীবনের এ এক নূতন অভিজ্ঞতা।

রাত্রে রান্নাবান্নার কাজ সমাপ্ত হইয়া গেলে রাম তাঁহার নিজস্ব জপতপ সাধনক্রিয়া শুরু করিতেন। তরুণ পাচকের সাত্ত্বিক আচার ও সাধন ভজনের নিষ্ঠাকে বাড়ীর কর্ত্তা এবং আরো অনেকে কিন্তু স্বাভাবিক ঔদার্য্যের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অনেক সময় এ সব নিয়া বিদ্রূপ করিয়া রামকে তাঁহারা উত্যক্তও করিতেন।

গৃহে সেদিন কালীপূজার আয়োজন চলিতেছে। উকিল বাবু তাঁহার ছেলের কল্যাণের জন্য কি এক মানৎ করিয়াছিলেন, তাই এই পূজার অনুষ্ঠান। কিন্তু হঠাৎ শেষ সময়ে খবর পাওয়া গেল, পুরোহিতকে পাওয়া যাইবে না, তিনি অসুস্থ।

গৃহকর্ত্তা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তাইতো! এখন এই অসময়ে পূজারী ব্রাহ্মণ কোথায় পাওয়া যাইবে?

বাড়ীর একজন বলিয়া উঠিল, "এজন্য আপনি এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? বামুনঠাকুর রামচন্দ্র তো দেখছি রোজই জপ-তপ করে। তাকে দিয়েই কোন মতে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাক।"

রাম সম্মুখেই দণ্ডায়মান। উকিলবাবুও পরিহাসের সুরে কহিলেন, "কিগো ঠাকুর, এতো যখন জপ-তপ চালাচ্ছো, আমাদের কালী পূজোটা কি আর সেরে দিতে পারবে না?"

শান্ত নির্বিবাদী পাচক সবিনয়ে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, আপনি আদেশ করলে নিশ্চয়ই পারবো।"

রামকেই পূজার পুরোহিত নিযুক্ত করা হইল।

কালীপূজায় উকিলবাবু উদ্যোগ আয়োজনের কোন ত্রুটি করেন নাই। মহা সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান। প্রায় শতাধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সে রাত্রে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

রাম নিষ্ঠাভরে তাঁহার পূজা সম্পন্ন করিলেন বটে, কিন্তু কেহই যেন এই তরুণ পাচক ব্রাহ্মণকে তেমন গুরুত্ব দিতে চাহে না।

সবে মাত্র তিনি পূজা সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, কয়েকটি তরলমতি লোক বারবার বিদ্রূপ করিতে থাকে, "ও ঠাকুর, বল না একবার। পূজোর পর মা কালী তোমায় কি বললে?"

উত্যক্ত রামঠাকুরের মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে - "তা হলে বলতেই হবে? মা কালী বললেন, বাবুর যে ছেলের জন্য মানৎ-এর পূজো হলো, সে ছেলেটাকে তিনি খেয়ে ফেলবেন।"

পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর ইহাকে কি বলা যায়? কেহ পাচককে তিরস্কার করে, কেহ মারিতে যায়, কেহ বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। তাহাকে ঘিরিয়া শুরু হইল এক মহা হট্টগোল। অনেক কষ্টে রাম সেখান হইতে সরিয়া গিয়া পরিত্রাণ পাইলেন।

পরের দিন, উকিলবাবুর ছেলেটি যথারীতি স্কুলে গিয়াছে। অপরাহ্ণ কালে হঠাৎ দেখা গেল, কয়েকজন তাহাকে ধরাধরি করিয়া গৃহের দিকে আনিতেছে। ছেলেটি মারাত্মক ধরণের কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। বহু চেষ্টায়ও এই বালকটিকে বাঁচানো গেল না, সেই রাত্রেই তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া রামঠাকুরও হইলেন নিরুদ্দেশ।

উত্তরকালে ভক্তেরা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ঠাকুর, আপনি অমন করে ওখান থেকে পালালেন কেন? আপনার তো কোন দায়িত্ব ছিল না এতে?"

স্মিতহাস্যে ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, "না পালালে কি সেদিন আর আমার প্রাণ বাঁচতো? লোকে তো নিয়তির তত্ত্ব বোঝে না! আমায় তারা সেদিন মেরেই ফেলতো!"

ফেণী হইতে পলায়ন করার পর ঠাকুর বাহির হন পরিব্রাজনের পথে। শক্তি-সাধকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ কামাক্ষ্যার কথা তিনি লোক পরম্পরায় শুনিয়াছেন। এবার সেই দিকেই সারা অন্তর হইয়া উঠে উন্মুখ। এখনকার মত ট্রেনের প্রচলন তখন হয় নাই। পদব্রজে বন্ধুর, বন-জঙ্গলময়, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কয়েকটি সঙ্গীসহ পৌঁছিলেন সেই

পবিত্র শৈলতীর্থে। এখানেই মিলিল তাঁহার বহুপ্রার্থিত গুরু-সাক্ষাৎকার। সূচনা হইল অধ্যাত্মপথের নূতন অভিযাত্রার।

দীক্ষালাভের পর শুরু হয় রামঠাকুরের পরিব্রাজক জীবন। গুরুর সহিত কামাক্ষ্যাধাম তিনি ত্যাগ করেন। আরও দুইটি গুরুভ্রাতাও এসময়ে তাঁহাদের অনুগামী হন। পদব্রজে দুর্গম অরণ্য ও পার্ব্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করিয়া সকলে আগাইয়া চলেন হিমালয়ের দিকে।

ভারত-সাধনার অমৃতধারা নিরন্তর নিঃসৃত হয় এই হিমালয় হইতে। কত তপস্যাপূত নিভৃত গিরিগুহা ইহার স্তরে স্তরে বিরাজিত। লোক-লোচনের অন্তরালে এই নগাধিরাজের কোলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কত সিদ্ধপীঠ, কত সিদ্ধাশ্রম। কত শিবকল্প মহাযোগী, কত সমাধিবান তাপস দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন এই সুপ্রাচীন গিরি-অঞ্চলে।

রহস্যময় দেবভূমি হিমালয় ও তাহার শক্তিধর সাধকদের কিছুটা পরিচয় গুরু এই নবীন শিষ্যকে দিতে চাহেন। সর্ব্বজ্ঞ গুরু জানেন, রাম এক উচ্চতম সাধনা ও সিদ্ধির অধিকারী, এক চিহ্নিত মহাসাধক তিনি। জনহিতার্থে এই শিষ্যকে উত্তরজীবনে লোকালয়ে গিয়াই প্রধানতঃ বাস করিতে হইবে, ইহাও তাঁহার অজানা নাই। তাই এই পরিব্রাজনের মধ্য দিয়া লোকোত্তর সাধনক্ষেত্র হিমালয় ও এখানকার ব্রহ্মবিদ্ পুরুষদের মাহাত্ম্য নবীন সাধক রাম উপলব্ধি করুন, ইহাই তিনি চাহেন।

গুরুদেবের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। শিষ্য রামচন্দ্র এসময়ে বহুতর অজ্ঞাতপূর্ব্ব সাধনপীঠ দর্শন করেন, বহু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধকদের সান্নিধ্যও তিনি লাভ করেন। এ সব কিছুরই স্মৃতি অন্তরে তিনি শ্রদ্ধাভরে বহন করিয়া আনেন।

হিমালয় অঞ্চলের এই ভ্রমণ সেদিন তাঁহার কাছে আরও এক কারণে কল্যাণবহ হইয়াছিল। এই সব সাধনপীঠ এবং দেবপ্রতিম সাধকদের

পরিপ্রেক্ষিতে স্বীয় গুরুদেবের মাহাত্ম্যটিও তিনি নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলেন, গুরুদেবের লোকোত্তর মহিমা ও করুণাঘন রূপটি চিরতরে তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গেল।

কত নদ নদী, বন পাহাড়, উপত্যকা তাঁহারা অতিক্রম করিলেন, তারপর উপস্থিত হইলেন হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলের এক দুরধিগম্য সিদ্ধপীঠে। স্থানটির নাম যোগেশ্বর আশ্রম। হিমবন্তের তুষার রাজ্য সেখানে শুরু হয় নাই। লতাবিটপীপূর্ণ একটি অনুচ্চ পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই আশ্রমটি অবস্থিত। কোন মন্দিরাদি এখানে নাই। চারিটি প্রস্তর স্তম্ভের মধ্যস্থলে উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত রহিয়াছেন স্ফটিক নির্ম্মিত তুষারশুভ্র এক বিশাল শিবলিঙ্গ। এক অপার্থিব অপরূপ জ্যোতি এই স্ফটিকলিঙ্গের চতুর্দ্দিক হইতে অবিরাম বিচ্ছুরিত হইতেছে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া রামঠাকুর ও অপর গুরুভ্রাতাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এই যোগেশ্বর শিবলিঙ্গের আরাধিকা এক শক্তিশালিনী সাধিকা। এ সময়ে সকলে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। জটাজুটমণ্ডিতা, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী এই তাপসী নারী দিনের পর দিন ধ্যানস্থা হইয়া এই জ্যোতির্ম্ময় শিবলিঙ্গের সম্মুখে উপবিষ্টা রহিয়াছে। রামঠাকুর ও তাঁহার সতীর্থগণ এই ধ্যানমগ্না সাধিকার নাম দিয়াছিলেন গৌরী।

এই পীঠস্থলীর দিব্য পরিবেশে তাঁহারা পাঁচ দিন অবস্থান করেন। রোজই এ সময়ে তাঁহাবা সবিস্ময়ে দেখিতেন, একদল পাহাড়ী মেয়ে নীচের উপত্যকা হইতে পুষ্পাভরণে সাজিয়া এখানে আসে, নাচিয়া গাহিয়া স্থানটিকে আনন্দমুখর করিয়া তোলে। তারপর নৃত্যগীত শেষে সকলে পরমানন্দে যোগেশ্বর শিব ও তাঁহার এই রহস্যময়ী সাধিকার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দেয়। তারপর আবার নীচে তাহাদের উপত্যকায় ফিরিয়া যায়।

এই দেবস্থানে অপরূপ শান্তি ও আনন্দ বিরাজিত। উত্তরকালে রামঠাকুর অনেক সময় এ স্থানটির প্রসঙ্গে বলিতেন, "যোগেশ্বরের

মত এমন শান্তি, এমন পবিত্রতা সারা হিমালয়েও ছিল দুর্ল্লভ।”

ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা সে-বার এক সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করেন।

সূচিভেদ্য অন্ধকারে এ পথ সমাচ্ছন্ন। সারা প্রকৃতির প্রাণ-স্পন্দন যেন এখানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবজগতের কোন অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। ধীরে ধীরে এই বন্ধুর অনালোকিত পথ অতিক্রম করার পর রামঠাকুর ও তাঁহার সঙ্গীরা দেখিলেন, অন্ধকারের আবরণ ক্রমেই যেন স্বচ্ছতর হইয়া আসিতেছে। তারপরই সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল গোধূলির রক্তরাগচ্ছটা।

তবে কি সুড়ঙ্গপথের শেষে তাঁহারা অস্তগামী সূর্য্যের আলোকস্পর্শ পাইতে চলিয়াছেন?

অল্পক্ষণ পরেই কিন্তু তাঁহাদের ভুল ভাঙিল। দেখা গেল, অদূরে অপরূপ মহিমায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন এক বিশালকায় মহাপুরুষ। তপঃসিদ্ধ দেহ হইতে যে দিব্য জ্যোতি নিরন্তর নিঃসৃত হইতেছে তাহারই আলোকে এই সুড়ঙ্গপথ আলোকিত।

রাম ও তাঁহার সতীর্থদের উদ্দেশ করিয়া গুরু অস্ফুটস্বরে কহিলেন, “তোমরা এই ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মাকে ভক্তিভরে প্রণাম কর, তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চল।”

জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ সমাধিস্থ। নীরব নিস্পন্দ হইয়া তিনি বসিয়া আছেন। রাম ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আবার রওনা হইলেন।

কিছুকালের মধ্যে তাঁহারা সুড়ঙ্গের প্রান্তভাগে আসিয়া পৌঁছিলেন। মাথার উপর আবার দেখা দিল নিঃসীম আকাশের মহাবিস্তার।

অতঃপর সকলে উপস্থিত হন কৌশিকী পর্ব্বতে। এই পর্ব্বতেরই কোলে বিধৃত রহিয়াছে এক রহস্যময় আশ্রম। আপ্তকাম যোগী ঋষি ও

উচ্চকোটি সাধকদের স্পর্শপূত এই স্থান। ঊর্দ্ধে আকাশের বুকে তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে তুষারমণ্ডিত শুভ্র পর্ব্বতশ্রেণী, আর নীচে তুষার এবং শৈত্য-মুক্ত এক শিলাময় পবিত্র আশ্রম। অদূরে নীচ দিয়া খরবেগে বহিয়া চলিয়াছে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী।

এতদিন সকলে কৌপীনবস্ত হইয়া হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্রাজন করিতেছিলেন। এবার পবিত্র কৌশিকী আশ্রমের প্রবেশদ্বারে শেষ পরিধেয় ছাড়িয়া সকলকে একেবারে উলঙ্গ হইতে হইল।

রাম ও তাঁহার সঙ্গীরা এখানকার স্থানমাহাত্ম্য দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। সমগ্র আশ্রমটিতে মৃত্তিকার লেশমাত্র নাই, সমস্তই শিলাময়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কাণ্ড, এখানকার শিলাখণ্ড ভেদ করিয়া নানা শ্রেণীর অজস্র লতাগুল্ম গজাইয়া উঠিয়াছে। প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে নানাবিধ সুস্বাদু ফল, কন্দজাতীয় খাদ্যেরও অভাব এখানে নাই।

আশ্রম-গুহার প্রশস্ত কক্ষ মধ্যে একদল যোগীপুরুষ সারি সারি বসিয়া আছেন, সকলেই নিমীলিতনয়ন—নীরব, নিস্পন্দ, সমাধিস্থ। হঠাৎ দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, এ যেন প্রাচীন যুগের প্রস্তরীভূত এক সারি মানব দেহ।

উত্তরকালে রামঠাকুরের মুখে এই মহাত্মাদের বর্ণনা শুনিয়া অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, "[ইঁহাদের] হাতের ও অন্যান্য অঙ্গের চর্ম্ম পাথরের মত কর্কশ ও স্থানে স্থানে যেন ফাটিয়া গিয়াছে। কাহারও জটা খসিয়া কাঁধের উপর পড়িয়া আছে। তাঁহারা এত দীর্ঘকায় যে উপবিষ্ট অবস্থায়ও তাঁহাদের মস্তক ঠাকুর দাঁড়াইয়াও নাগাল পান নাই! পাশে পা দিয়া উঠিয়া ফুলের মালা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের মুখমণ্ডল অতি বৃহৎ—চক্ষুদ্বয় চর্ম্মে আবৃত এবং প্রায় এক বিতস্তি পরিমাণ ভিতরে কোটরগত। বৃহৎ নেত্রগোলক জ্বল জ্বল করিতেছে। মুখমণ্ডলের লৌহিত্য জীবন চিহ্নরূপে বিদ্যমান। তাঁহারা কত যুগ যুগান্তর যে একাসনে উপবিষ্ট তাহার ইয়ত্তা নাই।

রামঠাকুর

ঠাকুর বলিয়াছেন, 'কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা বাঁচিয়া নাই—করিলে তাঁহাদের দেহ নবীনাকার ধারণ করিত। তাঁহাদের শরীরই তপোবলে একেবারে চৈতন্যময় হইয়া গিয়াছে—তাঁহাদের আর দেহপাত হইবে না'।"

গুরুদেব অনঙ্গস্বামী এই সময়ে কিছুদিনের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে নির্দ্দেশ দিলেন, "তোমরা কিছুদিন এই মহাত্মাদের সান্নিধ্যে থাকো, মনপ্রাণ দিয়ে এঁদের সেবা যত্ন কর। এঁদের কৃপা লাভ করলে সর্ব্ব অভীষ্ট তোমাদের পূর্ণ হবে।"

রাম ও তাঁহার দুই গুরুভাই এই যোগীদের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। রোজই সযত্নে তাঁহারা ইহাদের সম্মুখে ফলমূল রাখিয়া যাইতেন। ভক্তপ্রাণের এ নৈবেদ্য কিন্তু একদিনও উপেক্ষিত হয় নাই। মহাত্মারা কৃপাভরে এগুলি হইতে কিছু কিছু ভোজন করিতেন।

একাদিক্রমে প্রায় পনের দিন রামঠাকুর ও তাঁহার সঙ্গীরা কৌশিকী আশ্রমের এই দেবপ্রতিম তাপসদের সান্নিধ্যে বাস করেন। অতঃপর গুরুদেব তাঁহার সাময়িক অজ্ঞাতবাস হইতে ফিরিয়া আসিলে আবার সকলে বাহির হন পরিব্রাজনে।

কৌশিকী আশ্রম ত্যাগের সময় কিন্তু এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গেল। সমাধিস্থ মহাপুরুষেরা এই এক পক্ষকাল আগন্তুক নবীন সাধকদের সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তাই বলেন নাই। নীরব, নিশ্চল হইয়া ধ্যান ও সমাধির গভীরেই তাঁহারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ডুবিয়া রহিয়াছেন। প্রতিদিন একটি বার মাত্র নয়ন উন্মীলন করিয়া নবাগত তরুণ সেবকদের প্রদত্ত নৈবেদ্য তাঁহারা গ্রহণ করিতেন, তারপরই আবার হইতেন সমাধিস্থ।

এবার বিদায় নিবার পালা। আত্মসমাহিত ধ্যানগম্ভীর যোগী-পুরুষদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল এক করুণাঘন রূপ। হস্ত উত্তোলন করিয়া অভয়মুদ্রা দ্বারা প্রণামরত তরুণদের তাঁহারা আশীষ জানাইলেন। তরুণ সাধক রাম ও তাঁহার সঙ্গীদের হৃদয়তন্ত্রী এক দিব্য আনন্দের সুরে

ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

উত্তরকালে অনুসন্ধিৎসু ভক্তদের কেহ কেহ ঠাকুরকে কৌশিকী আশ্রমের এই মহাত্মাদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করিতেন। কিন্তু এই লোকোত্তর সাধকদের প্রকৃত তথ্যাদি তাঁহার নিকট হইতে বাহির করা যায় নাই।

কৌশিকী আশ্রমের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে ঠাকুর বলেন, "মানস-সরোবর এই মহা পবিত্র আশ্রম থেকে বহুদূরে—উত্তর দিকে অবস্থিত।"

যুক্তিবাদী ভক্তের দল সহজে দমিবার পাত্র নন, প্রতিপ্রশ্ন করেন, "কিন্তু ঠাকুর, আজকালকার বিজ্ঞানের যুগে হিমালয়ের কোন অংশই তো আর অজানা নেই। সাহেবেরা জরীপ কম করেনি, তন্নতন্ন করে হিমালয়কে তারা খুঁজে দেখেছে। কিন্তু কৌশিক আশ্রমের মত কোন স্থানের সন্ধান তো পায়নি।"

ঠাকুর স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "আপনাদের এই সাহেবেরা তো শিব খোঁজে না। যে বস্তু না খোঁজা যায়, তা পাওয়া যায় কই? যোগসিদ্ধ দেহ না নিয়ে এসব আশ্রমে যাবার কোন উপায় নেই। আপনাদের মত কোন 'ভদ্রলোক' সেখানে যে যেতেই পারবেন না। মনের সব কিছু আসক্তি, দেহের সব কিছু পরিচ্ছদ, আবরণ ছেড়ে তবে সেখানে যেতে হয়। আমরা তো সবাই উলঙ্গ হয়েই সেখানে গেলাম।"

হিমালয়ের এই সকল অপ্রাকৃত সাধনভূমিতে প্রবেশের অধিকার সহজলভ্য নয়। এই অধিকার রামঠাকুর লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার মহাসমর্থ গুরুদেবেরই কৃপায়। পরিব্রাজনের ফাঁকে ফাঁকে এই মহা-অধিকারী নবীন শিষ্যের জীবনের স্তরে স্তরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল সাধনা ও সিদ্ধির নূতন নূতন অভিজ্ঞতা। অধ্যাত্মপথের নানা নিগূঢ় নির্দ্দেশ গুরু দিনের পর দিন দান করিতেছিলেন। যোগ ও তন্ত্রের উচ্চতর সাধন ক্রিয়ার মধ্য দিয়া ঠাকুর অর্জ্জন করিতেছিলেন বহুতর

সাধনৈশ্বর্য্য। বলা বাহুল্য, সবই পাইতেছিলেন গুরুকৃপায়।

শিবকল্প গুরুদেব শুধু যোগ ও তন্ত্রশক্তির শিখরদেশেই অধিষ্ঠিত নন, মহাকরুণারও তিনি এক উৎসস্বরূপ। সুযোগ্য শিষ্য রামের জন্য তাঁহার অপার স্নেহ সতত ঝরিয়া পড়িতেছে। আপন সাধনার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার এই শক্তিধর শিষ্যের মহান আধারে ঢালিয়া দিতেও তিনি সদা উৎসুক রহিয়াছেন।

দুর্গম পর্ব্বত ও গহন অরণ্যে অবিরত সকলকে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে। এক এক দিন তাঁহাদের চোখের সম্মুখে ধ্বসিয়া পড়ে মারাত্মক হিমবাহ, কখনো বা তুষার ঝটিকা ও পার্ব্বত্য ঝঞ্ঝায় প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হয়। রাম ও তাঁহার সঙ্গীরা এ সব কোন বিপদেই কিন্তু নিজেদের অসহায় মনে করেন নাই। গুরুদেবের অলৌকিক শক্তি ও তাঁহার কল্যাণহস্ত যে সর্ব্বত্র প্রসারিত, তাঁহাদের রক্ষণে যে সদা নিযুক্ত, এ বিশ্বাস তাঁহাদের দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

এই দীর্ঘ পরিব্রাজনের পথে গুরুদেবের বৈশিষ্ট্যটি রামের দৃষ্টি এড়ায় নাই। কঠোরতপা তাপস, আপ্তকাম মহাযোগী, তন্ত্রসিদ্ধ পরমহংস, অনেকের সাক্ষাৎই এ পথে মিলিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছেন, গুরু অনঙ্গদেবের প্রতি ইহাদের সকলেরই আচরণ পরম সশ্রদ্ধ। এই দীর্ঘ পরিক্রমার পথে তাঁহার গুরুদেবকে তিনি কখনো কাহারো চরণে প্রণাম নিবেদন করিতে দেখেন নাই। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এই মহাতাপস যখন যে পীঠ বা সিদ্ধাশ্রমেই গিয়াছেন, অবলীলায় তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন সেখানকার সাধকদের স্বতোৎসারিত শ্রদ্ধা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

ইতিমধ্যে রাম ইহাও উপলব্ধি করিয়াছেন, গুরু তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান, এমন কিছু যোগৈশ্বর্য্য নাই—ইচ্ছা করিলে যাহা তিনি এই শিষ্যের সাধন-আধারে ঢালিয়া দিতে না পারেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই ইচ্ছা ও কৃপার ধারা সঞ্চালিত হইতে পারে শুধু শিষ্যেরই একান্ত আত্মসমর্পণের ফলে। হিমালয়ের পরিব্রাজন ও গুরুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের

মধ্য দিয়া এই আত্মসমর্পণের তত্ত্বটির দিকেই নবীন সাধকের মন দিনের পর দিন কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

এ সময়কার একটি অত্যাশ্চর্য্য, অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা উত্তরকালে ঠাকুর তাঁহার শিষ্যদের কাছে বলিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য অঞ্চলের এক গহন অরণ্যে সে-বার তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, জনমানবের চিহ্ন কোথাও নাই। সম্মুখেই রহিয়াছে এক প্রাচীন সাধন-গুহা। এই গুহার সম্মুখে ধুনী জ্বালাইয়া এক অতিবৃদ্ধ, বিশালকায় মহাপুরুষ সমাসীন।

গুরুদেব রামকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, "এই মহাত্মা হচ্ছেন এক দেবকল্প মহাসাধক। এঁর দেহটি অতি প্রাচীন। বহু শত বৎসর ধরে এখানে বসে তিনি সাধনা করছেন। এবার তাঁর সঙ্কল্প হয়েছে, কায়া পরিবর্ত্তন করার জন্য। বহু পুণ্যবলে আজ তোমরা স্বচক্ষে এ অলৌকিক অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ পেয়েছ। মহাত্মার ধুনী থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে, নীরবে তোমরা এই অপরূপ দৃশ্য দেখে নাও।"

যোগাসনে উপবিষ্ট, নিমীলিতনেত্র মহাপুরুষের মুখে শুনা যাইতেছে অস্ফুট মন্ত্রের গুঞ্জরণ। ধুনীর অগ্নিতে মাঝে মাঝে প্রদত্ত হইতেছে আহুতি, আর থাকিয়া থাকিয়া অগ্নিশিখা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।

কিছুক্ষণ মধ্যেই কোথা হইতে হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হইল এক অতিকায় নাগরাজ। যন্ত্রচালিতবৎ মহা সর্পটি ধুনীর অগ্নি কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিল। তারপর মহাপুরুষের সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া হইল নিশ্চল, নতশির।

রাম ও তাঁহার সঙ্গীরা সবিস্ময়ে দেখিলেন, মহাপুরুষ ঐ সর্পটিকে ধরিয়া কুণ্ডলী পাকাইতেছেন। ক্ষণপরেই এটিকে তিনি ঐ প্রজ্জ্বলিত ধুনীর আগুনে নিক্ষেপ করিলেন।

নাগরাজের দাহকার্য্য চলিতেছে, এমন সময় কয়েকবার কমণ্ডলুর

মন্ত্রঃপূত বারি ছিটাইয়া দিয়া মহাপুরুষ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন।

সর্পদেহটি তখনো পুড়িয়া একেবারে নিঃশেষ হয় নাই। চিমৃটা দিয়া টানিয়া আনার পর পাওয়া গেল একতাল অর্দ্ধদগ্ধ গলিত মাংসস্তূপ। মহাপুরুষ এটি হইতে কয়েকটি পিণ্ড প্রস্তুত করিলেন।

এবার শুরু হইল তাঁহার অভিনব হোমক্রিয়া।

ধুনীর আগুন তেমনিভাবে প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। আর মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ একটি করিয়া সর্পদেহের পিণ্ড উহাতে আহুতি দিতেছেন। সর্ব্বশেষ পিণ্ডটি কিন্তু অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইল না। আসনে বসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি উহা গলাধঃকরণ করিলেন।

নবীন সাধক রাম ও তাঁহার সতীর্থগণ বিস্ময় বিস্ফোরিত নয়নে এই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছেন। কিন্তু ইহার পর যে অলৌকিক দৃশ্যটি তাঁহাদের সম্মুখে উদঘাটিত হইল সমগ্র জীবনে তাঁহারা সেটি আর ভুলিতে পারেন নাই!

সর্পের ঐ দেহপিণ্ডটি ভক্ষণের পরই বৃদ্ধ তাপস নিজ আসনের উপর দেহখানি এলাইয়া দিলেন। স্পন্দনহীন, নীরব নিশ্চল দেহটি দেখিয়া মনে হয় না যে, উহাতে প্রাণের চিহ্নমাত্র রহিয়াছে। খানিক পরে দেখা গেল, মহাপুরুষের দেহটি ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। এই স্ফীতি আরো বৃদ্ধি পাইলে উহা হঠাৎ সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল, অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিল এক অনিন্দ্যসুন্দর, তরুণ তাপসমূর্ত্তি। এ যেন এক দিব্য ইন্দ্রজাল!

বিগতপ্রাণ, প্রাচীন মহাপুরুষের দেহটি তখন এক পাশে নিঃসাড় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নবসৃষ্ট তরুণ সাধক এটিকে তুলিয়া নিয়া অবলীলায় ধুনীর অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন।

তারপর দেখা গেল, বৃদ্ধ প্রাচীন তাপসের পরিত্যক্ত আসন, চিমটা ও কমণ্ডলু নিয়া ধীরে ধীরে তিনি অরণ্যের গভীরে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

রাম ও তাঁহার সতীর্থেরা এই অকল্পনীয় দৃশ্যের দিকে নির্নিমেষে

চাহিয়া আছেন। বিস্ময়ে কাহারো বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। হঠাৎ গুরুদেবের আহ্বানে তাঁহারা চমকিয়া উঠিলেন, বাস্তব জীবনের বোধ আবার ফিরিয়া আসিল।

প্রসন্নমধুর কণ্ঠে গুরুদেব রামকে কহিলেন, "বৎস, কায়া পরিবর্ত্তনের যে অলৌকিক পন্থা তোমরা আজ দেখলে, তা মহাসমর্থ সাধকদেরই আয়ত্তাধীন। তোমরা তন্ত্র ও যোগরাজ্যের দুরূহ সাধনায় ব্রতী হয়েছ। এখানে এসে এ রাজ্যের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষভাবে কিছুটা আজ জানতে পারলে। এটাই হল বড় লাভ।"

হিমালয় পরিব্রাজনের পথে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না এ সময়ে রামঠাকুর লাভ করিয়াছেন। সেবার তিনি ও তাঁহার এক গুরুভাই গুরুদেবের পিছনে পিছনে উচ্চ পার্ব্বত্য অঞ্চল দিয়া চলিয়াছেন। হঠাৎ পথে শুরু হইল প্রচণ্ড তুষার ঝটিকা। ব্যাঘ্রগর্জ্জনের সঙ্গে এক একবার বিদ্যুৎরেখা ঝলকিয়া যায়, আর তুষারমণ্ডিত সারা গিরিশিখর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তারপর আবার সব কিছু অবলুপ্ত হয় সূচীভেদ্য অন্ধকারে। একলা পথ চলিবার আর উপায় থাকে না।

এদিকে কিন্তু হাড়-কাঁপুনে শীতে রামঠাকুর ও তাঁহার গুরুভ্রাতাদের দেহ একেবারে নিঃসাড় হইয়া পড়িয়াছে। কোনমতেই তাঁহারা আগাইতে পারিতেছেন না। এই সঙ্কট সময়ে প্রকটিত হইল গুরুদেবের এক বিস্ময়কর যোগ বিভূতি। রাম এবং অপর শিষ্যটিকে দুই হাতে ধরিয়া তিনি তাঁহার নিজের দিকে আকর্ষণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, অলৌকিক শক্তিবলে তাঁহার দেহটি এক বিশালকায় মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। তরুণ শিষ্যদ্বয়কে অবলীলায় কুক্ষির ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া তিনি এই তুষার ঝটিকার মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে আগাইয়া চলিলেন। উত্তরকালে ঠাকুর বলিয়াছেন, এ তুষার ঝড়ের দাপাদাপি কয়েক দিন ধরিয়া চলিতে থাকে এবং এ কয়দিন তাঁহারা গুরুদেবের নবসৃষ্ট বিশাল কলেবরের আশ্রয়ে থাকিয়াই আত্মরক্ষা করেন।

এই সময় গুরুদেব কোথা হইতে দুইটি ফল সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং শিষ্যদ্বয়কে তাহা ভোজন করিতে দেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, "এই ফল যেন স্বর্গীয় ফল। উহা খাওয়া মাত্রই আমার ও আমার গুরুভাই-এর দেহে মনে এক দিব্য আনন্দের সঞ্চার হলো। এর পর থেকে দেহের উত্তাপ এমন বেড়ে যায় যে, তুষারাঞ্চলের তীব্র শীতে কোন কষ্টই কারুর হয়নি। ক্ষুৎ-পিপাসার বোধও কিছুদিনের মত ছিল না।"

গুরুর অলৌকিক কায়া নির্ম্মাণ ও সেই কায়ার আশ্রয়ে বাস করার ঘটনাটি শিষ্যের মনে সেদিন চির অঙ্কিত হইয়া গেল। গুরুর বিদেহী সত্তার বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্ব্বেই রামের কাছে কিছুটা ধরা পড়িয়াছে। তিনি যে দেহধারী হইয়াও সর্ব্বতোভাবে দেহাতীত, স্থূল দেহ বলিয়া যে তাঁহার কিছু নাই—এ সত্যটি তাঁহার উপলব্ধিতে আসিয়া গিয়াছে। দেহাতীত মহাসত্তারূপে গুরুদেব তাঁহার সদা বিরাজিত, শুধু তাহাই নয়, পঞ্চভূত সর্ব্বদা তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন, শাসনাধীন—এই পরম সত্যটিও তরুণ শিষ্যের অন্তরে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

যৌগিক ও তান্ত্রিক নানা বিভূতি, নানা লীলা প্রদর্শনের মধ্যে দিয়া গুরুদেব নিজের স্বরূপতত্ত্বকে মাঝে মাঝে প্রকট করিয়া তুলিতেছেন। শিষ্য বুঝিয়াছেন, আশ্রয়দাতা গুরুর অলৌকিক শক্তি সীমাহীন, আর এ শক্তি চিরদিন তাঁহার আশ্রিতকে রাখিবে বিধৃত। এই গুরুশক্তিই এবার হইতে তাঁহার সাধন জীবনে যোগাইবে উদ্দীপনা ও সঞ্জীবনী-মন্ত্র।

ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহারা হিমালয়ের শিখরস্থিত এক গুহায় আসিয়া উপস্থিত। গুরুদেবের ইচ্ছা, এখানে সকলে মিলিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিবেন।

এ কয়দিন গুরুই তরুণ শিষ্যদের বহিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহাদের জন্য কোথা হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া আনিয়াছেন। গুরুর সেবাধিকার শিষ্যদের ভাগ্যে এ অবধি জুটে নাই। পরিব্রাজনের এই বিরতির সময়ে রামঠাকুরের অভিলাষ হইল, গুরুদেবের একটু সেবা যত্ন করিবেন,

খুঁজিয়া পাতিয়া কিছু ফল তাঁহার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিবেন।

কিন্তু ফলমূলের কথা দূরে থাকুক, আশেপাশে কোন লতাগুল্ম বা বৃক্ষই নাই। নিরন্তর তুষারপাতের ফলে এ অঞ্চলে এসব একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

তবুও ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া ঠাকুর গুহা হইতে বাহির হইলেন, গুরুসেবার জন্য যদিই বা কিছু ফলের সন্ধান পাওয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে দূরে এক বরফ টিলার কাছে গিয়াছেন, হঠাৎ এক অলৌকিক দিব্য দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, এক অপরূপ যুগল মূর্ত্তি তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রসন্ন মধুর হাসি হাসিতেছেন, আর চারিদিক এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

নিকটে গিয়া রাম ভক্তিভরে এই যুগল মূর্ত্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। মাতৃমূর্ত্তিটি পরম স্নেহভরে একটি সুস্বাদু ফল রামের করপুটে প্রদান করিলেন। ক্ষণ পরেই দেখা গেল, তাঁহারা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।

অযাচিতভাবে এই অপূর্ব্ব ফলটি পাইয়া রামের আনন্দের আর অবধি রহিল না। তখন ছুটিয়া আসিয়া গুরুদেবের সম্মুখে এটি ধরিলেন। কহিলেন, "প্রভু, আপনার সেবার জন্য কিছু ফলমূল সংগ্রহ করতে আমি বেরিয়েছিলাম, ভাগ্যক্রমে এক দিব্যদর্শনা মাতৃমূর্ত্তি এই ফলটি আমায় দিয়েছেন। আপনি কৃপা করে গ্রহণ করুন।"

গুরু সহাস্যে কহিলেন, "বৎস, এ ফল তোমারই জন্যে এসেছে। তুমিই এটি ভোজন কর। তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। পার্ব্বতী দেবী আবির্ভূতা হয়ে নিজ হাতে তোমায় এ ফল দিয়ে গিয়েছেন।"

ঠাকুর এ ফলটি শ্রদ্ধাভরে শিরে ধারণ করিলেন, তারপর গুরুর নির্দ্দেশমত উহা ভোজন করিয়া ফেলিলেন।

পরিব্রাজনের পর এবার শুরু হইল ঠাকুরের কঠোর তপশ্চর্য্যার পালা। পর্ব্বতের সানুদেশস্থ এক গুহায় গুরু তাঁহাকে বসাইয়া দিলেন,

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিতে লাগিল যোগ ও তন্ত্রের নানা নিগূঢ় ক্রিয়া ও কঠোর তপস্যা।

অবশেষে এ গুহার অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হইল এক বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান। গুরুর আদেশে এই যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়া রাম হইলেন আপ্তকাম। গুরুকৃপায় সর্ব্বসিদ্ধি তাঁহার করতলগত হইল।

হিমালয়-বাস এবার পরিসমাপ্তির পথে আসিয়া পড়িয়াছে। গুরু এই মহা-অধিকারী নবীন সাধককে আদেশ দিলেন, "রাম, তুমি এবার লোকা-লয়ে ফিরে যাও। যোগ ও তন্ত্রসিদ্ধির যে মহাশক্তি ভগবৎকৃপায় তোমার আধারে নিহিত হোল, তা পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়ে উঠুক। এবার থেকে জীবের কল্যাণে তুমি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ কর।"

সজল চক্ষে গুরুর পদ-বন্দনা করিয়া রাম বিদায় গ্রহণ করিলেন। আসন্ন বিরহের বেদনায় হৃদয় তাহার জর্জ্জরিত। শুধু এই ভরসায়ই সেদিন তিনি বুক বাঁধিতে পারিয়াছিলেন যে, বিদেহী গুরুর কল্যাণহস্তটি সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে তাঁহার উপর প্রসারিত থাকিবে।

গুরুর কাছে ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, এসময়ে এক গুরুভ্রাতা কাছে আগাইয়া আসিলেন। কণ্ঠে তাঁহার সযতনে ঝোলানো রহিয়াছে এক নারায়ণ শিলা। কহিলেন, "ভাই, তুমি লোকালয়ে ফিরে যাচ্ছো, তোমার ওপর একটা পবিত্র ভার আমি ন্যস্ত করিতে চাই। আমার কণ্ঠের এই পবিত্র শিলার কথা তুমি জানো। গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন, এবার এই নারায়ণ শিলা আমায় ত্যাগ করতে হবে। তুমি এইটি তোমার সঙ্গে নাও, সুযোগমত কোথাও সেবার একটা বন্দোবস্ত করে দিও।"

যাত্রার আগে রাম শ্রদ্ধাভরে এই পবিত্র শিলাকে কণ্ঠে ধারণ করিলেন। গুরুদেব ও তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণ ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন এক পাহাড়ের অন্তরালে। হিমালয়ের একটি বিশেষ অঞ্চলস্থিত শিবভূমিতে এবার তাঁহারা পরিব্রাজন শুরু করিবেন।

এই নারায়ণ শিলার কৌতূহলকর কাহিনীটি রামঠাকুর উত্তরকালে

শিষ্যদের কাছে মাঝে মাঝে বর্ণনা করিতেন। ইহার একটি অলৌকিক বিশেষত্বের কথা তাঁহার এবং গুরুভ্রাতাদের জানা ছিল। শিলাটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু গুহার অন্ধকারে বসিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, পূর্ণিমার রাতে ইহার অভ্যন্তর হইতে এক দিব্য আলোকচ্ছটা বাহির হইতেছে। তিথির আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিলার অভ্যন্তরস্থ এই আলো ক্রমে ক্রমে হইয়া আসিত ক্ষীণতর। এ আলোকের তারতম্য লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা সকলে তিথি নির্ণয় করিতেন।

এবার এই নারায়ণ শিলা নিয়া রামঠাকুর কিন্তু পড়িলেন এক মহা সমস্যায়। কোথায়, কাহার কাছে এটিকে রাখিবেন? কি করিয়াই বা নিত্যকার সেবা পূজার ব্যবস্থা হইবে, ভাবিয়া পান না।

পথ চলিতে চলিতে এক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যের সীমান্তে সেদিন আসিয়া পড়িয়াছেন। সামনেই এক রাজা সাহেবের মনোরম উপবন। ঠাকুর মনে মনে ভাবিলেন, এ এক সুবর্ণ সুযোগ, নারায়ণ শিলার ভার এখানকার রাজা সাহেবের উপরই এবার দিয়া যাইবেন। এ শিলা বড়ই জাগ্রত। তদুপরি এক পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে ইহার ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, উপযুক্ত সেবা ও অর্চ্চনার ব্যবস্থা না হইলে তাঁহার যে দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না। ভক্তিমান কোন রাজ-রাজড়া যদি এই গুরু দায়িত্বের ভার নেয়, তবেই সব দুশ্চিন্তা কাটিয়া যায়, সানন্দে তিনি দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন।

উপবন-প্রাসাদের এক অলিন্দে রাজা সুরাপানে মত্ত। চারিদিকে নর্ত্তকী ও পারিষদেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। এমন সময় মূর্ত্তিমান ছন্দপতনের মত তরুণ তাপস সেখানে গিয়া উপস্থিত।

সকলের আনন্দ কলরব এক মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল। সুরা-রাগরঞ্জিত নয়নে রাজাসাহেব ক্রুদ্ধস্বরে হাঁক দিলেন, "ওরে, কে এই বেয়াদপ ভিখিরী বামুনটাকে এখানে আসতে দিয়েছে? কি চাস্ তুই?"

ঠাকুর শান্ত কণ্ঠে, মিনতি করিয়া কহিলেন, "রাজা সাহেব, আমার গলদেশে বিলম্বিত এই নারায়ণ শিলাটির ভার আমি আজ আপনার

ওপর দিয়ে যেতে চাই। এর অর্চ্চনা ও সেবার ব্যবস্থা আপনি রাজ সরকার থেকে করুন, এই প্রার্থনা।"

রাজা সাহেব এবার রোষে ফাটিয়া পড়িলেন—"কে আছস্, এখনি এই বামুনটাকে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দে! এত বড় আস্পর্দ্ধা! যত সব বাজে কথা নিয়ে এমন স্ফূর্ত্তিটা মাটি করতে এসেছে!"

রক্ষীদল ইতিমধ্যে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। রাজা সাহেব হুকুম দিলেন, "এ অসভ্য বামুনটাকে এখনি বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে আয়। দূরে গভীর বনে ওকে তোরা রেখে আসবি, সেখান থেকে আর যেন ফিরতে না পারে। ওর সাধের নারায়ণ শিলা গলায় বেঁধে বাঘের পেটেই এবার চলে যাক্।"

তখনি গলাধাক্কা দিতে দিতে প্রহরীরা ঠাকুরকে উপবনের বাহিরে আনিয়া ফেলিল। উত্তরকালে এই লাঞ্ছনার কাহিনী বর্ণনা করার সময় ঠাকুর হাসিয়া হাসিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নিরাসক্তি ও কৌতুকপ্রিয়তা নিয়া বলিয়াছিলেন, "গলায় এক একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগবার পর বিনা চেষ্টাতেই এক একবারে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে লাগলাম, তবে গুরুকৃপায় তখন ধরাশায়ী হতে হয়নি।"

গভীর অরণ্যের মধ্যে ঠাকুরকে রাখিয়া রাজপ্রহরীরা ফিরিয়া গেল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। ক্ষুৎপিপাসা, পথশ্রম ও উৎপীড়নের ফলে ঠাকুরের দেহ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, তাইতো, মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া চলিল কিন্তু এখনও যে নারায়ণকে স্নান করানো হয় নাই। ভোগরাগেরই বা ব্যবস্থা কই? এই গহন বনে কাহার কাছে যাইবেন? নিজের ক্লান্তি ও অবসাদের কথা বিস্মৃত হইয়া ঠাকুর তখনই ব্যস্ত হইলেন পবিত্র শিলার সেবার জন্য।

অদূরেই চোখ পড়িল নাম না-জানা একটি রসপুষ্ট লতার দিকে। লতাটি হাতে নিয়া চাপ দিতেই মট্ করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া গেল, নিঃসৃত হইতে লাগিল দুগ্ধের মত শুভ্র রসধারা। এ রস মুখে দিয়া রামঠাকুর তো অবাক! একি! এ যে দেখা যাইতেছে দুধেরই মত সুস্বাদু। তবে

দুধেরই অনুকল্পরূপে ইহাকে ব্যবহার করিতে বাধা কোথায় ?

তখনি পাতার ঠোঙায় করিয়া ঠাকুর এই শুভ্র রসধারা সঞ্চয় করিলেন। এই অনুকল্প দুধ দিয়া সম্পন্ন হইল তাঁহার নারায়ণ শিলার স্নানাভিষেক। বনমধ্যে এক রসাল ফলের গাছও ভাগ্যক্রমে মিলিয়া গেল। নারায়ণের ভোগরাগ শেষ হইতে এবার বিলম্ব হইল না। প্রসাদ পাইয়া তবে ঠাকুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

বেলা শেষে গহন অরণ্য জুড়িয়া নামিতেছে অন্ধকার। ঠাকুর বড় চিন্তায় পড়িলেন। হিংস্র বাঘ, ভল্লুক সর্পাদির ভয় এ বনে যথেষ্ট রহিয়াছে। এমন একটি নিরাপদ স্থান কোথায় পাওয়া যায়, যেখানে নারায়ণের শয্যা দিয়া নিজেও তিনি ঘুমাইতে পারেন ?

স্থান নির্ব্বাচন করিতে গিয়াও বিপদ কম নয়। হঠাৎ কোথা হইতে একটি বিশালকায় বাঘ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বড় বিস্ময়ের কথা, হিংস্র বাঘ আজ কি জানি কেন তাহার হিংসা ভুলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরের শরীর ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পরমানন্দে উহা গাত্র কণ্ডুয়নে রত হইল। শুধু তাহাই নয়, বিষধর সর্প ঠাকুরের পায়ে জড়াইয়া পড়ে, কিন্তু মনে হয়, এ যেন পোষা জীবটি। ফনা উদ্যত করিতেও ভুলিয়া গিয়াছে।

ঠাকুরের নয়ন দুইটি ভক্তিরসে সজল হইয়া আসে। অলৌকিক কৃপার একি নূতন এক দৃশ্য জীবনপ্রভু তাঁহাকে দেখাইতেছেন ? গুরু-শক্তির রক্ষা-কবচেই হোক, বা এই জাগ্রত নারায়ণ শিলার প্রসাদেই হোক, সারা প্রকৃতি যেন অসামান্য প্রীতি ও আনুগত্য দিয়া এই অন্ধকারময় গহন বনে তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিতেছে।

রামঠাকুর মনে মনে ভাবিলেন, 'দূর ছাই, তবে কেন শুধু শুধু নারায়ণ শিলার শয়ন-স্থান খোঁজার জন্য ব্যস্ত হচ্ছি। যেখানেই হোক কোথাও এবার ঠাকুরের শয়ন দিয়ে নিজে খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। শরীরটা আজ বড়ই ক্লান্ত।'

পবিত্র শিলাখণ্ডটিকে পাশে রাখিয়া ঠাকুর গভীর নিদ্রায় অভিভূত

রহিয়াছেন। রাত্রি তখন প্রায় তিন প্রহর। এমন সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। একি? অদূরে এত মশালের আলো কেন? একদল লোক যে হৈ চৈ করিতে করিতে তাঁহার দিকেই আসিতেছে।

একটু বাদেই কানে আসিল, আগন্তুকদের চীৎকার, "সাধু বাবা, আপনি কোথায় রয়েছেন? একবার দয়া করে বেরিয়ে আসুন।"

তাড়াতাড়ি শিলাখণ্ডটি গলায় বাঁধিয়া রামঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তবে কি ইহারা তাঁহারই অনুসন্ধান করিতেছে? তবে এটা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লোকগুলি কোন কু-অভিসন্ধি নিয়া আসে নাই। ধীর পদে তিনি মশালধারীদের সম্মুখে আগাইয়া গেলেন।

ঠাকুরকে দেখিয়াই আনন্দ কলরব পড়িয়া গেল, যেন হারানো কোন মহাসম্পদ সকলে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

রামঠাকুর সবিস্ময়ে দেখিলেন, রক্ষীদলসহ রাজা সাহেব ও রাণী সাহেবা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। যুক্তকরে, সাশ্রুনয়নে রাজা সাহেব বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "সাধু বাবা, আমি মহা পাতকী, আপনার চরণে আমি যে অপরাধ করেছি তার ক্ষমা নেই। কিন্তু আপনি নিজগুণে আমায় ক্ষমা করুন। নইলে এবার আমি ধনে প্রাণে মারা যাবো।"

রাজা ও রাণী উভয়েই কাতরভাবে রামঠাকুরের চরণতলে পতিত হইলেন।

কান্নাকাটি ও কাতরোক্তি থামার পর প্রকৃত ঘটনাটি জানা গেল।

রামঠাকুরকে যেদিন অপমান করা হয়, সেই দিনই রাত্রে রাজা ও রাণী উভয়ে এক আতঙ্ককর স্বপ্ন দর্শন করেন। স্বপ্নে আবির্ভূত দেবতা রোষকষায়িত নয়নে বলিতে থাকেন, "ওরে, তোরা নিজেদের একি সর্ব্বনাশ আজ করলি, বল্‌তো? জাগ্রত নারায়ণ শিলা সঙ্গে নিয়ে এই তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণকুমার দ্বারে এসেছিলেন। মূর্খ তোরা। নারায়ণের সেবা পূজার ভার নেওয়া তো দূরের কথা, তাঁকে তোরা করেছিস্ চরম লাঞ্ছনা ও অপমান। এখনই গিয়ে তাঁর কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা

ভিক্ষা কর্, নতুবা তোদের এ রাজ্য আর থাকবে না, বংশও নাশ হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণকুমারের কাছ থেকে নারায়ণ শিলাটিকে তোরা এখনই ভিক্ষা চেয়ে নে, তারপর শ্রদ্ধাভরে মন্দির মধ্যে তাঁকে স্থাপন করে সেবা-পূজার বন্দোবস্ত করে দে।"

রাজা সাহেব ও রাণী বারবার অনুনয় করিতে থাকেন, "প্রভু, আমাদের আপনি ক্ষমা করুন, আর দয়া করে একবার আমাদের প্রাসাদে পদার্পণ করুন। নারায়ণ-শিলার প্রতিষ্ঠা আমরা অবিলম্বে করছি।"

কাণ্ড দেখিয়া রামঠাকুর মনে মনে হাস্য করিতেছেন। কৌতুকী ঠাকুরের এ বড় অপূর্ব্ব অভিনয়। এক নাটকীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ইতিমধ্যে নিজেই নিজের সেবা ও ভোগরাগের আয়োজনটি বেশ পাকা করিয়া ফেলিয়াছেন। মাঝখান হইতে বেচারা রামঠাকুর শুধু শুধু হইলেন লাঞ্ছিত।

রাজা ও রাণীকে ক্ষমা করিতে রামঠাকুরের মোটেই দেরী হয় নাই, কিন্তু ঐ রাজধানীতে নারায়ণশিলা নিয়া ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাবে তিনি রাজী হইলেন না। কহিলেন, "বেশ তো, রাজা সাহেব। এই নারায়ণ-শিলার সেবার জন্য আপনি যদি উৎসুকই হয়ে থাকেন, তবে এই বন-মধ্যেই তার আয়োজন করতে বাধা কি? অর্থ সামর্থ্যের অভাব তো আপনার নেই। এখানেই এক মন্দির গড়ে তুলুন, নারায়ণকে স্থাপিত করুন তার ভেতর। সেবা-অর্চ্চনার জন্য পুরোহিত ও সেবকের স্থায়ী ব্যবস্থাও করে দিন। এতে আপনার আপত্তি হবে কেন?"

রাজা সাহেব এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, অল্প সময়ের মধ্যে এক মনোরম মন্দির নির্ম্মিত হইয়া গেল। পবিত্র শিলার প্রতিষ্ঠা-উৎসবের শেষে ঠাকুর রওনা হইলেন আপন গন্তব্যপথে।

পার্ব্বত্য অঞ্চলের বন জঙ্গলের মধ্যে আপন মনে তিনি আগাইয়া চলিয়াছেন। পথে সঙ্গী কেহ নাই, কাছাকাছি জনমানবের কোন চিহ্নও দেখা যায় না। এ সময়ে একদিন হঠাৎ তাঁহার দেহে প্রবল জ্বরের

আক্রমণ দেখা দিল।

দেহের তাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, অবশেষে জ্বরের ঘোরে ঠাকুর একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, গুরুদেবের কোলে তিনি শয়ন করিয়া আছেন। দেহে তাঁহার জ্বরের তাপ তো নাই-ই—ক্লান্তি, অবসাদ ও ক্ষুৎ-পিপাসাও কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া গেলে হৃষ্টচিত্তে গুরুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

কয়েকদিন শিষ্যকে আপন সাহচর্য্যে রাখিয়া আরো কয়েকটি নিগূঢ় সাধন প্রক্রিয়া গুরুদেব শিক্ষা দেন। অতঃপর তাঁহার ভিতরে সঞ্চারিত করেন নূতনতর শক্তি।

গুরুদেবের কৃপায় এবার হইতে রামঠাকুর ক্ষুধা-তৃষ্ণার আক্রমণ হইতেও চিরতরে মুক্তিলাভ করিলেন।

বিদায় কালে গুরুর নির্দ্দেশ রহিল, "রাম, পথে আর বেশী বিলম্ব করো না, এখন সোজা দেশে চলে যাও।"

আপন মনে রামঠাকুর আবার আগাইয়া চলিয়াছেন। একদিন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল পথিপার্শ্বস্থ এক কুষ্ঠরোগীর উপর। সারা অঙ্গ তাহার যেন পচিয়া গিয়াছে, দুর্গন্ধে কাছে যাইবার উপায় নাই। রোগীটির কাতর মিনতিতে হৃদয় গলিয়া গেল, সেবাশুশ্রূষার জন্য তখনই তিনি তাহার পাশে বসিয়া পড়িলেন।

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "তিনি সেই গলিত পুতিগন্ধময় কুষ্ঠরোগীর পাশে বসিয়া একটি একটি করিয়া কীট তুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে আবার গুরুদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—'একটি একটি করিয়া কীট কতদিনে ফেলিবে?'

"ঠাকুরের হাতে একটা গাছের পাতা দিয়া রোগীর গায়ে ঐ পাতার রস তিনি মালিস করিতে বলিলেন। সেই রস মালিস করা মাত্রই

রোগীর সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর গুরুদত্ত আর একটি পাতা গায়ে বুলাইয়া দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল, এমনকি গায়ে একটু দাগ পর্য্যন্ত রহিল না। গুরুদেব তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।"*

প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্ত্তে সর্ব্বশক্তিমান গুরু তাঁহাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া রামঠাকুর প্রতিদিন এ সত্যটি নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন। মন তাঁহার অপার তৃপ্তি ও প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল।

তুষারমৌলী হিমালয়-শৃঙ্গের মত অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য ও মহিমা নিয়া গুরু তাঁহার জীবনের সম্মুখে দণ্ডায়মান। কিন্তু এ তুষারচূড়া যে উত্তুঙ্গ একেবারে অভ্রংলিহ। এ যে মৃত্তিকার মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। সাধক রামঠাকুর সত্যই পরম ভাগ্যবান, তাই তো এই আকাশচুম্বী গুরুমহিমা আজ মহা করুণার ধারারূপে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, আর তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের স্তরে স্তরে হইতেছে বিস্তারিত।

দীর্ঘ প্রবাসের পর ঠাকুর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গৃহে আর তিনি কখনো ফিরিয়া আসিবেন না, ইহাই ছিল সকলের ধারণা। পুত্রের জন্য স্নেহময়ী জননীর হৃদয় ব্যথাতুর হইয়া আছে, এবার তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দের অবধি রহিল না।

গুরুর সান্নিধ্য ও হিমালয় পরিব্রাজনের পর হইতেই ঠাকুরের জীবনে আসিয়াছে এক দূরপ্রসারী অধ্যাত্ম-রূপান্তর। সাধন জীবনের সিদ্ধি ও অসামান্য শক্তি বিভূতিরও তিনি অধিকারী হইয়াছেন। এবার গৃহ জীবনের পরিবেশে আসিয়া এই ঋদ্ধি-সিদ্ধি একেবারে চাপিয়া গেলেন। নিজেকে সংহরণ করিয়া অসামান্য সাধক আত্মপ্রকাশ করিলেন এক সামান্য গৃহী যুবকরূপে। এ যেন ডিঙামাণিকের আগেকার সেই অতি

*শ্রীশ্রীরামঠাকুরের জীবন কথা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হিমাদ্রি, ৪ঠা এপ্রিল, '৫৮।

পরিচিত রামচন্দ্র। সংসারের আর পাঁচজনেরই মত একজন—সকলেরই সঙ্গে নাড়ীর বন্ধনে তিনি জড়িত, সকলেরই সুখ-দুঃখের ভাগী।

সংসারের আর্থিক অবস্থা কোন দিনই তেমন ভাল নয়। তখনও খুব অভাব অনটন চলিতেছে। রাম বাড়ীর বুদ্ধিমান যুবক ছেলে, টাকাকড়ি কিছু রোজগার না করিলে চলিবে কেন? তাঁহাকে তাই চাকুরীর খোঁজে বাহির হইতে হইল।

লেখাপড়া শিখেন নাই, চাকুরীই বা সহজে কি করিয়া মিলিবে? অবশেষে নোয়াখালিতে গিয়া পি. ডব্লু. ডি-র এক ইঞ্জিনিয়ারের গৃহে পাচকের কাজ গ্রহণ করিলেন। চলনসই রান্নার কাজ আগে হইতেই কিছুটা জানেন, এবার বটতলার এক 'পাকপ্রণালী' কিনিয়া নানা ধরণের উপাদেয় খাদ্য তৈরীর কৌশলও শিখিয়া ফেলিলেন।

ঠাকুর যখনই যাহা কিছু করিতেন নিষ্ঠাভরেই করিতেন। পাচক-বৃত্তিও এ সময়ে তিনি চালাইয়া যান নিখুঁতভাবে। গৃহকর্ত্তা ও তাঁহার স্ত্রী ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ তখনো চিনিতে পারেন নাই, চিনিবার কথাও নয়। রোজকার রান্নাবান্না শেষ হইলে ঠাকুর সযত্নে মনিবকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করেন। মনিব অফিসে চলিয়া গেলে সমাপ্ত হয় গৃহকর্ত্রীর ভোজন এবং এই ভোজন শেষ হইলেই তিনি দিবা নিদ্রায় মগ্ন হন।

কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া গেলে ঠাকুর একটি থালায় নিজের আহার্য্য সাজাইয়া রাখেন। দুপুর বেলায় এ সময়ে রান্নাঘরের দিকে কেহ বড় একটা আসে না, নূতন পাচকের দিকে কেহ লক্ষ্যও করে না। এই সুযোগে স্নান আহ্নিক ও সাধন ক্রিয়াদি তিনি সারিতে থাকেন। ক্রমে বেলা গড়াইয়া যায়। তারপর এক ফাঁকে কখন নিজের আহার্য্য নিকটস্থ জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়া আসেন, কেহ জানিতেও পারে না। ঠাকুর কিন্তু এ কাজ রোজই করেন, আর রোজই দুইটি শৃগাল আসিয়া তাঁহার থালার ভাত উদরস্থ করে।

একদিন সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। গৃহকর্ত্তা জানিতে পারেন, রাম কোনদিনই নিজের আহার্য্য গ্রহণ করে না। পাচকবৃত্তি নিয়া নিজের পরিচয় গোপন রাখিলে কি হয়, আসলে সে একজন উন্নত স্তরের সাধক।

লজ্জিত হইয়া ইঞ্জিনিয়ার সেই দিনই ঠাকুরকে তাঁহার রান্নাঘরের কাজ হইতে সরাইয়া নেন, ভর্ত্তি করিয়া দেন নিজেরই অধীনস্থ এক ওভারসীয়ারের সরকারের কাজে।

নোয়াখালিতে থাকিতে ঠাকুর প্রায়ই গভীর রাত্রিতে সহরের নিকটস্থ এক জঙ্গলে গিয়া সাধন ভজন করিতেন। এই সময়ে কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, রামঠাকুর এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধক। জনসমাজে ক্রমে তিনি কিছুটা পরিচিত হইয়াও উঠেন।

ঠাকুরের জীবনের এই সময়কার এক প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন—

"নোয়াখালি সহরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। এখানেই তিনি প্রথমে যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে তিনি দিন কতক দেশে আসিয়া স্বগৃহে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে আমাদের বাড়ীতে একখানা খড়ের ঘরে তিনি অনেক সময় দরজা বন্ধ করিয়া একাকী থাকিতেন। ঐ ঘরে এত সময় একাকী কি করেন তাহা জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হইত। বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতাম, শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মাসনে বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন। সারাদেহ নিস্পন্দ, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ। রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে নিবদ্ধ, গ্রীবাদেশ স্ফীত। কণ্ঠ হইতে মধ্যে মধ্যে এক একটা বিকৃত স্বর নির্গত হইতেছে। এ অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত, আর তিনি ঐ অবস্থায়ই উপবিষ্ট থাকিতেন।"

ঠাকুরের ঐ সময়কার আহার সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"শ্রীশ্রীঠাকুর যতদিন দেশে ছিলেন একদিনও তাঁহাকে অন্ন গ্রহণ করিতে দেখি নাই। স্নান করিবার পর কোনদিন একটু বেলপাতা, কোনদিন হয়তো একটু বেলের কষ খাইতেন। সময় সময় এক ফোঁটা ঘৃত জিহ্বায় দিতে দেখিয়াছি। এরূপ একপ্রকার অনাহারে থাকিলেও তাঁহার দেহের কান্তি পুষ্টি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই, শক্তির কোন অপচয়ও ঘটে নাই। বরং উত্তরোত্তর তাঁহার দেহ আরও সবল এবং উজ্জ্বলই হইয়াছিল।"

মাতৃসেবায় ঠাকুরের বড়ই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল। বাড়ীতে যখন থাকিতেন, উৎসাহ সহকারে স্বহস্তে জননীর জন্য রন্ধন করিতেন, নিজেই সযত্নে করিতেন পরিবেশন। রান্নাবান্না করিয়া পুত্র তাঁহাকে ভোজন করাইবে কিন্তু নিজে এক কণা খাদ্যও গ্রহণ করিবে না, জননীর এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই ছিল না।

প্রথম প্রথম ব্যস্ত হইয়া আহারের জন্য পুত্রকে তিনি পীড়াপীড়ি করিতেন কিন্তু ঠাকুরের হইত মহা বিপদ। আহার করিতে কিছুতেই তাঁহার ইচ্ছা হয় না। অথচ মাতৃআজ্ঞা পালন করিতে না পারিয়াও সারা অন্তর ব্যাথাতুর হইয়া উঠে।

সেদিন সামান্য কিছু আহারের জন্য জননী বারবার তাঁহাকে চাপ দিতেছেন। ঠাকুর কাতরভাবে বুঝাইতে থাকেন, "মা, তুমি আমায় মাপ কর। গুরুর আদেশে আমি আজকাল আর খেতে পারিনে।"

কিন্তু জননী তাঁহার কোন ওজর আপত্তিই শুনিতে রাজী নন। অন্ততঃ কিছুটা দুগ্ধ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

এ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়ানো বড় কঠিন। বাধ্য হইয়া ঠাকুরকে সেদিন স্বল্প পরিমাণ দুধ পান করিতে হইল। ইহার পরেই কিন্তু দেখা গেল, গুরুতররূপে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।

জননী আর কোনদিন পুত্রকে আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই।

এই সময়কার পারিবারিক জীবনে আপন যোগৈশ্বর্য্যকে ঠাকুর সতত

সংহত রাখিতেন, গোপন রাখিতেন। কি পরিবারের লোক, কি বন্ধু-বান্ধব কাহারো কাছে সিদ্ধ জীবনের প্রকৃত পরিচয় কখনো তিনি উদ্‌ঘাটন করেন নাই। সকলে তাঁহাকে শুধু একটি সৎ ও সাধননিষ্ঠ যুবক হিসাবেই ধরিয়া নিয়াছিল।

মাঝে মাঝে কিন্তু কোন কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাঁহার যোগবিভূতি হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িত।

শ্রীমহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী একটি ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন—

"ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীজগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী তখন রাইপুর-এ সপরিবারে বাস করিতেছেন। এ সময়ে মাঝে মাঝে ঠাকুর সেখানে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। একদিন সন্ধ্যাকালে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তিনি তাঁহার যোগক্রিয়াদি করিতেছেন, এমন সময় ভ্রাতৃবধূ প্রসন্নদেবী আঙিনার কোণে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিতে আসিয়াছেন। কাছেই সেই ঘরটি যেখানে ঠাকুর রোজ রুদ্ধকক্ষে কি যেন সব যোগ-যাগ করেন। হঠাৎ প্রসন্নময়ীর কৌতূহল জাগিয়া উঠিল, একবার উঁকি দিলে হয় না?

"দরজার ফাঁক দিয়া কক্ষের ভিতরে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহাতে বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

"দেখিলেন, দেবর ধ্যানস্থ হইয়া পদ্মাসনে উপবিষ্ট। কিন্তু মৃত্তিকার সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই, সারা দেহটি শূন্যে উত্থিত হইয়া রহিয়াছে। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! ভয়ে বিস্ময়ে মহিলাটির কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, "সোনা ঠাকুর, একি! এ আপনি কি করছেন!"

কথা কয়টি শোনামাত্রই ঠাকুর সশব্দে ভূমিতে পড়িয়া যান। তারপর বারবার ভ্রাতৃবধূকে অনুরোধ করিতে থাকেন, বাড়ীর কেহ যেন এ ঘটনার কথা না জানিতে পারে।"*

একবারকার একটি অলৌকিক ঘটনার কথা ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্পাদিত 'বেদবাণী'র (ঠাকুরের পত্রাবলী)

* শ্রীশ্রীরামঠাকুরের জীবন কথা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। হিমাদ্রি, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫৮

ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে এই বিবরণটি তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুর বেজগাঁর সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে সে-বার ঠাকুর কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "তিনি ঠাকুরের অত্যন্ত ন্যাওটা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অনেক সময়েই ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ঠাকুরও তাঁহার স্নেহের অত্যাচার হাসিমুখেই সহ্য করিতেন। একদিন দ্বিপ্রহরে ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া বাহির বাড়ীর একখানা টিনের ঘরে শুইয়া ছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বালক ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে হঠাৎ কোন কারণে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়াই বালক দেখিল যে, ঠাকুর পদ্মাসনে শূন্যে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মাথা ঘরের চালে যাইয়া ঠেকিয়াছে। বালক চিৎকার করিয়া উঠিতেই ঠাকুর তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন এবং নানা কথা বলিয়া বালককে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। সতীশবাবুর এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—এরকম তো হয়ই।"*

পরবর্ত্তীকালে নোয়াখালির কর্ম্মস্থল হইতে রামঠাকুর ফেনীতে বদ্‌লী হইয়া আসেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন তখন মহকুমার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। তরুণ সাধক রামঠাকুরের সহিত এ সময়ে তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

ঠাকুরের অলৌকিক জীবনের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কবিবর জানিতে সক্ষম হন। তাঁহার দুই একটি বিশেষ বিভূতিলীলা দর্শনের সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। নবীনচন্দ্র ঠাকুর সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, ঠাকুরের তৎকালীন জীবনের একটি মনোজ্ঞ রেখাচিত্র তাহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তিনি এ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "...ফেনীতে যে নূতন জেলখানা প্রস্তুত

*ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেদবাণী'—২য় খণ্ড।

হইতেছিল রামঠাকুর তাহার সরকার হইয়া আসিল। লোকে বলিতে লাগিল যে, কখনও তাহাকে গৃহে আহ্নিক করিতে দেখা গেল, এবং পরের মুহূর্ত্তে রামঠাকুর অদৃশ্য হইয়া গেল। কেহ কেহ তাহাকে রাত্রিশেষে রক্তচন্দন চর্চিত অবস্থায় কোনও বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে। সর্প দংশন করিয়া গরু মহিষ মারিতে আসিতেছে, আর রামঠাকুর হাত তুলিয়া বারণ করা মাত্র চলিয়া গিয়াছে। নিজে কিছুই আহার করে না, ক্বচিৎ দুগ্ধ বা ফল আহার করে, অথচ তাহার সুস্থ সবল শরীর। পর সেবায় তাহার পরমানন্দ। জেলখানার ইঁটখোলার গৃহে পাবলিক ওয়ার্কস প্রভুদের বারাঙ্গনাগণ কখন পালে পালে উপস্থিত হয়। কিন্তু রামঠাকুর তাহাদের ঘৃণা করা দূরে থাকুক বরং সন্তোষের সহিত নিজে রাঁধিয়া তাহাদের অতি যত্নে আহার করায় এবং মাতাল হইয়া পড়িলে তাহাদের আপন মাতা ও ভগিনীর মত শুশ্রূষা করে।

"সে সময়ে নোয়াখালি হইতে বহুদূরে ভবানীগঞ্জে গিয়া ষ্টীমারে উঠিতে হইত। রামঠাকুর একদিন একটি আত্মীয়কে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া ফিরিতে রাত্রি হইলে একটি মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গভীর রাত্রিতে দেখিল মসজিদ আলোকিত হইয়াছে এবং তাহার গুরুদেব আর দুইজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন, তাঁহারা কৌষিকী পর্ব্বত হইতে চন্দ্রনাথ যাইতেছেন—নির্জ্জন স্থানে একাকী গভীর রাত্রে রামঠাকুর ভীত হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে দেখিতে আসিলেন।*

"আর একটি গল্প বহু লোকের মুখে, সর্ব্বশেষ রামঠাকুরের নিজ মুখেও, শুনিয়াছিলাম। সে বৎসর শিবচতুর্দ্দশীতে চন্দ্রনাথে তাহার

* রামঠাকুরকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, কবি নবীনচন্দ্র ভুল লিখিয়াছেন। তাঁহার গুরুদেবের সহিত এ সময়কার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী। শিষ্য ভীত হওয়ায় তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ কথার কোন ভিত্তি নাই। দ্রঃ ভূমিকা, বেদবাণী—২য় খণ্ড।

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া তাহার গুরুদেব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। রামঠাকুর ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু এক্‌জিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শনে আসিবেন বলিয়া ওভারসিয়ার ছুটি দিলেন না। রামঠাকুর শিবচতুর্দ্দশীর দিন প্রাতে বড় মনত্বঃখে বসিয়া, গুরুদেব কেন তাহাকে দর্শন হইতে বঞ্চিত করিলেন, ভাবিতেছে। এমন সময় টেলিগ্রাম আসিল যে, সাহেব আসিলেন না। তাহার ছুটি মঞ্জুর হইল।

"রামঠাকুর আনন্দে আত্মহারা হইয়া চন্দ্রনাথ দর্শনে ছুটিল। কিন্তু অকস্মাৎ উত্তেজনায় ভ্রান্ত হইয়া দক্ষিণমুখে না গিয়া উত্তরমুখে চলিল। কিছু দূর গেলে একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল, রামঠাকুর চন্দ্রনাথের বিপরীত দিকে যাইতেছে।

"তখন ভ্রম বুঝিয়া এক বৃক্ষতলায় সন্তপ্ত হৃদয়ে বসিয়া আছে। এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়া, রামঠাকুর কি চন্দ্রনাথ যাইবে,—জিজ্ঞাসা করিল।

"রামঠাকুর বলিল, সে ভ্রমবশতঃ বিপরীত দিকে আসিয়াছে। অতএব সেদিন আর চন্দ্রনাথ পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই।

"সন্ন্যাসী তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন এবং পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া পার্ব্বত্য পথে তাহাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত করিলেন। সেস্থান হইতে চন্দ্রনাথ চল্লিশ মাইল এবং ফেনী হইতে ত্রিশ মাইল পথ। চতুর্দ্দশী রাত্রি সীতাকুণ্ডে অতিবাহিত করিবার পরদিন আবার সেরূপ অজ্ঞাতভাবে তাহাকে আনিয়া ফেনীর উত্তর দিকে একটি স্থানে রাখিয়া গেলেন। এখানে প্রত্যূষে একজন পেয়াদার সঙ্গে রামঠাকুরের সাক্ষাৎ হইলে সে জঙ্গলে লুকাইতেছিল। পেয়াদা তাহাকে পাকড়াও করিল এবং তাহার দ্বারা, মহম্মদের এক রাত্রিতে বিশ্বভ্রমণের মত, এই অদ্ভুত তীর্থদর্শন কাহিনী প্রথম প্রচারিত হইল।

"রামঠাকুর দেখিতে ক্ষীণাঙ্গ, সুন্দর ও শান্ত-মূর্ত্তি। নিতান্ত পীড়াপীড়ি না করিলে কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না, কাহারও সঙ্গে কথা

কয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার আট হইতে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষামাত্র হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব, এমনকি প্রণবের অর্থ পর্য্যন্ত সে জলের মত বুঝাইয়া দিল। আমি তাহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম, মধ্যে মধ্যে আমি তাহাকে বড় পীড়াপীড়ি করিয়া আমার গৃহে আনাইতাম, এবং পতি পত্নী মুগ্ধচিত্তে তাহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা সকল শুনিতাম। বলা বাহুল্য, সে পেশাদারি হিন্দু প্রচারকের ব্যাখ্যা নহে।

"একদিন রাণাঘাটে উষাক্ষণে জাগিয়া স্ত্রী বলিলেন যে, তিনি সে-বার কালী দর্শন করিতে গিয়া শুনিয়াছিলেন, রামঠাকুর কালিঘাটে আসিয়াছিল। আমাদের সঙ্গে কেন দেখা করিল না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, কেমন করিয়া বলিব? মুখ প্রক্ষালন করিয়া আমি হাকিম কক্ষে 'সোফার' উপর বসিয়া যেই বাহিরের দিকে দেখিতেছি, দেখি, আমার সম্মুখে বারাণ্ডায় অধোমুখে স্থিরভাবে রামঠাকুর দাঁড়াইয়া আছে। আমার বোধ হইল যেন, রামঠাকুর আকাশ হইতে সে স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছে। অন্যথা আমি তাহাকে আসিতে দেখিতে পাইতাম। তাহার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই।"

অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী এই রামঠাকুর। কিন্তু ঐশী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এক নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতই তিনি দিন যাপন করিতেছেন। তবে এ প্রচ্ছন্নতা এবার হইতে আর রাখা চলিল না। ধীরে ধীরে তাঁহার চারিদিকে জড়ো হইতে লাগিল কৌতূহলী দর্শনার্থী ও গুণমুগ্ধ ভক্তের দল।

এসময়ে হঠাৎ একদিন গুরুদেবের নির্দ্দেশে ফেনী শহর তিনি ত্যাগ করেন, আবার বাহির হইয়া পড়েন নূতন তপশ্চর্য্যার পথে। শক্তিধর সাধকের জীবনে শুরু হয় আর এক বিশিষ্ট অধ্যায়।

এই সময়কার রহস্যময়, প্রচ্ছন্ন জীবনেই রামঠাকুর অতিক্রম করেন তাঁহার সাধন জীবনের শেষ স্তর। দুশ্চর তপস্যা ও নিগূঢ় তন্ত্রোক্ত

ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া কৃপালু গুরুর নিকট হইতে মহাসাধক লাভ করেন তাঁহার পরম প্রাপ্তি। যোগ ও তন্ত্র সাধনার উচ্চতম শিখরে তিনি হন অধিরূঢ়। সারা ভারতের উচ্চকোটি সাধক সমাজে এক মহাব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ-রূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

ফেনী হইতে রহস্যময় অন্তর্দ্ধানের পর প্রায় সতের বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের শেষে, আবার তিনি লোকালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ব্রহ্মবিদ্ মহাসাধক পূর্ব্ববৎ প্রচ্ছন্নভাবেই তাঁহার এসময়কার দিনগুলি অতিবাহিত করিতে থাকেন। গুরুর আদেশে এবার তিনি গ্রহণ করেন লোক-হিতৈষণার পথ। আপন করুণার স্পর্শে চিহ্নিত ভক্তদের জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে থাকেন অধ্যাত্মজীবনের চরম সার্থকতা। সাধারণ ভক্ত মানুষের কাছেও তিনি আগাইয়া আসেন এক পরমাশ্রয়রূপে।

এ সময়ে প্রায়ই তাঁহাকে কলিকাতা, হুগলী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থান করিতে দেখা যাইত।

সে-বার ঠাকুর বাঁশবেড়ের নিকটে এক ভক্ত দম্পতির গৃহে অবস্থান করিতেছেন। কিছুদিনের মধ্যে গৃহকর্ত্তার বালক পুত্রটি বাতরোগে আক্রান্ত হয়। রোগ ক্রমে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে এবং বালক একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে।

অভিজ্ঞ ডাক্তারদের দিয়া বহু চিকিৎসাই করা হইল, কিন্তু রোগীর অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না, বরং সঙ্কট আরো ঘনাইয়া আসিল। বালকের পিতামাতা একেবারে অনন্যোপায়। ঠাকুরের কাছে তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিলেন। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, যে করিয়াই হোক এই বালককে বাঁচাইতেই হইবে, ঠাকুরের কৃপা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

প্রথমটায় ঠাকুর তাঁহাদের এড়াইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অবশেষে এই দম্পতির ক্রন্দন ও আর্ত্তিতে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়।

গৃহের নিকটেই পুণ্যতোয়া গঙ্গার ধারা বহিয়া চলিয়াছে। সেদিন গভীর রাত্রিতে নদীতীরের এক কাশবনে গিয়া তিনি তাঁহার আসন পাতিয়া বসিলেন।

স্বল্পকাল মধ্যে বালকটি নিরাময় হইয়া যায়, কিন্তু এই দুঃসাধ্য রোগ ঠাকুরের দেহকে আশ্রয় করিয়া বসে। সারা দেহ একেবারে অসাড় হইয়া উঠে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটুও নড়ানোর উপায় থাকে না।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু দেখা গেল, ঠাকুরের গুরুদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। কোনরূপ কথাবার্ত্তা না বলিয়া তিনি শিষ্যের পশ্চাৎ দিকে চলিয়া গেলেন। তারপর সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার উপর হানিলেন এক প্রচণ্ড পদাঘাত। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের দেহটি দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

গুরুদেব গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "রাম, এবার আমার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে চেষ্টা কর।"

অতি কষ্টে হাঁটুর উপর ভর দিয়া ঠাকুর নিকটে আসিলেন।

গুরুদেব আবার কহিলেন, "দেখছি, দোষ কিছুটা থেকেই গেল। দেহ যতদিন আছে, ততদিন মাঝে মাঝে এই বাতের আক্রমণে তোমায় ভুগতে হবে।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যেমনি আকস্মিকভাবে গুরুদেব আসিয়াছিলেন, তেমনিভাবে ঘটিয়াছে তাঁহার অন্তর্দ্ধান।

এ বাতব্যাধিটি পরবর্ত্তীকালে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিত। মুক্তির মহাকাশে ব্রহ্মবিদ্ ঠাকুরের মন সদাই থাকিত উড্ডীয়মান। কে জানে, এই ব্যাধির মাধ্যমে গুরুদেব তাঁহার মনকে নীচেকার জনজীবনের স্তরে টানিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন কিনা?

শক্তি ও জ্ঞানের তুঙ্গ শিখরে রামঠাকুর আপন মহিমায় অধিষ্ঠিত, তাই উচ্চ নীচ, ভাল মন্দের পার্থক্য তাঁহার কাছে কিছু নাই। সন্ন্যাস আর সংসারাশ্রমের ভেদ রেখাও তাঁহার কাছে অবলুপ্ত। তাই দেখা

যায়, নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতো এসময়ে দিন যাপন করিতেছেন, গৃহস্থদের মধ্যে অবলীলায় করিতেছেন ঘোরাফেরা।

ডিঙামাণক গ্রামে নিজ ভবনে গিয়াও এসময়ে এক একবার তিনি উপস্থিত হন। প্রয়োজন হইলে মুমূর্ষু স্বজনদের রোগশয্যার পাশেও কল্যাণ হস্তটি প্রসারিত করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। বাড়ীর জীর্ণ, পতনোন্মুখ রান্নাঘরটির হয়তো সংস্কার চলিতেছে। দেখা যায়, পরম উৎসাহে তিনি সেই কাজেই নামিয়া পড়িয়াছেন, কৃষাণদের কাজের যোগান দিতেছেন। এদৃশ্য দেখিয়া কে বলিবে যে, ইনিই সেই অপরিমেয় ঋদ্ধিসিদ্ধির অধিকারী—মহাব্রহ্মজ্ঞ রামঠাকুর ?

সে-বার এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলেন আর এমন ঘরছাড়া বিরাগী হইয়া থাকা তাঁহার চলিবে না। এবার তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতেই হইবে, গৃহ ও আত্মপরিজনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

বাড়ীর আর সকলেও মহা উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। সকলের এ অনুরোধ ঠাকুরকে রাখিতেই হইবে। বিবাহ না করিলে কোন মতেই এবার আর তাঁহাকে ছাড়া হইবে না। ভ্রাতুষ্পুত্রটি তো আবেগভরে ঠাকুরের পায়ের উপরই পড়িয়া গেলেন, তাঁহার মুখের কথা না নিয়া তিনি ভূমিশয্যা ত্যাগ করিবেন না। ঠাকুরের যুক্তিতর্ক, অনুরোধ, উপরোধ সমস্ত কিছুই ব্যর্থ হইল।

ঠাকুর যেন এক মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন। তাই তো কি করা যায় ? সকলে এমন করিয়া ধরিয়াছে, এবার তো আর এড়ানো যাইবে না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি সম্মতি দিলেন। বাড়ীর লোকদের কহিলেন, "আচ্ছা, কি আর করা যায়, এবার তবে তোমরা ভাল করে পছন্দসই কনের খোঁজ খবর কর।"

কিন্তু পরক্ষণেই আবার কহিলেন, "হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে। কোলকাতায় কৃষ্ণবাবু নামে এক ইঞ্জিনিয়ার আছেন, তাঁর বড় ইচ্ছে, আমায় তাঁর একটি কন্যা দান করেন। আমিও কথা দিয়েছি, বিয়ে যদি

করতেই হয়, তাঁর মেয়েকেই করবো। তাঁকেই বরং এজন্য এক জরুরী চিঠি দেওয়া যাক।"

সেই দিনই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কৃষ্ণবাবুর কন্যার পাণিগ্রহণের প্রার্থনা জানাইয়া তিনি চিঠি দিলেন। বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কলিকাতা হইতে কোন উত্তর আর আসিল না। ইতিমধ্যে ঠাকুরও একদিন সুযোগমত বাড়ী হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মাসাধিককাল পরে কৃষ্ণবাবুর বহু প্রত্যাশিত পত্রটি পাওয়া গেল। লিখিয়াছেন, ঠাকুর কৃপা করিয়া তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিবেন জানিয়া তিনি মহা আনন্দিত। তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে তাঁহার বংশ এভাবে ধন্য হইতে যাইতেছে। আরো জানাইলেন, কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তিনি সপরিবারে সিমলায় আসিয়াছেন, তাই পত্র দিতে এত বিলম্ব হইল।

বলা বাহুল্য, ভাবা বর ইতিপূর্ব্বেই সুযোগ বুঝিয়া কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরের সেদিনকার এই সুচতুর অভিনয়টির প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে শ্রীমহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন—

"এই বিবাহ ব্যাপারে ঠাকুর যে একটু রসিকতার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা সে সময় বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। রাত্রিতে বিছানায় বসিয়া বিবাহের প্রসঙ্গ তিনি করিতেছিলেন। আমরা ছোট ছোট বালক হাঁ করিয়া তাঁহার কথা গিলিতেছিলাম। প্রথমতঃ তিনি, কৃষ্ণবাবু ও তাঁহার কন্যার কথা বলিলেন, কন্যাটি অতি ধর্ম্মপরায়ণা, সচ্চরিত্রা, সেও যোগ অভ্যাস করে ইত্যাদি। তারপর বিবাহের কথা— বিবাহ কলিকাতায় হইবে, আমরা তাঁহার বিবাহে বরযাত্রী হইয়া কলিকাতায় যাইব। কলিকাতা প্রকাণ্ড শহর, খুব সাবধান হইয়া চলাফেরা করিতে হয়। কৃষ্ণবাবু খুব বড়লোক, আমাদের মত তাঁহারা নোংরা থাকেন না। আমাদিগকে ভব্যসভ্য হইয়া চলিতে হইবে। আমাদের বাড়ীর ঘর দরজা, পথঘাট সব পরিষ্কার করিতে হইবে। একখানা নতুন ঘরও তৈয়ার করা আবশ্যক, ইত্যাদি কত কথাই

তিনি বলিলেন।

"আমরা অবোধ বালক কয়েকদিন বিবাহ বাড়ীর লুচিমণ্ডা আর আজব শহর কলিকাতার স্বপ্ন দেখিলাম। এখন বুঝিতে পারি, দাদা (ঠাকুরের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র) সেদিন কত বড় একটা হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আমারা পিপীলিকার শক্তি নিয়া সেদিন অভ্রভেদী বিশালকায় অচল অটল হিমগিরিকে স্থানচ্যুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। ধৃষ্টতা আর কাহাকে বলে? অতঃপর বহুদিন আমরা ঠাকুরের আর কোন সংবাদ পাই নাই।"

রামঠাকুরের জননী স্বর্গারোহণ করেন ১৯০৩ সালে। ঠাকুর তখন কালীঘাটে অবস্থান করিতেছেন। জননীর দেহত্যাগের সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হয়, কিন্তু এ সময়ে তিনি আর দেশে গমন করেন নাই।

কিছুকাল পরে ঠাকুর বহির্গত হইয়া পড়েন দাক্ষিণাত্যের পথে। প্রায় দেড় বৎসর সে অঞ্চলে তীর্থ পরিক্রমা করার পর আনুমানিক ১৯০৭ সালে তিনি বাংলায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পর হইতে আর কখনো তাঁহাকে লোকালয়ের বাহিরে বাস করিতে দেখা যায় নাই। জনজীবনের মাঝখানে থাকিয়া, জনকল্যাণের মহাব্রতই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ঠাকুর সে-বার কিছুদিনের জন্য জন্মস্থান ডিঙামাণিক গমন করেন। তাঁহার এ সময়কার দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রটি লিখিতেছেন—

"এবার তিনি এক প্রকার নিষ্ক্রিয়। সন্ধ্যা বন্দনা, পূজা, ধ্যানধারণা এবং যোগযাগ আগের মত কিছুই নাই। তিনি স্বভাবতঃই অল্পভাষী। এবার যেন আরও বেশী। মধ্যে মধ্যে নিকটবর্ত্তী আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে যাতায়াত করেন, কিন্তু কোথাও বেশীদিন থাকেন না। সে সময়ে তাঁহার খাদ্য ছিল যজ্ঞডুমুর ও কল্‌মি শাক, কখন কখন তিলের শাঁসও খাইতেন। দেশের লোকে অনেকেই তাঁহাকে চিনিত না। তাহারা

মনে করিত, রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পুত্র রাম নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু রাম যে কি রত্ন আহরণ করিয়া আনিল, তাহা কেহ জানিয়াও জানিল না। মাঝে মাঝে কেহ কেহ আসিত বটে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই শারীরিক ব্যাধির প্রতিকার কামনায়। ধর্ম্মপিপাসু হইয়া অল্প লোকই আসিত। যে যে-ভাব নিয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিত ঠাকুর তাহার সঙ্গে সে প্রসঙ্গই আলাপ করিতেন।"

পরবর্ত্তীকালে রামঠাকুর বাংলা ও আসামের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁহার নাম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে থাকে, আর্ত্ত ও মুমুক্ষুদের এক পরমাশ্রয়রূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। প্রচ্ছন্ন মহাব্রহ্মজ্ঞ সাধকের জীবনে এবার হইতে শুরু হয় এক নূতনতর পর্ব্ব। সংসার তাপে তাপিত মানুষের দ্বারে দ্বারে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান, সিঞ্চন করেন কল্যাণময় শান্তিবারি। আর্ত্তকে দেন আশ্বাস, মুমুক্ষুকে দেন পরম মুক্তির সন্ধান।

মহাশক্তিধর গুরুর যে দীক্ষাবীজ ঠাকুরের আধারে পুষ্পিত, ফলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি রাখিয়া দেন গুটিকয়েক চিহ্নিত শিষ্যের জন্য —এই ভাগ্যবানেরা তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হন বীজমন্ত্রের দীক্ষা। আর সর্ব্বসাধারণের জন্য কৃপাময় ঠাকুর উন্মুক্ত করেন তাঁহার নামসম্পদের ভাণ্ডার। অকৃপণ করে সকলকে বিতরণ করিতে থাকেন নামমন্ত্র। তাঁহার নিজের অনুষ্ঠিত নিগূঢ় যৌগিক ও তান্ত্রিক সাধন নয়, কৃচ্ছ্র ও কঠোর তপস্যা নয়—এই আশ্রয়ার্থী ভক্তদের জন্য দিলেন সহজ ব্যবস্থা। প্রচার করিলেন নামধর্ম্ম আর সত্যনারায়ণের সেবা। এক সহজ, উদার, সর্ব্বজনীন ধর্ম্মাচরণের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মুক্তিকামী মানুষকে ডাকিয়া জড়ো করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের প্রচারিত এই সর্ব্বজনীন ধর্ম্মাদর্শ ও সাধনপন্থা সম্বন্ধে ভক্তপ্রবর ডক্টর প্রভাত চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

"তিনি (ঠাকুর) বলেন—নিত্য বস্তু বা স্বভাবের সঙ্গ না করিলে দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। নিজের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি একেবারে বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে শান্তি লাভ করা অসম্ভব। নিত্য বস্তু কি? যাহাকে কোনও প্রকারে ত্যাগ করা যায় না, তাহাই নিত্য। যাহাকে ধরিয়া থাকিলে পাপ তাপ দুঃখ যন্ত্রণা ভয়ে পলাইয়া যায়, তাহাই নিত্য। এই নিত্যকে সেবা করাই ধর্ম্ম। প্রাণ নিত্য, যেহেতু তাহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকা চলে না। যে প্রাণ জগতের আশ্রয় এবং যাহার ক্রিয়া বা স্পন্দনের বিরাম নাই, সেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রাণদেবতার সঙ্গ করিতে হয়। একটা কিছু আশ্রয় বা অবলম্বন না করিয়া সাধন ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। কাজেই যিনি সকলের আশ্রয়, সর্ব্বভূতের প্রাণ এবং সর্ব্বব্যাপক তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্যেই বৈষ্ণবেরা বলেন—আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে। সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের কথা তিনি অনেক সময় বলিয়া থাকেন। এই আশ্রয়কেই উপনিষদে বলা হইয়াছে—সর্ব্বলোক-প্রতিষ্ঠা।"

অতি স্বাভাবিক ভাবে নিতান্ত আপন জনের মত ঠাকুর ভক্তদের আকর্ষণ করিতেন। নিজের সান্নিধ্য, সাহচর্য্য ও মমত্বের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া নিয়া ধীরে ধীরে করিতেন তাহাদের রূপান্তর সাধন। এই সব ভক্তদের উপলক্ষ করিয়া শক্তিধর মহাপুরুষের জীবনে কত যে অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখা গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষদের জীবনে সর্ব্ব সময়ে দেখা যায়, যোগবিভূতি কিঙ্করীর মত তাঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য সদা তৎপর থাকে। রামঠাকুরের বেলায়ও তাহার কোন ব্যত্যয় দেখা যায় নাই। নিজের অপরিমেয় শক্তিবিভূতিকে প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতার সীমা ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মাঝে মাঝে নানা স্থলে এগুলি প্রকট হইয়া পড়িত। বলা বাহুল্য, প্রধানতঃ শিষ্যদের কল্যাণের প্রয়োজনেই ঘটিত এই সব

বিস্ময়কর যোগৈশ্বর্য্যের প্রকাশ।

সে-বার রামঠাকুর আসামের অন্তর্গত কুলাউড়ায় গিয়াছেন। ভক্ত অবিনাশ বাবুর গৃহে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সারাদিন দর্শনার্থীদের ভীড়ে ঘনিষ্ঠ ভক্তেরা শ্বাস ফেলিবার অবকাশ পান নাই। সন্ধ্যার পর সবাই ঠাকুরকে ঘিরিয়া বসিলেন। নানা প্রসঙ্গ-কথায় রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া উঠিল। এত রাত্রে কে আর কোথায় যাইবেন? অন্তরঙ্গ ভক্তেরা স্থির করিলেন, ঠাকুরের শয়ন গৃহের এক পাশেই হাত পা ছড়াইয়া রাতটা কোন মতে কাটানো যাইবে।

ঠাকুর নয়ন নিমীলিত করিয়া শয্যায় শুইয়া আছেন। সারাদিনের শ্রান্তির পর সেবক ও ভক্তেরাও নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছেন। হঠাৎ নিশীথ রাত্রির নৈঃশব্দ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল ঠাকুরের মুখনিঃসৃত এক রহস্যময় করুণ রব—'পাঞ্জাবী!'

সকলে সবিস্ময়ে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আর কোন সাড়া শব্দই নাই। অতঃপর দেখা গেল, পাশ ফিরিয়া শুইয়া তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পাড়িয়াছেন।

ভক্তেরা এসময়ে এ ঘটনাটির আর তেমন কিছু গুরুত্ব দিলেন না, তাঁহারাও যার যার মত শুইয়া পড়িলেন।

পরিদিন দ্বিপ্রহরে সাহেবী পরিচ্ছদে সজ্জিত এক তরুণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভক্তিভরে ঠাকুরকে তিনি বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। তারপর প্রণামী স্বরূপ কিছু টাকা সম্মুখে রাখিয়া জোড়-হস্তে নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভদ্রলোকটি জাতিতে ক্ষত্রিয়, পাঞ্জাবের অধিবাসী। এখানে সেতু নির্ম্মাণের কাজে কনট্রাক্‌টারী করেন। ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য ঘর হইতে বাহিরে গেলে তিনি তাঁহার গত রাত্রির এক অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া ভক্তদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

—রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। অদূরে সম্মুখেই নদীর উপর এক প্রকাণ্ড লৌহসেতু প্রসারিত। এইটি পার হইয়া পাঞ্জাবী

তরুণটিকে ওপারে তাঁহার আবাসস্থলে পৌঁছিতে হইবে। সারাদিনের কাজ কর্ম্মের শেষে বেশ কয়েক 'পেগ' সুরা টানিয়াছেন, নেশাও খুব জমিয়াছে। মত্ত অবস্থায় সেতু পার হইতেছেন, হঠাৎ মাঝখানে আসার পর তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পা ফসকাইয়া পড়িলেন নদীগর্ভে। মুহূর্ত্ত মধ্যেই বুঝিয়া নিলেন, জীবনের আর কোন আশা নাই। তারপর কি ঘটিল, কিছুই তাঁহার মনে নাই।

অল্প কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন, নদীর মধ্যস্থলে একহাঁটু জলের উপর তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। অথচ তাঁহার জানা আছে, সেখানে জলের গভীরতা চল্লিশ ফুটের কম হইবে না। কি করিয়া যে তিনি সেতু গলাইয়া নীচে পড়িলেন, কেনই বা হঠাৎ গভীর নদীর মধ্যস্থলে এই চড়ার আবির্ভাব, কোন কিছুই তাঁহার বোধগম্য হইতেছে না। একি মহা বিস্ময়কর কাণ্ড!

অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীর দিকে তাকাইয়া পাঞ্জাবী ভদ্রলোক নিজের উদ্ধারের উপায় ভাবিতেছেন, এমন সময় কোথা হইতে এক মাঝি একটি ক্ষুদ্র নৌকা নিয়া সেখানে উপস্থিত। এই নৌকায় তাঁহাকে তুলিয়া নিয়া সযত্নে তীরে নামাইয়াও দিল।

বিস্ময়ের ঘোর তখনও তাঁহার কাটে নাই। এই নিঝুম নিশীথ রাত্রে কেনই বা এই মাঝি তাঁহাকে তীরে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। সব কিছুই যেন এক দুর্ভেদ্য রহস্যে আবৃত। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি তাঁহার ঐ উদ্ধারকারী মাঝির নামটি জিজ্ঞাসা করিতেই তখন বিস্মৃত হইয়াছেন।

ভক্তগণ এবার গত রাত্রির কথা বিবৃত করিলেন। কেন ঠাকুর গভীর রাত্রে হঠাৎ 'পাঞ্জাবী' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এতক্ষণে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ঠাকুরের এই কৃপালীলার কথা স্মরণ করিয়া পাঞ্জাবী যুবকটির নয়ন দুইটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বারবার ঠাকুরের উদ্দেশে তিনি অন্তরের আকুতি জানাইতে থাকেন।

রামঠাকুর সেবার আসামের লেঙ্গুতে অবস্থান করিতেছেন। ভক্ত নন্দলাল বাবুর গৃহে তাঁহার থাকিবার স্থান করা হইয়াছে। এখানে তাঁহাকে পাইয়া সকলের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা নাই।

কয়েকদিন আগে হইতেই স্থানীয় লোকেরা লক্ষ্য করিতেছেন, অদূরস্থিত পাহাড় হইতে একটা বিকট চীৎকার মাঝে মাঝে উত্থিত হয়। এ শব্দ কোন মানুষের না হিংস্র জন্তুর, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কোথা হইতে এ শব্দ আসে তাহাও কেহ জানে না।

ঠাকুর এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ঐ রহস্যময় শব্দ আরো তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এবার ঘন ঘন উত্থিত হইতেছে।

ভক্তদের ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "ওখানকার পাহাড়ে অবস্থান করছেন এক বিশিষ্ট সাধক। এখানে তাঁর আসবার কথা আছে। এলেই আমার কাছে যেন হাজির করা হয়।"

খানিক পরেই দেখা গেল, এক ভীমকায় পুরুষ বিকট চীৎকার করিতে করিতে গৃহের সন্নিকটে উপস্থিত। যেমন ভীতিপ্রদ তাঁহার আকৃতি, তেমনি অদ্ভুত তাঁহার সাজসজ্জা। দীর্ঘ, বিশাল দেহটি ঘন কৃষ্ণবর্ণ, আয়ত দুই চক্ষু আরক্তিম, মস্তক জুড়িয়া ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। পরিধানে শুধু এক টুকরো নেংটি। দুই কাণে গোঁজা হাড়ের কীলক। গলায় ঝুলিতেছে মোটা হাড়ের মালা। দেখিয়া মনে হয়, ইনি এক উৎকট তপস্যারত অঘোরী অথবা বামাচারী তান্ত্রিক সাধক।

বাড়ীর দোর গোড়ায় আসিয়া এই অদ্ভুতদর্শন সাধক বাজখাঁই আওয়াজে কহিলেন, "আমার নাম চৈতন, ঠাকুর রামচন্দ্রের সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে চাই।"

তখনই সসম্মানে তাঁহাকে রামঠাকুরের সন্নিধানে নিয়া আসা হইল। একঘর লোকের সন্মুখে এই ভীমকায় শক্তিসাধক সাষ্টাঙ্গে তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। প্রণাম ও স্তুতি নিবেদনের পর আবেগভরা কণ্ঠে কহিলেন, "আজ চৈতন মুক্ত হলো।"

ঠাকুরের সহিত আর কোন কথোপকথনই কিন্তু তাঁহার হইল না।

নীরবে নতশিরে তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন।

বিস্মিত ভক্তদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে ঠাকুর সেদিন বলিয়াছিলেন, "চৈতন এক শক্তিধর মহাপুরুষ, আজ তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হলো।"

ঠাকুরের জন্মভূমি, ডিঙামাণিকের পাশেই স্বর্ণখোলা গ্রাম। ভক্ত কালিদাস কুঁড়ির বাস সেখানে। সেবার কলিকাতায় থাকিতে ভক্তটি মারাত্মক টাইফয়েড জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ডাক্তারেরা সমানে যুঝিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু রোগীর বাঁচিবার কোন আশাই দেখা যাইতেছে না। কালিদাস বারবারই ক্ষীণস্বরে কহিতেছেন, "শুনেছি, ঠাকুর এখন কোলকাতায়ই রয়েছেন। তোমরা কেউ গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসো। একটি বার চরণ দর্শন না করে আমি শান্তিতে মরতে পারছিনে।"

লোক পাঠানো হইল। কালিদাসের ব্যগ্রতা ও শেষ ইচ্ছার কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, আমি গিয়ে তাকে দেখে আসবো।"

পরের দিন কিন্তু অন্য কাজেই তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে দেখা গেল। মুমূর্ষু ভক্তের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিবেন, কথা দিয়াছেন। কিন্তু তাহা রক্ষা করার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

কালিদাসের অন্তিমকাল উপস্থিত। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবেরা হতাশ হইয়া চারিদিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার প্রাক্কালে রোগী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তোমরা সরো সরো, এই যে দ্যাখো, আমার ঠাকুর এসেছেন। এবার তিনি এসে পড়েছেন।"

মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষমাণ ভক্তের চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে দিব্য আনন্দের ছটা, তারপরই তিনি চিরনিদ্রায় ঢলিয়া পড়েন।

এই ঘটনার পরদিন এক ভক্ত ঠাকুরের কাছে গিয়া বারবার খেদোক্তি করিতেছিলেন, "আহা! কালিদাসের বড় ইচ্ছা ছিল, আপনার দর্শন লাভ করে, আপনিও যাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু তা আর ঘটে উঠলো না।"

ঠাকুর শান্ত স্বরে কহিলেন, "আমিতো তার শয্যার পাশে কাল গিয়েছিলাম। কালিদাসের সাথে আমার দেখা হয়েছে।"

এবার বুঝা গেল, ভক্ত কালিদাসের শেষ ইচ্ছা ঠাকুর ঠিকই পূর্ণ করিয়াছিলেন, তবে সেখানে সেদিন তিনি উপস্থিত হন সূক্ষ্মভাবে, তাঁহার অপরিমেয় যোগশক্তির বলে।

আজমীড়ের শেঠ শিবরাম ও তাঁহার স্ত্রী দুর্গামণির জীবনে ঠাকুরের উদয় হয় বড় অলৌকিকভাবে। সংসারে তাঁহাদের ধন দৌলত ও সুখ ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। পুত্রকন্যা নিয়া পরম সুখে, একটানা আনন্দের মধ্য দিয়াই দিন কাটিতেছে। হঠাৎ শেঠজীর একদিন সখ হয় পত্নীসহ একটি ভাল ফটো তোলাইবেন। শেষ বয়সের দাম্পত্যজীবনের মধুর স্মৃতিটিকে তিনি ধরিয়া রাখিতে চান।

বড় শহর হইতে এক সুদক্ষ ফটোগ্রাফার আনা হইল। তোড়জোড় করিয়া ফটোও নেওয়া হইল। কিন্তু রাসায়নিক প্রয়োগে ছবি ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য! স্বামী স্ত্রী উভয়েই উপবিষ্ট, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এক অপরিচিত পুরুষ! কে ইনি? শেঠজী ও তাঁহার পত্নী কোনদিন ইঁহাকে দেখিয়াছেন বলিয়া তো মনে পড়ে না।

শুধু তাহাই নয়, কি যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণ রহিয়াছে এই রহস্যময় ছবির। বারবারই ইহা শেঠজী ও তাঁহার পত্নীর প্রাণ কাড়িয়া নেয়। যখনই তাঁহারা এদিকে দৃষ্টিপাত করেন, ভাবতন্ময় হইয়া যান। উপলব্ধি করেন, এই ছবি যাঁহার, তিনি এক উচ্চকোটি মহাপুরুষ। কোন জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে হয়তো তাঁহার এই প্রতিচ্ছবির দর্শনলাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

ক্রমে শেঠ ও শেঠপত্নীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠে এক তীব্র বাসনা,—এই মহাপুরুষকে তাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিবেন।

আত্মপরিজন ও বন্ধুবান্ধবেরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন, বারবার তাঁহাদের বাধা দেন। কিন্তু ভক্ত দম্পতির অন্তরের আকুলতা দূর হয় কই? অবশেষে তীর্থদর্শনের অজুহাতে উভয়ে পরিব্রাজনে বাহির

হইয়া পড়েন, ব্রতী হন ঐ অলৌকিক মহাপুরুষের অনুসন্ধানে। যেখানেই যান, ওই ফটো দেখাইয়া সাধুসন্তদের কাছে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা তাঁহারা করিতে থাকেন। এখন হইতে এই কাজই হয় স্বামী-স্ত্রীর ধ্যান জ্ঞান।

দীর্ঘ স্মরণ, মনন ও অনুধ্যানের ফলে এই মহাপুরুষই হইয়া উঠেন শেঠ দম্পতির ইষ্ট। নিত্যকার তীর্থদর্শন, দানকর্ম্ম প্রভৃতির শেষে উভয়ে মহাপুরুষের বাঁধানো ফটোটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকেন। প্রেমাশ্রু ধারায় বসন সিক্ত হইয়া যায়। এভাবে প্রায় পনের বৎসর কাল তাঁহারা ভারতের নানা তীর্থে ও সাধুমণ্ডলীতে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, তবুও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না।

বৃদ্ধাবস্থায় ছুটাছুটিই বা আর কতদিন করা যায়? অবশেষে শেঠজী স্ত্রীকে নিয়া কাশীতে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। এখানে তাঁহাদের প্রধান নিত্যকর্ম্ম হয় প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান ও তর্পণ করা। তারপর জপধ্যান ও আহার সারিয়া নিয়া উভয়ে মহাপুরুষের ঐ ফটোটি নিয়া বসেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবাবেশের মধ্য দিয়া কাটিয়া যায়।

আরো কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। শেঠদম্পতি এখন বড়ই অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পদব্রজে গঙ্গার ধারে যাইবার মত শক্তি সামর্থ্যও তেমন নাই। পাল্কী করিয়াই রোজ তাঁহারা প্রাতঃস্নানে যান। একদিন হঠাৎ গঙ্গার পথে মিলে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের দর্শন! ফটোর ভিতরে রহস্যময় আবির্ভাবের মধ্য দিয়া যিনি তাঁহাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছেন, কৃপাভরে আজ কায়া ধরিয়া তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই কৃপালু মহাপুরুষই ব্রহ্মবিদ্ রামঠাকুর!

উভয়ে ত্রস্তেব্যস্তে পাল্কী হইতে নামিয়া পড়িলেন। পতিত হইলেন তাঁহার চরণতলে। ক্রন্দন ও আর্ত্তি আর থামিতে চাহে না, চারিদিকে লোক জড়ো হইয়া গেল। অভীষ্ট সিদ্ধির কিছু পরেই দেখা গেল, স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বিগতপ্রাণ দেহ ভূমিতে লুটাইতেছে। ঠাকুরের বহুঈপ্সিত দর্শন ও চরণস্পর্শ লাভের ফলে প্রাক্তনের ভোগ মুহূর্ত্তে হইয়াছে

নিঃশেষিত, জীবনে তাঁহাদের আসিয়াছে মহামুক্তি।

নির্ব্বিকার চিত্তে মনিকর্ণিকার শ্মশানে বসিয়া ঠাকুর এই ভক্ত দম্পতির শেষকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। তারপর আবার নীরবে কোথায় হইলেন অন্তর্হিত।

শেঠ শিবরাম ও দুর্গামণি দেবীর এই একৈকনিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণ, ইষ্টের সহিত তাঁহাদের এই একাত্মকতা, যে কোন সাধনকামী মানুষেরই আকাঙ্ক্ষিত। এই ধরণের একনিষ্ঠা ও শরণাগতির উপর রামঠাকুর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন, ইহাই ছিল তাঁহার বহুবর্ণিত 'পতিব্রতা-ধর্ম্মের' মূল কথা।

ঠাকুরের ভক্ত, অধ্যাপক শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার এক মনোরম বিবরণ দিয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার কিছুটা আগে ইন্দুবাবুর শিশু পুত্রটি হারাইয়া যায়। কলিকাতায় সে নবাগত, রাস্তাঘাটও কিছুই তাহার জানা নাই! বাড়ীর সকলে চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে দৌড়ঝাঁপ শুরু হইল।

রামঠাকুর তখন নিকটেই আর এক ভক্তের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। এই বিপদের কথা তাঁহাকে জানানো হইলে উত্তর দিলেন, "ভয় নেই, ছেলে হারানোর কথাটা একটু জানাজানি হইলেই, ফিরিয়া পাওয়া যাইবে।"

সঙ্গে সঙ্গে শহরের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। থানা পুলিশে সংবাদ দান, রাস্তায় খোঁজাখুজি, কোন চেষ্টারই আর ত্রুটি রহিল না।

ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোক রাস্তায় এই শিশুটিকে দেখিতে পান। প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, সে পথ হারাইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। তখনই তিনি সম্মুখস্থ থানায় তাহাকে জমা দিয়া দেন। পরের দিন ফরওয়ার্ড কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভদ্রলোকটি ইন্দুবাবুর গৃহে সংবাদ পাঠান। হারানো শিশুকে তখনি গিয়া নিয়া আসা হয়।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "ছেলেকে কিছু খাওয়াইয়া শান্ত করিয়া তাহার মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বড় বড় রাস্তা পার হইয়া এতটা পথ একা চলিয়া গেলি, তোর ভয় হইল না?' উত্তরে ছেলে বলিল, 'ভয় হইবে কেন? ঠাকুর যে আগাগোড়াই সঙ্গে ছিলেন এবং বড় রাস্তাগুলি হাতে ধরিয়া পার করাইয়া দিয়াছেন। রাস্তায় ভদ্রলোকেরা যখন আমাকে ঘিরিয়া নানারূপ প্রশ্ন আরম্ভ করিল, তখন হইতে ঠাকুরকে আর দেখি নাই।' যতবার জিজ্ঞাসা করা গেল, এই এক কথাই বলিল। পাঁচ বৎসরের বালক, সে বানাইয়া এমন একটা কথা বলিয়াছে—ইহা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, ঠাকুর বালকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং ভদ্রলোকেরা আসিয়া জুটিতে যখন দেখিয়াছেন যে, তাঁহার আর প্রয়োজন নাই, তখনই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, উল্লিখিত সময়ে তিনি মতিবাবুর ডিক্সন লেনের বাসাতেই সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।"

ভক্তপ্রবর ডক্টর প্রভাত চক্রবর্ত্তীর গৃহেও ঠাকুরের যে অলৌকিক আবির্ভাব ঘটে, ইন্দুবাবু ছিলেন তাহার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী। প্রভাতবাবুর গৃহের তিনজন তখন মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া ইন্দুবাবু, প্রভাতবাবু প্রভৃতি চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে। হঠাৎ দেখা গেল, ঠাকুর সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া, চাতাল দিয়া সোজা অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ভিতরকার ঘরে প্রভাতবাবুর স্ত্রী রোগী তিনটির পরিচর্য্যায় রত। দেয়ালে ঝুলানো আয়নায় ঠাকুরের প্রতিচ্ছবি তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, তাই ব্যগ্রভাবে উঠিয়া তাঁহার আসন আনয়নের জন্য কুলুঙ্গির দিকে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন, ঠাকুর সেখানে নাই, কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। তবে কি, রোগীদের একবার দর্শন দিয়াই বৈঠকখানা ঘরের দিকে গেলেন? আসনখানি হাতে নিয়া তিনি

বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এদিকে প্রভাতবাবু ও ইন্দুবাবুও তাড়াতাড়ি অন্দরের দিকে ঢুকিয়াছেন। ঠাকুরের উপযুক্ত অভ্যর্থনার তো ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু কই? কোথায় তিনি গেলেন? সারা বাড়ী তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাঁহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ইন্দুবাবু লিখিতেছেন, "আমরা বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিলাম এবং ঠাকুরের এই আকস্মিক আবির্ভাবের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলাম। বসন্ত রোগাক্রান্ত আমার বন্ধুর ভাগিনেয়ও ঠাকুরকে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং একই সময়ে যে, পাঁচজন লোকের দৃষ্টি বিভ্রম হইয়াছিল ইহা কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। আর আমাদের দেখার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না, সুতরাং এই দেখাটাকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলাম না।

"ঠাকুর সে সময়ে হরিদ্বারে ছিলেন, পরের দিনই সেখানে পত্র লেখা হইল। উত্তরে জানিতে পারিলাম যে, উল্লিখিত দিনে ও সময়ে ঠাকুর হরিদ্বারেই ছিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহার নিকটেই বসিয়া ছিলেন। কোন কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে এরূপ কথা প্রচলিত আছে যে, একই সময়ে দুই বা ততোধিক স্থানে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বন্ধুগৃহে ঠাকুরের এই আবির্ভাবও যে এ জাতীয়, সে সম্বন্ধে আমার নিজের মনে কোন সন্দেহ নাই।"

পরে জানা গেল, তিনজনের এই মারাত্মক ও ছোঁয়াচে রোগ হওয়াতে প্রভাতবাবুর স্ত্রী বড় ঘাবড়াইয়া যান। আর্ত্ত হইয়া তিনি ঠাকুরকে স্মরণ করিতে থাকেন। সকলেই বুঝিলেন, ভক্তবৎসল ঠাকুর এই জন্যই এমন অলৌকিকভাবে সেদিন হঠাৎ এখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সেদিনকার আবির্ভাবের রহস্য সম্পর্কে রামঠাকুরকে প্রশ্ন করা হইলে, তিনি স্মিতহাস্যে শুধু এক সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াছিলেন, "এ রকম তো হয়ই।"

ঠাকুর ছিলেন মহা ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ। যোগ ও তন্ত্রের শিখরদেশে সদাই তিনি অধিষ্ঠিত,—সাধক জীবনের উচ্চতম ঋদ্ধি ও সিদ্ধি তাঁহার কাছে ছিল হস্তামলকবৎ। তাই তাঁহার দীর্ঘ জীবনে বারবার দেখা গিয়াছে বিভূতিলীলার অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশ। আর্ত্তের ক্রন্দন যখনি হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই ঘটিয়াছে শক্তিধর সাধকের মধ্যে অলৌকিক, অচিন্ত্যনীয় শক্তির আবির্ভাব। অবলীলায় তিনি শরণাগতকে করিয়াছেন উদ্ধার।

আবার এই লোকোত্তর সত্তার পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার এক স্নিগ্ধমধুর, করুণসুন্দর মানবীয় রূপ। সেখানে তিনি ভক্তের বন্ধু, সখা, একান্ত আপন জন। যোগ ও তন্ত্রসিদ্ধির বিদ্যুৎচমক সেখানে নাই, অবলীলায় ছড়াইতেছেন সহজ সুন্দর প্রেমের ধারা, ঘনিষ্ঠতা ও হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়া প্রাণ কাড়িয়া নিতেছেন।

আশ্রিতবৎসল ঠাকুরের এই মানবীয় রূপটি নানা সময়ে, নানাভাবে ভক্তদের নয়ন সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পঞ্চুবাবু ঠাকুরের এক বশংবদ ভক্ত ও সেবক। যখন যেখানে পারেন সাধ্যমত ঠাকুরের সেবা পরিচর্য্যা করেন, তল্পিতল্পা বহন করেন। সে-বার উভয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃন্দাবনে গিয়াছেন। অপর ভক্ত-শিষ্যদের ভীড় এখানে মোটেই নাই, পঞ্চুবাবু ভাবিলেন, প্রাণ ভরিয়া এ সময়ে ঠাকুরের সেবা করিবেন।

ঠাকুর কিন্তু তাঁহার এ আশায় বাদ সাধিলেন। ভোর হইলেই তাগাদা দিয়া পঞ্চুবাবুকে যমুনায় পাঠাইয়া দেন। তাড়াতাড়িই তাঁহাকে স্নান করিতে যাইতে হয়, নতুবা নদীতীরের বালু তাতিয়া উঠিবে। গৃহে ফিরিয়া কিন্তু রোজই ভক্তটি মাথায় হাত দিয়া বসেন। দেখেন, ঠাকুর নিজেই ইতিমধ্যে উনান ধরাইয়া তরকারী রাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, শাক ভাজাও সমাপ্ত। শুধু তাহাই নয়, নিপুণভাবে সব গুছাইয়া রাখিয়া উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়াছেন। ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া কিছু ডাল উহার ভিতর ছাড়িয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই।

এত তোড়জোড় সবই কিন্তু ভক্তের ভোজনের জন্য, কারণ ঠাকুরের নিজের আহারের কোন জটিলতা নাই। কয়েকটি খেজুর, মনক্কা আর কয়েক গ্লাস জল দ্বারাই একাজ মিটাইয়া ফেলেন। পঞ্চুবাবু যত আপত্তি ও হৈ-চৈ-ই করুন, ঠাকুর রোজই তাঁহাকে যমুনা স্নানের অছিলায় সরাইয়া দেন, সব কাজ শেষ করিয়া রাখেন।

ভক্তটির বিপদের শেষ এখানেই নয়। তখন গ্রীষ্মের সময়, বৃন্দাবনের দুঃসহ রৌদ্রতাপে দুপুর বেলায় ঘরের বাহির হইবার উপায় নাই। এ সময়টা তিনি ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তায় কাটাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। কখন কখন অল্পক্ষণের জন্য যদিও একটু নিদ্রা বা তন্দ্রার ভাব আসে, জাগিয়া দেখেন—ঠাকুর হয় তাঁহাকে হাওয়া করিতেছেন, অথবা ভিজা গামছা দিয়া তাঁহার শরীর মুছাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুরের হাত হইতে এই সেবা নেওয়া তাঁহার আর সহ্য হয় না। এক একদিন ভাবেন, তাঁহাকে যখন নিরস্ত করা যাইবেই না, তখন নিজেই বরং বৃন্দাবন ছাড়িয়া আর কোথাও সরিয়া পড়িবেন। কিন্তু ঠাকুরকে একলা ফেলিয়াও তো যাওয়া যায় না।

একদিন অবস্থা চরমে উঠিল। গৃহের ভৃত্যটি অসুস্থ হইয়াছে, সেদিন সন্ধ্যায় সে কাজে আসিবে না। গরমের সময় বৃন্দাবনের কূপ হইতে জলতোলা এক অতি কষ্টসাধ্য কাজ—এ কাজের জন্যই ভৃত্যের সাহায্যের বেশী প্রয়োজন। এ পরিস্থিতিতে কি করা যায়? রাত্রিতে কোন সমস্যা নাই, দুইটি মনক্কা ও এক গ্লাস জল হইলেই ঠাকুরের চলে, আর ভক্তটি বাজার হইতে পুরী তরকারী কিনিয়া আনেন। কিন্তু পরের দিনের কি ব্যবস্থা হইবে?

অনুসন্ধানে দেখা গেল, হাঁড়ি বালতিতে ও-বেলার তোলা যে জল আছে, তাহাতে আগামীকালের রান্নাবান্নার কাজ চলিয়া যাইবে। স্থির হইল, আজ আর কষ্ট করিয়া কূয়া হইতে জল তোলার দরকার নাই। কাল প্রাতের উপযোগী জলতো কিছুটা রহিয়াছেই। ভৃত্য আগামীকাল কাজে যোগ দেয় কিনা দেখিয়া, প্রয়োজনমত ভক্তটি নিজেই জল তুলিয়া

নিবেন। ঠাকুরও ইহাতে তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন।

সন্ধ্যার পর ভক্তটি বেড়াইতে বাহির হইলেন। কাছেই বাজার, ফিরিবার সময় সেখান হইতে নিজের জন্য পুরী তরকারী কিনিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু বাড়ীতে ঢুকিয়াই তো তাহার চক্ষু স্থির! দেখিলেন, ঠাকুর ইতিমধ্যে কূয়া হইতে প্রচুর জল তুলিয়াছেন, ঘড়া, বালতি সব ভর্ত্তি করিয়া পরম আনন্দে চুপচাপ বসিয়া আছেন।

ভক্তটি ঠাকুরের দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইতেই তিনি চোখ নীচু করিলেন, দুষ্কর্ম্ম করিয়া ধরা পড়ার পর দুষ্ট বালকের যে মুখভঙ্গী হয় —এ যেন ঠিক সেইরূপ।

ঠাকুরের অন্তরের এই স্নেহ-স্পর্শ আত্মজন-জ্ঞানে পরিচর্য্যার এই রহস্য বুঝার মত মানসিকতা তখন পঞ্চুবাবুর নাই। ঠাকুরের নিজের হাতের তোলা জলে তাঁহাকে হাত পা ধুইতে হইবে, শৌচাদি করিতে হইবে—এ যে একেবারে অসহনীয়। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন, "বলি, এই জল কোন্ কাজে লাগবে, বলতে পারেন? আপনার শ্রাদ্ধে না আমার শ্রাদ্ধে?"

ঠাকুর অপরাধীর মত নীরবেই দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার তোলা জল সবটা নিঃশেষে ফেলিয়া দিয়া পঞ্চুবাবুকে আবার সেই রাত্রে নূতন করিয়া জল তুলিতে হইল।

ঠাকুরকে নিয়া পরের দিনই তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের সেবা-পরিচর্য্যা সত্যকার ভক্ত কি করিয়া নিবে? কেনই বা নিবে? অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁহাকে এ প্রশ্ন এ সময়ে জিজ্ঞাসা করেন। স্নেহকোমল স্বরে তিনি উত্তর দেন, "এতে কোন দোষ হয় না।" অর্থাৎ, একান্ত নিজজন জ্ঞানে তিনি এভাবে আগাইয়া আসেন, সেই মনোভাব নিয়া ভক্ত তাহা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন।

ভক্তসঙ্গে বসিয়া এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বাদাম ভক্ষণের মধ্যেও একই আত্মীয়তা স্থাপনের প্রয়াস দেখিতে পাই। ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "একদিন ঠাকুরের সঙ্গে হেদোতে একলাটি বেঞ্চে বসিয়া

আছি। এক চিনেবাদামওয়ালা যাইতেছে দেখিয়া ঠাকুর আমাকে দুই পয়সার চিনেবাদাম কিনিতে বলিলেন, পরে ঠোঙাটি আমাদের দুইজনের মাঝখানে রাখিয়া নিজেও দুই একটি খোসা ছাড়াইয়া খাইতে লাগিলেন এবং আমাকে খাইতে বলিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমত আমিও খাইতে লাগিলাম, তবু কেন জানি না, ঠাকুরের সঙ্গে এক পাত্র হইতে খাইতে যেন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। ঠাকুরের যে চিনেবাদাম খাওয়ার কোন প্রয়োজন হইয়াছিল এমন কথা উঠিতেই পারে না, শুধু আমাকে একটু নিকটে টানিবার জন্যই তিনি সেদিন এই অভিনয় করিয়াছিলেন।”

রামঠাকুর কলিকাতায় আসিয়া এক ভক্তের মেসে উঠিয়াছেন। কয়েকটা দিন একটু নিভৃতে কাটাইতে চান, তাই তাঁহার আগমনের সংবাদ প্রচার করা হয় না। এ সময়ে হঠাৎ একদিন এক যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরের এক পুরাতন ভক্ত সম্প্রতি দেহরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবেই সে আসিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ঠাকুরের ঐ ভক্তটি কিছু সঞ্চিত অর্থ রাখিয়া যান। এখন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অথবা দায়িত্বশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আদালতে দাঁড়াইয়া এফিডেভিট্ করিতে হইবে এবং এই এফিডেভিট্ এবং সনাক্ত করার কাজ শেষ হইলে, তবে ঐ টাকা উঠানো যাইবে।

আগন্তুক ছেলেটির মতে, ঠাকুরই এ কাজের যোগ্যতম ব্যক্তি। কারণ, মৃতব্যক্তির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, বহুলোকের তিনি সম্মানীয়ও বটেন। তাই তাঁহাকেই সে অনুরোধ জানাইতে আসিয়াছে। ছেলেটি অল্পবয়স্ক, তরলমতি। ঠাকুরের মত দিক্‌পাল মহাপুরুষকে এই ধরণের বৈষয়িক কাজে টানিবার প্রস্তাব যে কত হাস্যকর, তাহা সে চিন্তা করিতে পারে নাই। ঠাকুর কিন্তু তখনই রাজী হইয়া গেলেন। তাঁহার লৌকিক জীবনের চিন্তাধারা সহজ সরল খাতে প্রবাহিত।

ভক্তেরা তাঁহার আত্মজন। লোকান্তরিত ভক্তটির যখন তিনি ছাড়া আর কোন নিকট আত্মীয় নাই, এ কাজ তো তাঁহাকেই করিতে হইবে।

পরের দিন বেলা দশটার আগেই তাঁহার খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেল। জামা জুতা পরিয়া তিনি প্রস্তুত। সেই ছেলেটির প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, আর বারবার ঘড়ি দেখিতেছেন। আদালতের জরুরী কাজ, রওনা হইতে বিলম্ব না হয়।

এমন সময় ঠাকুরের স্নেহাস্পদ ভক্ত, ডক্টর প্রভাত চক্রবর্তী মহাশয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরের সহিত বরাবরই প্রভাতবাবুর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক। এই অন্তরঙ্গতা ও আত্মীয়তাবোধের বলে পরমারাধ্য গুরুকে তিনি দেখিতেন এক 'বৃদ্ধ শিশু'রূপে, লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে ঠাকুরকে অনেক সময় এই পরম আপনজনের শাসন ও বাক্যবান সহ্য করিতে হইত।

ঠিক এই সময়ে, কোর্টে যাওয়ার প্রাক্কালে প্রভাতবাবুকে ঢুকিতে দেখিয়া ঠাকুর অপরাধী বালকের মত জড়সড় হইয়া পড়িলেন। আবার কি এক হাঙ্গামা বাধিয়া বসে কে জানে?

প্রভাতবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টি হানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসময়ে কোথায় বেরুচ্ছেন?"

ঠাকুর নিরুত্তর।

"বলি, সাত তাড়াতাড়ি সাজগোজ করে কোথায় যাবেন? কি, চুপ করে রইলেন যে?"

তবুও কোন সাড়া শব্দ নাই। এই নীরবতায় প্রভাতবাবু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখনি পাশের ঘরে চলিয়া গিয়া তিনি মহা সোরগোল তুলিয়া দিলেন।

ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়া যাইবার জন্য ইতিমধ্যে সেই যুবকটি আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া প্রভাতবাবু ক্রোধে, ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিলেন। কঠোর ভাষায় তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

ছেলেটি ইতিমধ্যে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছে। এরূপ বৈষয়িক কাজে ঠাকুরের মত সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে নিয়া টানাটানি করা সত্যই বড় গর্হিত হইয়াছে। অপর যে কোন লোক দিয়াই ইহা করানো যায়, এ কথা সে ভাবিয়া দেখে নাই।

অনুতপ্ত হৃদয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়া কহিল, "আমায় আপনি ক্ষমা করুন, আমি এতটা বুঝতে পারিনি, এ আমার বড় অবিবেচনার কাজই হয়েছে।"

ঠাকুর তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, না—না, কোন অন্যায়ই তাহার হয় নাই, প্রভাতবাবু ঠাকুরের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহশীল, তাই এত উত্তেজিত হইয়াছেন। সে যেন ব্যথিত না হয়।

ঠাকুর সেবার মজঃফরপুরে ভক্তপ্রবর রোহিণী মজুমদার মহাশয়ের গৃহে আসিয়াছেন।* আরো অনেক ভক্ত সেখানে উপস্থিত। নানাবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। এমন সময় রোহিণীবাবুর স্ত্রী একখানা আমসত্ত্ব হাতে নিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। এইমাত্র একটা কাক এই আমসত্ত্বখানা ছাদের উপর রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! কাকের ঠোঁটের দাগটি পর্য্যন্ত ইহাতে নাই। এবার এ বস্তুটি নিয়া কি করা হইবে, ইহাই তাঁহার জিজ্ঞাস্য।

ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন, "এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। এ হচ্ছে পবিত্র প্রসাদ। আপনি এখানকার সবাইকে এখনি বেঁটে দিন।"

নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হইল। প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ মহা আনন্দিত, আমসত্ত্বের গুণগানে সকলে মুখর হইয়া উঠিলেন। কাকের চঞ্চুবাহিত খাদ্যবস্তু বলিয়া কাহারো মনে কোন ঘৃণা বা সঙ্কোচের রেখাপাত হইল না।

কিছুদিন পরে ঠাকুর পাটনা জেলার একগ্রামে অপর এক ভক্তগৃহে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার আগমনে গৃহে আনন্দ কলরব পড়িয়া গেল।

---

*শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে—রবীন্দ্রনাথ রায়, হিমাদ্রি, ৭ই পৌষ, ১৩৬২।

গৃহস্বামিনী কিন্তু বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীরবে তাঁহার প্রণাম নিবেদন করিলেন। ভক্তিমতী এই মহিলার নয়নাশ্রু আর যেন বাঁধ মানিতে চাহে না, দুই চোখে আঁচল চাপিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে ঠাকুর কহিলেন, "আপনার সেদিনকার, আমসত্ত্বটুকু কিন্তু বড় উপাদেয় হয়েছিল। ভক্তেরা সবাই পরম আনন্দে প্রসাদ পেয়েছিলেন। কাকের ওপর আর অযথা ক্রোধ রাখবেন না, সেদিন সে তার কাজ নিষ্ঠার সাথেই করেছিল।" শেষের মন্তব্যটি করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আনন হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এই উক্তির অর্থ না বুঝিয়া সবিস্ময়ে তাকাইয়া আছেন।

ঐ কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা ভক্তটির চোখমুখের ভাব একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া তিনি পুলকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর প্রকৃত ঘটনাটি সকলের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিছুদিন আগে মহিলাটি যত্নসহকারে কিছু আমসত্ত্ব তৈরী করেন। মনে বড় আশা ছিল, ঠাকুর দয়া করিয়া এ গৃহে পদার্পণ করিলে তাঁহার ভোগ দিবেন। সেদিন এই আমসত্ত্ব রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছেন, হঠাৎ কোথা হইতে একটা কাক উড়িয়া আসিয়া উহা মুখে নিয়া প্রস্থান করে। ঠাকুরের ভোগের বস্তুটি এভাবে নষ্ট হওয়ায় এতদিন তিনি মরমে মরিয়া ছিলেন। এবার তাঁহার কথায় প্রাণ পাইলেন। বুঝিলেন, অন্তর্য্যামী গুরু শুধু ভক্তের অন্তরের আর্ত্তিই শ্রবণ করেন নাই, আপন যোগবিভূতির বলে ঐ দৈবী বায়স-দূতের মারফত আমসত্ত্বের ভোগ-উপকরণও নিজের কাছে আনাইয়া নিয়াছেন।

এই কৃপালীলার কাহিনী শুনিয়া উপস্থিত সকল ভক্তের চক্ষুই সেদিন অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছিল।

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগ ঠাকুরের অলৌকিক আবির্ভাবের বহু কাহিনী

শুনা যায়। শিষ্যদের আত্মিক জীবনের প্রয়োজনে তো বটেই, তাহাদের লৌকিক জীবনের কল্যাণেও মাঝে মাঝে তাঁহার এই ধরণের আবির্ভাব ঘটিতে দেখা যাইত।

ঠাকুরের আশ্রিত একটি ভক্ত পরিবারের সে সময়ে ভ্রাতাদের মধ্যে তীব্র মনান্তর চলিয়াছে। পরিবারটি বিত্তশালী, এই ভ্রাতৃবিরোধ শীঘ্র প্রশমিত না হইলে এক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইবে বলিয়া বন্ধু বান্ধবেরা আশঙ্কা করিতেছেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটি সেদিন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে তাঁহার গাড়ীতে চড়িতে যাইতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন, ঠাকুর ঐ গাড়ীর নিকটে দণ্ডায়মান। সে কি? এ সময়ে ঠাকুর এখানে? ভক্তটি বড় বিস্মিত হইলেন। তাইতো, তিনি যে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন সে খবরই তাঁহারা কেহ পান নাই।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঠাকুরকে তিনি প্রণাম করিলেন। সযত্নে তাঁহাকে গাড়ীতে নিয়া বসানো হইল। ক্ষণপরেই ঠাকুর জনান্তিকে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "রাজা ধৃতরাষ্ট্রের তো শতপুত্র ছিল। এদের স্বভাব চরিত্রের কুখ্যাতি আছে, নানা দুষ্কৃতির কথাও শোনা যায়। কিন্তু সারা মহাভারত খুঁজলেও এই একশ' ভা'য়ের আত্মকলহের কথা দূরে থাক মনান্তরের কথাটাও পাওয়া যায় না।"

পরম শান্ত, নির্ব্বিকার ঠাকুরের কথা কয়টি শাণিত ছুরিকার মত ভক্তের মর্ম্মমূলে গিয়া বিঁধিল। ছোট ভাইদের বিরুদ্ধে মনের অন্তস্তলে যে ঈর্ষা ও ক্রোধ এতকাল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, এক মুহূর্ত্তে তাহা কোথায় ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সুস্থতর ও সহজতর মন নিয়া তিনি ভ্রাতাদের আচরণের উপর করিলেন উদার দৃষ্টিপাত। ভ্রাতৃ-বিরোধের বিষবাষ্প মুহূর্ত্তে কোথায় উড়িয়া গেল।

ভক্তটির মন এখন একেবারে হালকা হইয়া গিয়াছে। তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন, বিত্তবিষয় সম্পর্কিত এই বিরোধের অবসান এবার না ঘটাইয়া ছাড়িবেন না।

ঠাকুরকে বসাইয়া রাখিয়া তিনি কয়েক মিনিটের জন্যে গাড়ী হইতে নামিলেন। একটা কাজের বিলি ব্যবস্থার কথা তাঁহার মনে ছিল না। বলিয়া গেলেন, এখনি কর্ম্মচারীদের উপযুক্ত নির্দ্দেশ দিয়া তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন।

ফিরিয়া আসিলে কিন্তু দেখা গেল, ঠাকুর গাড়ী হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার সম্ভাব্য স্থানগুলিতে অনেক খোঁজখবর করা হইল, কিন্তু তাঁহার কোন সন্ধানই আর মিলিল না। অবশেষে সকলের পরামর্শে ভদ্রলোকটি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত, কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য শ্রীসত্যেন মিত্রের নিকট সিমলায় চিঠি দিলেন। উত্তরে যাহা জানিলেন, তাহাতে বিস্ময় তাঁহার চরমে পৌঁছিল। শ্রীমিত্র লিখিয়াছেন, ঠাকুর গত মাসাধিককাল যাবৎ সিমলা পাহাড়ে তাঁহার ভবনে অবস্থান করিতেছেন এবং সেই দিন অবধি এই শৈলাবাস ছাড়িয়া অন্য কোথাও তিনি যান নাই।

মজঃফরপুরে শ্রীরোহিণী মজুমদারের বাসায় ঠাকুর সে-বার অবস্থান করিতেছেন। আরো কয়েকটি ভক্তও সেখানে উপস্থিত। অভ্যাগতদের জন্য রাত্রে মাংস রান্নার ব্যবস্থা হইয়াছে। সকলে খাইতে যাইবেন, এমন সময় ঠাকুর বলিয়া বসিলেন, "আমিও মাংস খাবো, আমায় দিন।"

গৃহকর্ত্রী তো একথা শুনিয়া মহা উল্লসিত। তখনই তাড়াতাড়ি এক বাটি মাংস আনিয়া দিলেন। সমস্তটা গলাধঃকরণ করিয়াই ঠাকুর কহিলেন, "আরো দিন, আরো চাই।"

রোহিণীবাবুর স্ত্রীর আনন্দের আর সীমা নাই। ঠাকুরকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতে বসিলেন। বাটির পর বাটি আসিতেছে, আর নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। এভাবে ঠাকুর সেদিন রান্নাকরা সবটা মাংসই উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন, আর একটুও কাহারো জন্য অবশিষ্ট রহিল না।

কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখা গেল, তাঁহার পেটে তীব্র বেদনা আরম্ভ

হইয়াছে। ঘন ঘন দাস্তও শুরু হইল। ক্রমাগত তিন দিন তাঁহাকে এই ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

সুস্থ হইবার পর ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "ঐ মাংস বিষাক্ত হয়েছিল, এ খেলে সেদিন অনেকেরই জীবনান্ত হতো।"

"ঐ মাংস ফেলে দিলেই হতো, তাহলে তো এত কষ্ট পোহাতে হতো না"—এ মন্তব্যের উত্তরে ফুটিয়া উঠে ঠাকুরের এক করুণাময় রূপ। মৃদু মধুর কণ্ঠে বলেন, "যেলে দিলে বেড়াল, কুকুর, কাক, এরা ঐ মাংস খেয়ে ফেলতো, কিন্তু ওরা যে কেউ বাঁচতে পারতো না।"

ভক্তদের ব্যাধি কখনো কখনো আকর্ষণ করিয়া ঠাকুর তাহা নিজ দেহে ভোগ করিতেন। কোন কোন ভক্তের মনে হইত, ঠাকুর তো শক্তিধর মহাপুরুষ, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই দুর্ভোগ এড়াইতে পারেন। তবে কেন তাহা করেন না?

ঠাকুরকে এ কথা নিয়া চাপিয়া ধরিলে তিনি কহিতেন, "ভোগ ছাড়া প্রারব্ধ দণ্ড খণ্ডন হয় না। যোগ বিভূতির বলে রোগ যন্ত্রণা সারালে, রোগ ঋণ জমা থেকেই যায়। পরে একদিন না একদিন এ ঋণ সুদে আসলে শোধ করতে হয়। তাই দেহের ভোগের ভেতর দিয়ে এ ঋণ একেবারে চুকিয়ে দেওয়াই ভাল।"

এই ধরণের আকর্ষিত ব্যাধি কোন কোন স্থলে একেবারে না চুকিয়া গিয়া পরে আবার তাঁহার দেহে আত্মপ্রকাশ করিত। ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়াছেন—

"একদিন আমার ৫০সি, বিডন ষ্ট্রীটের বাসায়, বৈঠকখানা ঘরে, প্রাতঃকালে আমি ও ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের কবিরাজ, জানকীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছিলাম। আমরা এক আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলাম। উভয়ে দেখিলাম যে, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে ধীরে ধীরে কতকগুলি গুটি উঠিয়া ঠাকুরের দুই হাত ও বুক ছাইয়া ফেলিল। কবিরাজ মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, এগুলি বসন্তের

গুটি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিকিৎসা বুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠিল। আমাকে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিয়া উঠিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন যে শীঘ্রই ঠাকুরের জন্য ঔষধ পাঠাইয়া দিবেন। কবিরাজ মহাশয় চলিয়া যাইতেই ঠাকুর মৃদু হাসিয়া আমাকে বলিলেন, 'উনি ঠিকই বলিয়াছেন, এগুলি বসন্তেরই গুটি। কিন্তু উনি অনর্থক ভীত হইয়াছেন। ঔষধের প্রয়োজন হইবে না এবং ইহা হইতে কাহারও কোন অনিষ্টেরও আশঙ্কা নাই।'

"এই কথা বলিয়া ঠাকুর আঙুল দিয়া গুটিগুলি আস্তে আস্তে টিপিতে লাগিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঘণ্টাখানেক পরে ঐগুলি নিঃশেষে মিলাইয়া গেল। আমি পীড়াপীড়ি করিয়া ধরাতে ঠাকুর স্বীকার করিলেন যে, বহুদিন পূর্ব্বে তিনি এক মরণাপন্ন বসন্তের রোগীকে নিরাময় করিয়াছিলেন এবং সেই রোগ এখনও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।"

চাঁদপুরে থাকাকালে ঠাকুর একবার মারাত্মক ব্যাসিলারী আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। স্থানীয় ডাক্তারদের চিকিৎসায় ফল হয় নাই, রোগী ক্রমে এক সঙ্কটের মুখে আসিয়া পড়িয়াছেন। এবার কলিকাতায় নিয়া চিকিৎসা না করাইলে নয়। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার, ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত ঠাকুরের এক পরম ভক্ত। টেলিগ্রাম পাইয়াই চাঁদপুরে আসিয়া ঠাকুরকে তিনি নিয়া গেলেন।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটি নাই, কিন্তু তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। ঠাকুর একদিন ডাঃ দাশগুপ্তের স্ত্রীকে অনুনয় করিয়া কহিলেন, একগ্লাস কাঁচা দুধ খাইলে তিনি ভাল হইতে পারেন। এ রোগযন্ত্রণা আর সহ্য হইতেছে না।

ব্যাসিলারী আমাশয় রোগে দুগ্ধ পথ্য! এই প্রস্তাব শুনিয়া তো সকলের চক্ষুস্থির! টেলিফোনযোগে তখনই ডাঃ দাশগুপ্তকে ঠাকুরের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইল। চিকিৎসক হিসাবে যে অভিমতই তিনি

পোষণ করুন না কেন, ঠাকুরের অলৌকিক শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় এই অন্তরঙ্গ ভক্তের কম জানা নাই। বাধ্য হইয়াই সেদিন তাঁহাকে প্রস্তাবিত পথ্য গ্রহণের অনুমতি দিতে হইল।

এক চুমুকে এক গ্লাস কাঁচা দুগ্ধ পান করিয়া ঠাকুর শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইলেন। পরের দিন দেখা গেল, তাঁহার দুঃসহ রোগ যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়াছে, দুরারোগ্য রোগের চিহ্নমাত্র নাই।

ডাঃ দাশগুপ্ত হাসিয়া সবাইকে বলিলেন, "কার চিকিৎসা আমি এ কয়দিন প্রাণপণে করে যাচ্ছি ?--দেখুন ঠাকুরের কাণ্ডখানা !"

নিজ সিদ্ধদেহে ভক্তবৎসল ঠাকুর ইচ্ছামত ব্যাধি আকর্ষণ করিয়া আনিতেন, ডাক্তার বৈদ্যেরা স্বভাবতঃই ইহার কার্য্যকারণ কিছু নির্ণয় করিতে পারিতেন না। আবার ভোগের মধ্য দিয়া 'রোগঋণ' শোধ হইয়া গেলে তাহা আপনা হইতেই নিরাময় হইয়া যাইত, কোন চিকিৎসা-বিধি বা ভেষজের অপেক্ষা রাখিত না।

ঠাকুরের এই সব রোগ-পর্ব্বের মধ্য দিয়া কখনো কখনো হাস্য কৌতুকের হাওয়াও বহিতে দেখা যাইত। তাঁহার বাতব্যাধিটি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। কিন্তু এ তাঁহার অতি পুরাতন ও পরিচিত রোগ, কাজেই ইহার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কবিরাজের পরামর্শ বড় একটা নেন না। অনেক সময় নিজের নির্দ্ধারিত পন্থাই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

একদিন পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে গিয়া দেখিলেন, বাতের অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিক্রেতারা এক বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়াছে। এ ঔষধ ব্যবহারে ফল না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে, একথাও লেখা আছে। ঠাকুর তখনি এক ভক্তকে ঔষধ বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম ধাম লিখিয়া দিলেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, শহরবাসী ভক্তটি টোটকা চিকিৎসায় মোটেই বিশ্বাসী নন, তবুও ঠাকুরের নির্দ্দেশমত ঔষধ তাঁহাকে আনিয়া দিতেই হইল।

বেশ কিছুদিন ঔষধটি ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু ফল কিছুই দেখা গেল না। ঠাকুর এবার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তবে তো ওদের এবার মূল্য ফেরৎ দেওয়া উচিত। যান, এবার টাকাটা ফেরৎ নিয়ে আস্থন তো।"

ভক্তটি ফিরিয়া আসা মাত্রই তিনি মহা ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, কই, টাকা পেলেন?"—যেন এই টাকা কয়টির উপর তাঁহার অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে।

"না, ওরা টাকা দেয়নি।"

"সে কি কথা? বিজ্ঞাপনের সর্ত্তে তো স্পষ্ট করেই লেখা আছে—ফল না দর্শিলে মূল্য ফেরৎ। তবে?"

"ওরা বললে, 'পরে চিঠি দিয়ে জানাবো'।"

কয়েকদিন পরে প্রত্যাশিত চিঠি আসিয়া গেল। ঠাকুর তাড়াতাড়ি চশমা চোখে দিয়া উহা পড়িতে বসিলেন।

উপস্থিত ভক্তের দল আগে হইতেই পত্রের মর্ম্ম জানেন, তাঁহারা সবাই মিটিমিটি হাসিতেছেন।

ঠাকুর পড়িলেন,—ঔষধ প্রস্তুতকারক লিখিয়াছেন, 'আমাদের ঔষধ মানুষের জন্য, দেবতার জন্য নহে। নিবেদন ইতি—ক্ষমাপ্রার্থী', ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এবার তিনি গম্ভীরভাবে পত্রটি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, বুঝেছি, এসব টাকা ফেরৎ না দেবার ফন্দী আর কি!"

কক্ষে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হাসির তরঙ্গ উঠিল।

ভক্তদের রোগ আকর্ষণ, লৌকিক জীবনের দুঃখ বেদনার নিরাকরণ, এসবের মূলে সদা জাগ্রত ছিল তাহাদের জন্য ঠাকুরের কল্যাণচিন্তা। ব্যবহারিক জীবনের দুঃখ তাপ, বাধা বন্ধন কাটাইয়া ভক্তেরা অধ্যাত্ম-জীবনের পথে আগাইয়া যাক—এই কামনাই সদা তিনি করিতেন। দেহরোগের মুক্তি ভবরোগের মুক্তির সহায়ক হইয়া উঠুক, সূক্ষ্মতর

লোকের দুয়ার তাহাদের জীবনে ধীরে ধীরে খুলিয়া যাক, ইহাই একান্ত-ভাবে চাহিতেন।

এই ভবরোগ মোচনের জন্য নিজে যাচিয়া ভক্তগৃহে গিয়াছেন, নিজে আগাইয়া আসিয়া নামমন্ত্র দিয়াছেন, এমনও ঘটিতে দেখা গিয়াছে। আর ইহার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মহা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অপার করুণা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য এক ভক্তিমান ব্রাহ্মণ। তরুণ বয়সেই অন্তরে তাঁহার মুক্তির কামনা জাগিয়া উঠে, গুরুকরণের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ব্যাকুল হইয়া একদিন তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন, মন্ত্রদানের জন্য ধরিয়া বসেন।

গোস্বামী প্রভু কহিলেন, "এখানে নয়, আপনার গুরু রয়েছেন অন্যত্র। কৃপালু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তিনি। যথা সময়ে আপনার কাছে উপস্থিত হবেন। স্বেচ্ছায়ই তিনি যাবেন, দেবেন আপনাকে মন্ত্র। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।"

ত্রিশ বৎসর পরের কথা। প্রসন্নবাবু তখন শ্রীহট্ট জেলার এক গ্রামে শিক্ষকতা করেন। একদিন হঠাৎ দেখেন, তাঁহার দুয়ারে এক অপরিচিত দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রশান্ত মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন। কাছে যাইতেই তিনি কহিলেন, "আমি এসেছি—আপনাকে মন্ত্র দিতে।"

প্রত্যয়ভরা কথা কয়টি প্রসন্নবাবুর অন্তরের অন্তস্তলে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। আগন্তুকের চোখ দুইটির দিকে তাকানো মাত্র কে যেন ভিতর হইতে বলিয়া দিল—' ওরে, ইনিই তোর সেই সংত্রাতা, গুরুদেব, যাঁর কথা গোস্বামীপ্রভু বলেছিলেন, যাঁর জন্য এই দীর্ঘকাল তুই অপেক্ষা করে আছিস।' প্রসন্নকুমার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করিলেন, দরদর ধারে ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রুধারা।

সেই দিনই এক শুভক্ষণে সস্ত্রীক তিনি মন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে জানিতে পারেন, অযাচিতভাবে আসিয়া যিনি আজ তাঁহাদের কৃপা করিলেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ রামঠাকুর।

নামনিষ্ঠা ও শরণাগতির উপর ঠাকুর সর্ব্বদাই জোর দিতেন। বিশেষতঃ গৃহী সাধকদের পক্ষে এই সাধন পন্থাকে তিনি বেশী উপযোগী মনে করিতেন। এই নামনিষ্ঠা ও অনন্যশরণ সাধককে কোন স্তরে উঠাইয়া দিতে পারে তাহার নিদর্শন ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত এক ভাগ্যবানের জীবনে দেখা গিয়াছিল।

একবার তিনজন ভক্তের সঙ্গে ঠাকুর ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। ষ্টীমার গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছামাত্র সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠিয়া তাঁহার বিছানা করিয়া ফেলিলেন। ট্রেন ছাড়ার আরো ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। ঠাকুরকে কামরায় বসাইয়া রাখিয়া সকলে রাত্রির ভোজন সমাধা করার জন্য হোটেলে চলিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, ঠাকুর নাই। এসময়ে হঠাৎ তিনি কোথায় গেলেন? ব্যাকুল হইয়া সকলে চারিদিকে খোঁজাখুজি শুরু করিয়া দিলেন, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না।

ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়াছে। কিন্তু ঠাকুরকে ফেলিয়া কি করিয়া যাওয়া যায়? দুইজন ভক্ত তাড়াতাড়ি মালপত্র নিয়া নামিয়া পড়িলেন, তাঁহারা এখানেই অপেক্ষা করিবেন।

সারা রাত্রি প্রতীক্ষা ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। ভক্তদ্বয় নিরাশ হইয়া স্টেশনে বসিয়া আছেন, ভোর বেলায় ঠাকুর দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে দশ বারো বৎসরের একটি বালক।

সঙ্গী ভক্তদের কহিলেন, "আপনাদের কাছে রাহাখরচ বাদে আর যা আছে, তাড়াতাড়ি বার করুন।"

টিকেট আগে হইতে কাটাই আছে, দুই এক টাকা হাতে রাখিয়া তাঁহারা সবই ঠাকুরের হাতে দিয়া দিলেন। ঠাকুরও তখনি তাহা সঙ্গী বালকটির হাতে গুঁজিয়া দিলেন। প্রণাম নিবেদন করিয়া নীরবে সে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেদিনকার এক মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা বিবৃত করিলেন—

ঠাকুরের এক পুরাতন ভক্ত গোয়ালন্দের কাছাকাছি কোন গ্রামে বাস করিতেন। স্ত্রী ও দুইটি নাবালক পুত্র নিয়া তাঁহার সংসার। এই পরিবারের স্বচ্ছলতা কোন দিনই নাই। ভক্তটির বাঁধাধরা কোন উপার্জ্জন নাই, যখন যা কিছু অর্থ জুটে তাই দিয়া অতি কষ্টে দিন চলে। সম্পদের মধ্যে—একনিষ্ঠা ভক্তি ও গুরুর পদে আত্মসমর্পণ। ঠাকুরের কাছ হইতে নাম নিবার পর হইতে দীর্ঘ দিন তিনি এই নামাশ্রয়েই রহিয়াছেন। কৃপাময় ঠাকুরকেও পাইয়াছেন তাঁহার অন্তরের মধ্যে। জীবনে একটিবার মাত্র গুরুকে দর্শনের পর হৃদয় মন্দিরে করিয়াছেন তাঁহার অচল প্রতিষ্ঠা। বাহিরের খোঁজাখুজিও তাই চিরতরে শেষ হইয়া গিয়াছে।

এই দিনই রাত্রে ভক্তটির অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। বিদায় ক্ষণে পরমাধ্য গুরুর চরণলাভের আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে, সেই আশা পূরণের জন্যই ঠাকুর আজ সেখানে গমন করেন।

তাঁহাকে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুপথযাত্রী ভক্তের হৃদয় উদ্দীপিত হইয়া উঠে। প্রণামান্তে নিজ শয্যাতেই আসন পাতিয়া তাঁহাকে জানান অভ্যর্থনা। তারপর স্ত্রী-পুত্রদের কাছে ডাকিয়া শান্ত স্বরে বলেন, "তোমরা দেরী করো না, খাওয়া-দাওয়া সব এখনই শেষ করে এসো। আমার কিন্তু আর সময় নেই।"

সকলে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যায়। ভক্তপ্রবর এবার নিবেদন করেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, গুরুদেবের পদতলে মস্তক রাখিয়া পরমানন্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এ প্রসঙ্গে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন,—"ঠাকুরের শ্রীমুখে এই ঘটনার বিবরণ শুনিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। এক নিতান্ত অসহায়া, নিঃসম্বলা নারী দুইটি নাবালক পুত্র লইয়া বিধবা হইতে চলিয়াছে কিন্তু সেজন্য তাহার যেন কোন উদ্বেগই নাই, শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত স্বামীর আদেশ পালন করিয়া যাওয়াই যেন তাহার একমাত্র লক্ষ্য। নাবালক পুত্র দুইটিও অকাতরে মায়ের এবং ঠাকুরের

নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতেছে, তাহাদের যে কতবড় ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল, তাহা যেন তাহারা কিছুই বুঝিল না, কান্নাকাটি, হা-হুতাশ, আকুলি বিকুলি প্রভৃতি শোকের সাধারণ লক্ষণগুলি যেন লজ্জায় দূরে পলাইয়া গেল। ভগবৎ-কৃপা যেখানে প্রত্যক্ষ, কেবলমাত্র সেখানেই ইহা সম্ভব, অন্যত্র এরূপ অবস্থা কল্পনাও করা যায় না।

"ঐ ভদ্রলোকের কথা ভাবিয়াও আশ্চর্য হইয়া গেলাম। জীবনে একবার মাত্র ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখের দুই চারিটি কথা শুনিয়াই চিরদিনের জন্য তাঁহার সকল প্রশ্ন মিটিয়া গিয়াছিল। তদবধি ঠাকুরের বাক্য ধরিয়াই পড়িয়া ছিলেন, অপর কোন কিছুতেই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ''গুরুর বাক্যই গুরু', এ কথার তাৎপর্য্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের পিছু পিছু ঘুরিবার প্রয়োজনও অনুভব করেন নাই এবং আমাদের মত উৎসব, আশ্রম, কীর্ত্তন প্রভৃতিতে মাতিয়া আসর সরগরমের চেষ্টাও কখন করেন নাই। (ভূমিকা ঃ বেদবাণী—২য় খণ্ড)

এই অনন্যশরণ ও একনিষ্ঠাকেই ঠাকুর বলিতেন পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম। জনজীবনের সম্মুখে সাধনতত্ত্বের এই মূল সূত্রটিকেই তিনি বার বার তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই নিষ্ঠার বিচ্যুতি দেখিয়া ঠাকুর একবার এক প্রিয় ভক্তগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন।

রাজপুতনার কোন গ্রামে সে-বার তিনি বৎসরখানেক অবস্থান করেন। এক নিঃসন্তান রাজপুত দম্পতি তাঁহার পরম ভক্ত। ঠাকুরের প্রতি তাহাদের নিবিড় বাৎসল্যভাব। গোপাল-জ্ঞানে উভয়ে তাঁহার সেবা যত্ন করে। সম্পন্ন গৃহস্থ, বাড়ীতে গো-মহিষের অভাব নাই। প্রচুর দধি দুগ্ধ মাখন রোজ তৈরী হয়। দুই বেলাই এই সব উপাদেয় খাদ্য থরে থরে সাজাইয়া ঠাকুরকে তাহারা ভোজনে বসায়।

স্বামী স্ত্রী উভয়েরই একান্ত ইচ্ছা 'গোপাল' তাহাদের সম্মুখে বসিয়া তৃপ্তি সহকারে ক্ষীর ননী দধি দুগ্ধের পাত্র উজাড় করে, আর এ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের নয়ন সার্থক হয়।

ঠাকুর কিন্তু তাহাতে রাজী নন। স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন, ভোজন-পর্ব্ব তিনি নিভৃতেই সমাধা করিবেন। কাহারো সে সময়ে বসিয়া থাকা চলিবে না। আহার্য্য সাজানো হইলেই ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দেন। আধঘণ্টা খানেক পরে বাহির হইয়া আসিলে দেখা যায়, ভোজন পাত্রের সবই নিঃশেষ হইয়াছে, শুধু ভক্ত দম্পতির জন্য পড়িয়া আছে সামান্য কিছু মিষ্টি প্রসাদ।

খাদ্য সামগ্রী প্রতিদিন বেশ প্রচুর পরিমাণেই দেওয়া হয়, পাতে অবশিষ্টও তেমন কিছু থাকে না। অথচ ঠাকুরের হাবভাবে চেহারায় এই গুরুভোজনের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। ভক্ত রাজপুত ও তাহার স্ত্রী সন্দিহান হইয়া পড়ে। নিশ্চয় এই ভোজনক্রিয়ার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য রহিয়াছে।

কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিলে একদিন গোপনে তাহারা গবাক্ষের ছিদ্রপথে উঁকি দেয়। নয়ন সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয় এক অভাবনীয় দৃশ্য! ঘরের কপাট জানালা সবই বন্ধ, অথচ কোথা হইতে সেখানে হঠাৎ আবির্ভূত হন এক বিশালকায় মহাপুরুষ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিপুল পরিমাণ খাদ্যসম্ভারের প্রায় সবটা তিনি উদরসাৎ করিয়া ফেলেন। তারপর যেমনি আকস্মিকভাবে আসিয়াছিলেন, তেমনিভাবে হন অন্তর্হিত।

ভক্ত দম্পতি ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক!

ঠাকুর ভোজন সমাধা করিয়া বাহির হইলে এই রহস্যময় পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল। বলা বাহুল্য, তাঁহার নিষেধাজ্ঞা না মানায় ঠাকুর রুষ্ট হইয়াছেন। তখনকার মত প্রশ্নটি তিনি কৌশলে এড়াইয়া গেলেন। সেই দিনই রাত্রে দেখা গেল, সকলের অগোচরে ভক্ত দম্পতির বড় সাধের 'গোপাল' কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন।

এই বিচ্ছেদের আঘাত রাজপুত গৃহস্থ ও তাহার স্ত্রীর কাছে সেদিন মর্ম্মান্তিক হইয়া বাজে। চোখের জলে উভয়ে বুক ভাসাইতে থাকে। রামঠাকুর সেদিন তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন, শরণাগতির ধর্ম্মে কোন

সন্দেহ, সংশয় বা অযথা কৌতূহলের স্থান নাই।*

ঠাকুর যেখানেই থাকিতেন তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া নানা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হইত। আর এ সময়ে প্রায়ই তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সামনে তুলিয়া ধরিতেন ধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ, পন্থা ও সাধনজীবনের প্রকৃত মূল্যমান।

সেদিন সন্ধ্যায় কলিকাতার এক ভক্তগৃহে তিনি বসিয়া আছেন। বহু ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট। সবারই দৃষ্টি এই অলোকসামান্য মহাপুরুষের দিকে নিবদ্ধ। মৃদু মধুর কণ্ঠে দুই চারিটি কথার তিনি উত্তর দিতেছেন, আর চাতকের মত ভক্তেরা তাহা পান করিতেছে। আনন্দ ও প্রশান্তি সারা কক্ষে বিরাজমান।

ঠিক এই সময়ে বর্ষীয়ান এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন। উভয়েরই বেশভূষা ও চাল চলনে আভিজাত্যের ছাপ।

ঠাকুরের তক্তাপোষের কাছে ঘেঁষিয়া আগন্তুক উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এবার আমি জজ হয়েছি।"

কথা কয়টির আকস্মিকতা ও তির্য্যকভঙ্গিতে অনেকেই চমকিয়া উঠিয়াছেন। পবিত্র শান্ত পরিবেশের মধ্যে এ যেন এক ছন্দপতন!

কোন উত্তর না দিয়া ঠাকুর নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া রহিলেন। এ সময়ে তিনি কানে কিছুটা কম শুনিতেন, আগন্তুক ভাবিলেন, তাঁহার কথা ঠাকুর হয়তো ধরিতে পারেন নাই। এবার তাই আরো উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিলেন, "বাবা, আমি জজ হয়েছি।"

"কি বলছেন, মুন্‌সেফবাবু? কানে আজকাল তেমন শুনতে পাইনে কিনা।"—বলিয়াই ঠাকুর আবার নীরব।

বেগতিক দেখিয়া গিন্নি এবার কর্ত্তার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন। ঠাকুরের কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া চেঁচাইয়া কহিলেন, "বাবা, আপনার কৃপায় উনি এখন জজ হয়েছেন।"

---

* রামঠাকুরের কথা—ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবার আর ঠাকুরের দিক দিয়া কানে কম শোনার অভিনয় করা চলিল না। কহিলেন, "উত্তম কথা। কিন্তু আপনারা আমায় এখন কি করতে বলছেন ?"

"ওঁর বহুমূত্র রোগটা আজকাল বড় বেড়ে গিয়েছে। ভুগে ভুগে সারা—শরীরে কিচ্ছু নেই। আপনি দয়া করে যা-হয় এর একটা বিহিত করুন।"

"জজ সাহেবদের জন্য তো শুনেছি, সিবিল সার্জ্জন থাকে। তার কাছেই বরং যান। আমি ডাক্তার নই। শুধু শুধু কেন এসেছেন ? আমি তো কিছু করতে পারিনে।"

কর্ত্তা ও গিন্নি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। মুখে আর কোন শব্দ যোগাইল না।

শক্তি ও জ্ঞানের চূড়ায় যে ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ সদা অধিষ্ঠিত, তাঁহার কৃপাপ্রার্থী মানুষের একমাত্র পরিচয়—সে আর্ত্ত, শরণাগতির জন্য সে আকুল, অধীর। সেদিনকার এই প্রত্যাখ্যানের ভিতর দিয়া ঠাকুর শুধু আগন্তুক দম্পতিকেই নয়, সমাগত অন্যান্য ভক্তদেরও এ তত্ত্বটি বুঝাইয়া দিলেন।

ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য চাটগাঁ শহরে আসিয়াছেন। ভক্তদের মধ্যে আলোড়ন পড়িয়া গেল। অনেকেই আমন্ত্রণ জানাইয়া গেলেন, একবারটি তাঁহাদের গৃহে ঠাকুরকে অবশ্যই পদার্পণ করিতে হইবে। তাঁহাদের বিশ্বাস, ঠাকুরের পবিত্র পদরজ সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ বহন করিয়া আনে।

এখানকার এক মুন্সেফ ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত। ঠাকুরকে তাঁহার নিজের ভবনে নিবার জন্য তিনিও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বহু অনুরোধ উপরোধের পর ঠাকুরকে কথা দিতে হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার শুভাগমন হইয়াছে। বেশীক্ষণ বসিবার উপায় নাই, অন্যান্য ভক্তদের বাড়ীতেও যাইতে হইবে। মহা উৎসাহের

সহিত ভক্তটি ঠাকুরকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সুসজ্জিত কামরাগুলি দেখাইতে লাগিলেন।

তারপর শয়নগৃহে তাঁহাকে নিয়া আসিয়া কহিলেন, "বাবা আমাদের পরম সৌভাগ্য, আপনি আজ এসে দর্শন দিয়েছেন। সব চাইতে আনন্দের কথা, এ বাড়ীর সবগুলো ঘরেই আপনার চরণধূলি পড়লো। এবার একটু এদিকে এগিয়ে আসুন।"

কক্ষের এককোণে স্থাপিত একটি লোহার সিন্দুক। সেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তটি কহিলেন, "এবার যে আরো একটু কষ্ট আপনাকে করতে হবে, বাবা। দয়া করে এই সিন্দুকটির ওপর আপনার চরণ স্পর্শ দিন।"—মনোগত ভাব, দেবপ্রতিম ঠাকুরের চরণধূলি একবার পড়িলে লক্ষ্মী অচলা হইবেন, লোহার সিন্দুক সোনা-দানায় ভরিয়া উঠিবে।

"তাহলে যে ওর ভেতরে রাখবার মত কিছুই আর থাকবেনা। টাকাকড়ি সব মুক্তি পেয়ে যাবে সিন্দুকের বন্ধন থেকে।"

একি আতঙ্ককর উক্তি ঠাকুরের! মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেকে সামলাইয়া নিয়া ভক্তটি ঠাকুরসহ সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

আশ্রিত মানুষের মুক্তি সাধনের, সর্ব্ব পাশবন্ধন ও মায়ামোহ মোচনের ব্রত যিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকে দিয়া সিন্দুকের টাকা বাড়ানোর প্রয়াস যে কত বড় নির্ব্বুদ্ধিতা সকলে তাহা চকিতে বুঝিয়া নিলেন।

ঠাকুরের একবার কয়েকদিনের জন্য ঝোঁক হইল, তিনি ধূমপান করিবেন। প্রবল উৎসাহে একটির পর একটি সিগারেট ধরাইতেছেন, আর ধোঁয়া ছাড়িতেছেন। ভক্তেরা সকলে অবাক। এসব নেশা তো তাঁহার কখনো দেখা যায় না। কি উদ্দেশ্যে এই খেয়ালিপনা, এই সিগারেট-লীলা—তাহা কে বলিবে?

ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সোৎসাহে তামাকুর পক্ষ সমর্থনে

লাগিয়া গেলেন। কহিলেন, ইহার ধোঁয়া দাঁত ও মাঢ়ি শক্ত করে, ব্যথা বেদনাও সারায়। তবে ধোঁয়াটা গলাধঃকরণ করা ভালো নয়, মুখবিবরে একটু ধরিয়া রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, পাকা তাম্রকূটসেবীরা ধূমপানের এই রীতি মানিতে রাজী নন, তাঁহারা মুচকি হাসি হাসিতে লাগিলেন।

মুহুর্মুহু ধূম্র উদ্‌গীরণ চলিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ সেখানে এক অপরিচিত সাধু আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। জ্বলন্ত সিগারেটটি মুখে ধরা ছিল, তাড়াতাড়ি সেটি নিভাইয়া এক পাশে লুকাইয়া ফেলিলেন। ধূম্রপায়ী বালক হঠাৎ অভিভাবকের সম্মুখে পড়িয়া গেলে যেমন ভীত ও জড়সড় হয়, অনেকটা সেই রকম ভাব।

ভক্তিভরে ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া ঠাকুর সাধুটিকে প্রণাম করিলেন। এবার অপাঙ্গে চাহিলেন ভক্তদের দিকে। তাঁহার ইঙ্গিতে কয়েকটি ভক্ত তাড়াতাড়ি এ সাধুকে কিছু প্রণামীও দিলেন। সারা ঘর ভয়ে ভক্তিতে সন্ত্রস্ত। ঠাকুর যাঁহাকে এত শ্রদ্ধা দেখাইতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই কোন উচ্চ স্তরের ব্রহ্মবিদ্ সাধক।

সাধুটি প্রস্থান করামাত্র ভক্তেরা প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এতক্ষণ সকলে কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না।

"ঠাকুর, ইনি কোন মহাত্মা? এঁকে দেখেই আপনি এতো লজ্জা পেয়ে সিগারেট লুকিয়ে ফেললেন কেন?"

সকলের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া তিনি নির্ব্বিকারভাবে বলিলেন, "ওঁকে তো চিনি না।"

ভক্তদের উচ্চ হাস্যে কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ছাখো দেখি ঠাকুরের কাণ্ড! কোথাকার কোন এক অজানা সাধুকে আজ নিজের অভিভাবক করে ফেলেছিলেন।"

ভক্তেরা একটু শান্ত হইলে ঠাকুর ধীর গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "সর্ব্বদা জেনে রাখবেন, গেরুয়া বসন ত্যাগের প্রতীক, সন্ন্যাসীর ভূষণ,

তাকে সম্মান দেখাতে হয়। দেখেছেন তো, সেনাপতির পোশাকটি নজরে পড়া মাত্র সৈন্যেরা কুর্নিশ দেয়। পোশাকটা কে পরেছে তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় না।”

শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা দানের এই উদার নীতি ও মনোভাবের কথা ভক্তেরা নূতন করিয়া ভাবিতে বসিলেন। ব্রহ্মবিদ্ ঠাকুর সর্ব্বপ্রকার লৌকিক কর্ম্ম ও দায়িত্বের উর্দ্ধে অধিষ্ঠিত, তবুও আজিকার এই আচরণের মধ্য দিয়া ভক্তদের মনে শ্রদ্ধাদানের এক নূতনতর চেতনা তিনি আনিয়া দিলেন।

উদার মানবধর্ম্মে ঠাকুর বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তাঁহার দৃষ্টিও ছিল সর্ব্বজনীন। সে দৃষ্টির সমক্ষে জাতি, বর্ণ ও সমাজের ভেদ বৈষম্যের রেখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

কলিকাতায় ঠাকুর তখন এক ভক্তের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। দর্শনের জন্য দলে দলে লোক ভীড় করিতেছে। এই সঙ্গে কয়েকটি বারাঙ্গানাও আসিয়া উপস্থিত।

গৃহস্বামী বাঁকিয়া বসিলেন, কিছুতেই ঠাকুরের কাছে ইহাদিগকে যাইতে দেওয়া হইবে না। দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মেয়ে কয়টি বড় মর্ম্মাহত হইয়াছে। আশাভঙ্গ হওয়ায় কেহ কেহ কাঁদিয়াও ফেলিল।

দয়ার্দ্র হইয়া একটি ভক্ত ঠাকুরকে ঘটনাটি নিবেদন করিলেন। শোনামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, “আমি অন্ধ, আমি তো চোখে দেখি না। তাই আপনাদের উঁচু নীচু ভাল মন্দ আমার কাছে নেই। তারা যখন এত করে আসতে চায়, আপত্তি না করাই ভাল।”

এবার গৃহস্বামীর হুঁস হইল। বারবনিতাদের দরজা ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু বারবার সাবধান করিয়া দিলেন, দূর হইতেই যেন তাহারা পুষ্পাঞ্জলি দেয়; কাহাকেও ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিতে দেওয়া হইবে না।

নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাহারা দূর হইতেই ঠাকুরের চরণে ফুল ও ফুলের মালা ঢালিয়া দিল।

কৃপালু ঠাকুর কিন্তু উপস্থিত সকলকেই করিলেন বিস্মিত। নিবেদিত কয়েকটি ফুল চরণতল হইতে কুড়াইয়া নিয়া এই বারনারীদের মাথায় দিলেন। তারপর প্রত্যেকের মাথায় কল্যাণহস্তটি স্পর্শ করাইয়া দিলেন তাঁহার অন্তরের স্নেহাশীষ।

গৃহস্বামী ভক্তটি এই ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষের সমদর্শিতার কথা ভুলিয়া বসিয়াছিলেন। এবার তিনি বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন।

কলিকাতায় সেবার তীব্র শীত পড়িয়াছে। ঠাকুর এসময়ে এক বিশিষ্ট ভক্তের গৃহে বাস করিতেছেন। ভক্তটি ইতিমধ্যে ঠাকুরের জন্য একটি মূল্যবান শীতবস্ত্র কিনিয়া আনিয়াছেন। সেদিন সযতনে উহা তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া তিনি এক তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

পরদিন ভোর বেলায় বাড়ীর ভৃত্যটি ঠাকুরের কামরা ঝাঁট দিতে আসিয়াছে। এই শীতে বেচারীর গায়ে কোনই আচ্ছাদন নাই। ঠাকুর সস্নেহে তাহাকে কাছে ডাকিয়া তখনি দামী আলোয়ানটি দিয়া দিলেন। ভৃত্যের কোন আপত্তিই গ্রাহ্য করিলেন না, নানাভাবে আশ্বাস দিয়া এটি তাহাকে নিতে বাধ্য করিলেন।

ভৃত্যের কাঁধে এ শীতবস্ত্রটি দেখিয়াই তো গৃহকর্ত্রী ক্রোধে অধীর। গলার সুর সপ্তমে চড়াইয়া কহিলেন, "তুই কোন্ সাহসে ঠাকুরের কাছে এটা চাইতে গিয়েছিস, বল।"

"আমি কেন চাইতে যাবো মা? তিনি নিজেই যে, বলে কয়ে আমায় এটা গছিয়ে দিলেন।"

শীতবস্ত্রটি কাড়িয়া নিয়া গৃহকর্ত্রী তখনই ঠাকুরের কক্ষে ছুটিয়া গেলেন, তাঁহাকে এটি ফিরাইয়া দিবেন।

স্থির দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে তাকাইয়া ঠাকুর কহিলেন, "তা কি করে হয়? দান করা জিনিস তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।"

উত্তেজনাবশে গৃহস্বামিনীর মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না। ঠাকুরের বিছনার এক পাশে আলোয়ানটি রাখিয়া দিয়া তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সেইদিনই কি এক অজুহাত দেখাইয়া ঠাকুরের এই ভক্তগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

হিন্দু ও মুসলমানের কোন পার্থক্য ঠাকুরের কাছে ছিল না, সমভাবে তিনি সবাইকে ভালবাসিতে জানিতেন। তাঁহার উৎসব অনুষ্ঠানগুলিতে মুসলমান ভক্তেরাও সোৎসাহে যোগ দিতেন, ভক্তি ও প্রীতি নিয়া আগাইয়া আসিয়া এই, সব অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতেন।

মুসলমান ভক্ত চেরাগ আলির জীবনে ঠাকুরের কৃপার ধারা একদিন অহেতুক ভাবেই নামিয়া আসে, তাঁহাকে করে কৃতকৃতার্থ। সে-বার ঠাকুর একদল ভক্তসহ ডিঙামাণিক-এ আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হইল নাম কীর্ত্তন ও আনন্দোৎসব। সকলের সাথে, ঠাকুরের দর্শনের জন্য চেরাগ আলিও আসিয়াছেন। গৃহ অঙ্গন লোকে লোকারণ্য, এই ভীড়ে ভিতরে প্রবেশ করা, ঠাকুরের দর্শন পাওয়া সুকঠিন। ভক্ত চেরাগ তাই নিকটস্থ পুকুর পাড়ে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। এক মনে চলিতেছে ঠাকুরের স্মরণ মনন।

হঠাৎ এক সময়ে অন্তর্য্যামী ঠাকুর একটি ভক্তকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "চেরাগ আলি পুকুরের ধারে বসে আছে। তাকে শীগ্‌গির এখানে ডেকে আনুন।"

তখনি ভীড় ঠেলিয়া এই ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানকে ঠাকুরের সম্মুখে হাজির করা হইল। কৃপালু ঠাকুর তাঁহাকে পরম সমাদরে নিকটে বসাইলেন। স্মিত হাস্যে কহিলেন, "একি? আপনি আমার বাড়ীতে এসে বাইরে বসে আছেন কেন? আপনি কি আমার পর? আপনার সঙ্গে যে আত্মীয়তা রয়েছে। সম্পর্কে আপনি তালৈ হন।"

গ্রামজীবনের পাতানো সম্পর্ক টানিয়া আনিয়া ঠাকুর এক অন্তরঙ্গ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিলেন। ভক্ত চেরাগের নয়ন দুইটি ততক্ষণে ভাবাবেগে অশ্রুসজল হইয়া আসিয়াছে। ভক্তিভরে ঠাকুরের চরণে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন। এবার ঠাকুর তাঁহাকে দিলেন নামমন্ত্র।

চেরাগের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল অপার বিস্ময়। একি! এ মন্ত্র যে কিছুদিন আগেই তিনি স্বপ্নযোগে পাইয়াছেন!

নাম পাইবার পর যখন বাহিরে আসিলেন, তখন তিনি এক নূতন মানুষ। সারা দেহ পুলকাঞ্চিত, ভাবতরঙ্গে থরথর করিয়া অবিরত কাঁপিতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুই চোখ হইয়াছে রক্তিম, নিরন্তর বহিতেছে প্রেমাশ্রুর ধারা। ঠাকুরের ভক্তদের দর্শন পাইলেই আনন্দে বক্ষে জড়াইয়া ধরেন। নামজপে থাকেন তিনি সদা বিভোর।

ঠাকুরের জন্মভূমি, ডিঙামাণিক-এ ভক্তগণ সে-বার তাঁহার জন্মোৎসব করিতেছেন। হরিনাম আর মৃদঙ্গ-করতালের ঝঙ্কারে সারা গ্রাম মুখর হইয়া উঠিয়াছে। হাজার হাজার ভক্ত সেদিন সেখানে উপস্থিত। ডক্টর ইন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো কয়েকজন বাড়ীর হাতার বাহিরে বসিয়া নানা আলাপ আলোচনা করিতেছেন। সহসা সকলের দৃষ্টি পড়িল অদূরে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট এক মুসলমান চাষীর উপর। হাতে একটি পুঁটলি নিয়া চুপচাপ আপন মনে সে বসিয়া আছে।

প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, এই পুঁটলিতে সে সযত্নে বহিয়া আনিয়াছে কয়েকটি আম, কলা ও কিছু পরিমাণ চাল। ঠাকুরকে এগুলি নিবেদন করিতে চায়। কিন্তু এত ভক্তের ভীড় দেখিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে সাহস পায় নাই।

ইন্দুবাবু তখনি তাড়াতাড়ি জিনষগুলি ঠাকুরের ভোগের জন্য দিয়া আসিলেন। তারপর এই দরিদ্র, নিরক্ষর চাষীটির সাথে শুরু করিলেন গল্পগুজব। লোকটি এই গ্রামেরই অধিবাসী। ঠাকুরের সে প্রায় সমবয়সী, একসঙ্গে বাল্যকালে ডাণ্ডাগুলীও খেলিয়াছে। পরবর্তী

কালেও উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ কম হয় নাই।

ইন্দুবাবু প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা মিঞা ভাই, ঠাকুরকে তো এতদিন ধরে তুমি দেখে আসছো। কিন্তু বুঝলে কি?"

"কর্ত্তা, এসব মানুষ আসে এক একটা ঝিলিকের মত, আবার ঝিলিকের মত যায়। কারুর কিছু বোঝ্‌বার যো নাই"—সহজ সরল তাহার উত্তর।

"যদি কিছু না-ই বুঝে থাকো, তবে ঠাকুরের কাছে আসতে যেতে কেন? তাঁকে দেখার জন্য ব্যস্তই বা হতে কেন?"

"তাঁকে দেখতে ভাল লাগতো, কথা শুনতে ভাল লাগতো, তাই বারবার আসতাম।"

"এই যে তুমি তাঁর ভোগের জন্য চাল, কলা, আম এসব নিয়ে এসেছ, তোমার গুনাহ্‌ হবে না? মৌলভী সাহেবেরা গাল দেবে না?"

"গুনাহ্‌ হবে কেন কর্ত্তা? তিনি তো হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। দেখেছেন তো, একটা উঁচু টিলার ওপর বসলে নীচের সবই দেখা যায় সমান। ঠাকুরও যে ঐরকম টিলায় বসে আছেন।"

সকলে অবাক হইয়া গিয়াছেন। ভাবিতেছেন, ঠাকুরের কৃপায় এই নিরক্ষর চাষীর মধ্যে যে বোধের স্ফুরণ হইয়াছে, কয়জন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভক্ত তাহার গৌরব করিতে পারেন?

ঠাকুর ছিলেন প্রাণসুন্দর। তাই শুধু মানুষই নয়, বিশ্বের সকল প্রাণীর সহিতই ছিল তাঁহার নিবিড় আত্মীয়তার যোগ।

তিনি তখন নোয়াখালির চৌমহনীতে। একদিন ঘরের ভিতর শয্যায় শুইয়া কিছুটা বিশ্রাম করিতেছেন। সম্মুখেই কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত উপবিষ্ট। কি জানি কেন, বাড়ীর কুকুরটি সেদিন অনবরত ঘেউ-ঘেউ করিয়া চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ কি ভাবিয়া সে ঠাকুরের শয়ন-গৃহে ঢুকিয়া পড়িল। ভক্তদল সম্মুখে বসিয়া আছেন, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, অবলীলায় তাঁহাদের ডিঙাইয়া সোজা সে ঠাকুরের

কাছে গিয়া উপস্থিত। সম্মুখের পা দুইটি খাটের উপর তুলিয়া দিয়া নির্নিমেষে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কি যেন এক কষ্টের কথা এই কৃপালু মহাপুরুষকে সে নিবেদন করিতে চায়। ক্ষণপরেই ভক্তমণ্ডলীকে ডিঙাইয়া কুকুরটি আবার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঠাকুর অমনি ভক্তদের প্রশ্ন করিলেন,"আপনারা কি বলতে পারেন, এখানে পশুরোগের কোন ডাক্তার আছে ?"

"না বাবা, এখানে সে রকম কেউ নেই। আছে নোয়াখালি শহরে।"

"আপনারা কেউ এখানকার কিচ্ছু দেখাশোনা করেন না। এই তো, কতকগুলো বাজে জিনিস কুকুরটাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল, গলায় কাঁটা বিঁধে গিয়েছে।"

কথা কয়টি বলার অব্যবহিত পরেই দেখা গেল, কুকুরটি শান্ত হইয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, তাহার সঙ্কট কাটিয়া গেল।

কুকুরটির কিন্তু সেদিন বুঝিয়া নিতে ভুল হয় নাই যে, এই জনবহুল গৃহে ঠাকুরই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাহার এই কণ্টক উদ্ধার করিতে সমর্থ।

ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন,—প্রাণের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া নিতে পারিলে সকল প্রাণীই আত্মীয় হইয়া যায়। ভক্তেরা একথার চাক্ষুষ প্রমাণ সেদিন পাইলেন।

পশু ও সরীসৃপেরাও অনেক সময় প্রয়োজনমত ঠাকুরের সেবা করিতে আগাইয়া আসিত। একবার বৃন্দাবনে অবস্থান করিবার সময় ঠাকুরের পুরাতন বাতরোগটি আত্মপ্রকাশ করে। এবারকার আক্রমণ বড় তীব্র, তাঁহাকে প্রায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে।

যন্ত্রণা দুঃসহ হইয়া উঠিলে দেখা যাইত, কোথা হইতে একটি হনুমান তাঁহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়। বেশ কিছুক্ষণ ঠাকুরের পদসেবা করে, এবং বেদনার উপশম হইলে স্বস্থানে চলিয়া যায়।

চলৎশক্তি রহিত ঠাকুরকে এই হনুমানটি অনেক সময় কলসী হইতে জল গড়াইয়াও দেয়।

দামিনী-মা ছিলেন ঠাকুরের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবিকা। ভবানীপুরে বকুলবাগানে এক ক্ষুদ্র মাটির ঘরে তিনি বাস করিতেন। কৃচ্ছ্রসাধন ও কাঠোর তপস্যার মধ্য দিয়া এই সাধিকা ঠাকুরের যথেষ্ট কৃপা প্রাপ্ত হন, কিছু কিছু যোগ বিভূতিও অর্জ্জন করেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে এই ভক্তের কুটিরে পদার্পণ করিতেন। দুই-দশদিন ইঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া আবার স্বেচ্ছামত কোথায় চলিয়া যাইতেন।

দামিনী-মার ঘরের মেঝেতে ছিল বড় বড় কয়েকটি গর্ত্ত। এখানে দুইটি বৃহদাকার সর্প বাস করিত। তিনি আদর করিয়া ইহাদের নাম রাখিয়াছিলেন—কানাই নিতাই। উত্তরকালে ঠাকুর ভক্তদের কাছে এই সর্প দুইটির নানা কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বলিতেন।

দুপুর বেলায় গ্রীষ্মের রৌদ্র এক একদিন অসহ্য হইয়া উঠিত। কানাই নিতাই কিন্তু এসময়ে তাহাদের ঠাণ্ডা, আরামপ্রদ আশ্রয়ে কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকিতে চাহিত না। ধীরে ধীরে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া ঠাকুরের শয্যায় উঠিত, তারপর পরমানন্দে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উভয়ে শুইয়া থাকিত। নিজেদের দেহের শীতল স্পর্শ দিয়া ঠাকুরকে আরাম দেওয়াই ছিল তাহাদের অভিপ্রায়।

কৈবল্যধামের মোহান্ত মহারাজ, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণও বড় বিস্ময়কর। সে-বার ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি কাশীধামে আসিয়াছেন। অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া গুরুদেবের নিভৃত নিবাসের সন্ধান পাইলেন। ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "সম্মুখেই একখানা ঘর। খোলা দরজার নিকটে যাইতেই দেখিলেন যে, ঠাকুর বসিয়া রহিয়াছেন এবং প্রকাণ্ড একটা সাপ ঠাকুরের সারা অঙ্গ জড়াইয়া তাঁহার ঘরের উপর মাথাটি রাখিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে।

শ্যামদাকে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'আপনে এখানে কেন? শীগ্‌গির চলিয়া যান।' উত্তরে শ্যামদা বলিলেন যে, ঠাকুরের খোঁজেই তিনি আসিয়াছেন এবং তখনই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একবার ঐ সাপের কথাটা জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলেন না। তাহাতে ঠাকুর বলিলেন যে, তাঁহার জ্বর হইয়াছে এবং নিকটে কেহই নাই দেখিয়া এই সাপটি আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। এই কথার পর শ্যামদা আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, দরজা হইতেই ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।"

জীবপ্রেমিক, ভক্তবৎসল রামঠাকুর তাঁহার জীবন ও বাণীতে দিনের পর দিন ছড়াইয়া গিয়াছেন আদর্শ ও সাধনতত্ত্বের বহুতর মূল্যবান নির্দ্দেশ। অজস্র উপদেশ, চিঠিপত্র ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের দিনলিপিতে এগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুক্তিকামী যে কোন মানুষের জীবনে এই বাণী পরম কল্যাণ বহন করিয়া আনে।

ঠাকুর বলিয়াছেন—অকর্ত্তাবুদ্ধিই স্বভাব, কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিই অভাব। এই স্বভাবে পৌঁছিতে হইলে মুমুক্ষুকে সঙ্গে নিতে হইবে নাম। পন্থা হইবে অনন্যশরণ, আর ধর্ম্ম হইবে ধৈর্য্য।

আরও তিনি বলিতেন—ভগবান সর্ব্বজ্ঞ, সমভাব, নিরপেক্ষ শক্তি। কাজেই জীব তাঁহার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি বা অহংভাব না ছাড়িলে এই নিরপেক্ষ শক্তি লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে না।

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ-কৃত ঠাকুরের বাণী সঙ্কলনে জীবের সাধনা ও প্রারব্ধভোগের অপূর্ব্ব দিগ্‌দর্শন রহিয়াছে।*

ঠাকুর বলিতেছেন—'প্রারব্ধের ভোগ কাটে কিনা ইহাই অনেকের প্রশ্ন। ইহার উত্তর এই—কাটানো যায়, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বাস্তবিক পক্ষে ঐ ভোগ কাটে না—একমাত্র ভোগের দ্বারা উহার নিবৃত্তি হয়।

* দ্রঃ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ —(পরিচ্ছেদ : রামঠাকুরের কথা)। ঠাকুরের মুখে নানা নিগূঢ় তত্ত্ব প্রসঙ্গ

যোগবলে অথবা অন্য উপায়ে উহাকে সরাইয়া ফেলা যায়, ইহা সত্য কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, এই দেহ অনিত্য বলিয়া কোন না কোন সময়ে উহার ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। দেহত্যাগ হইলেই ঐ শূন্যস্থিত বিতাড়িত কর্ম্মগুলি আকর্ষণ বলে আবার আত্মাকে দেহ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে। তবে সে দেহে আর নূতন কর্ম্ম হইবে না, ইহা সত্য। জীব যখন সংসারে আসে তখন স্বীকারপত্র দিয়া আসে। তাই তাহাকে নিজের প্রাপ্য ভোগ করিতেই হয়। যে তাঁহার শরণাগত তাহাকে তিনি ঐ দেহেই সমস্ত ভোগ করাইয়া নেন, পরে কাছে লইয়া যান, আর তাহাকে আসিতে দেন না। তাহার কোন ভোগ বাকী থাকে না। ধৈর্য্যের সহিত প্রারব্ধ ভোগ করা উচিত, বাধা দিতে নাই। বাধা দিলে ভোগ কাটে না। একমাত্র অনুগত হইলে প্রারব্ধ কাটিতে পারে —প্রারব্ধ কাটিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই।'

অনন্যশরণ ও প্রারব্ধ বেগ সহ্য করা সম্পর্কে একটি পত্রে ঠাকুর লিখিতেছেন, "ঐহিক সুখের জন্য, ক্ষণভঙ্গুর পিপাসার তৃপ্তির জন্য অধৈর্য্যের বেগে মুগ্ধ হইয়া পবিত্র সতী সীতাদেবী পূর্ণলক্ষ্মী রাবণের কবলগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহার দৌরাত্ম্য প্রলোভন শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র ধৈর্য্যই সহায় হইয়াছিল। তাছাড়া অন্য কোন শক্তিতে তাহাকে রাক্ষসীর কবল হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। তাহার প্রমাণ জটায়ু পাখী, সীতার পক্ষযুত হইয়াও পাখা ছেদে জবাই হইয়াছিল। অতএব সর্ব্বদা মনের বেগ, বুদ্ধির বেগ এবং শরীরস্থ কামনা বাসনা গুণের চঞ্চলভুক্ত বেগ সমস্ত সহ্য করিতে চেষ্টা করিবে। এই সকল বেগ সহ্য করিতে করিতে রাম আসিয়া যেমন সীতাকে সমুদ্র বন্ধন করিয়া সীতার প্রকাশ বাধকমুক্ত করিয়া সদানন্দ-পদ সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেইরূপ নিজ পতি ও গুণ প্রবুদ্ধ

শুনিয়া মনীষী কবিরাজ মহাশয় এগুলির একটি সংগ্রহ রাখেন। হিমাদ্রি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার পর সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত সুবিখ্যাত গ্রন্থে এই গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ বাণীগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ভবসাগর বন্ধন করিয়া উদ্ধার করিবেন, সন্দেহ নাই।"

—(বেদবাণী, ১ম খণ্ড)

গুরুতত্ত্ব ও বীজদীক্ষা সম্বন্ধে রামঠাকুর যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের সাধকদেরই তাহা অনুধাবনযোগ্য :

—দীক্ষার কাল আছে। নারী রজস্বলা হইলে যেমন পতিসঙ্গ আবশ্যক, তেমনি শিষ্যের ভিতরকার প্রকৃতি যতক্ষণ রজস্বলা না হয়, ততক্ষণ গুরু তাহাতে বীজ বপন করেন না। এই বীজ হইতে সৃষ্টি হয়।

—বীজের সঙ্গে বস্তুতঃ গুরুই জন্মগ্রহণ করেন। তাই ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

—গুরু যে বীজ দেন সেই বীজের সঙ্গে বাস করিতে হয়। উহার সঙ্গে ঘরকন্না করিতে হয়, উহাকে ভালবাসিতে হয়।

—গুরু নৌকাটিকে ঠেলা দিয়া দেন। পরে শিষ্যকে দাঁড় টানিতে হয়। নতুবা শুধু গুরুর ঠেলাতে চলিতে হইলে শিষ্যের অত্যন্ত কষ্ট হয়, কারণ সে সামলাইতে পারে না। নিজে দাঁড় টানিতে হয় শুধু বেগ সামলাইবার জন্য। গুরু তো সবটা দিয়া রাখিয়াছেন, প্রয়োজন অনুসারে শিষ্য সবটাই প্রাপ্ত হয়।

—বাহির হইতে শক্তি সঞ্চার করায় বিশেষ কিছু লাভ হয় না। সাময়িক একটা উল্লাস আসে মাত্র। পরে অধিক ধাক্কা লাগে। তখন প্রথমে যেখানে ছিল তাহা হইতে অধিক নিম্নে পড়িয়া যায়। ইহাতে সাধকের বহু কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্তু নিজ হইতে যাহার বিকাশ হয়, তাহা শনৈঃ শনৈঃ হইলে খুব ভাল হয়।

(সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ—ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ)

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও যোগসিদ্ধির বর্ণনা করিতে গিয়া ঠাকুর তাঁহার অপরূপ ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীতে বলিতেছেন :

—কুণ্ডলিনী কি? কুণ্ডস্থিত বা কুণ্ডাশ্রিত শক্তি। কুণ্ড মানে আধার। শক্তি যখন আধারে আছে বা অবলম্বন ধরিয়া আছে, তখন

উহা কুণ্ডলিনী। ইহা শক্তির সুপ্ত অবস্থা। যখন শক্তি শিবকে বা শূন্যকে অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ, নিরাশ্রয় বা নিরালম্ব হইবে তখনই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দ্বিদলের উপরে শূন্য বা নিরালম্ব, ওখানে আর আশ্রয় নাই—'নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।' দ্বিদল মানে দুই পক্ষ, উহাই কেন্দ্র,—ওখান হইতে দুই দিকেই যাওয়া যায়—উপরে অব্যক্ত, নিম্নে দৃশ্য।

—ষট্‌চক্র মানে ষড়যন্ত্র, কারণচক্রই যন্ত্র। ইহারাই চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমরা যদি অবলম্বন-শূন্য হই, অর্থাৎ, শূন্যকে আশ্রয় করি তাহা হইলে ইহারা কিছুই করিত না। বুঝিতে হইবে তখনই ষট্‌চক্র ভেদ হইয়া গেল।

(সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ—ঐ)

জীবের কল্যাণে, বিশেষ করিয়া ভক্ত, সাধনকামী গৃহস্থের কল্যাণে শেষের দিকে ঠাকুর জোর দেন, নামমন্ত্রের উপর। কলিহত মানুষের দ্বারে দ্বারে এই নামসুধাই তিনি অকৃপণ-করে বিতরণ করিয়া যান।

একবার এক নামপ্রাপ্ত ভক্ত প্রশ্ন করেন, "কোন অনুষ্ঠান আড়ম্বর নেই, নিভৃতে কর্ণমূলে মন্ত্র দেওয়া নেই—উচ্চ কণ্ঠে আপনি নাম দিচ্ছেন এ কি রকমের সাধন-দান, ঠাকুর ?"

ঠাকুর উত্তর দেন, "অনুষ্ঠান তো ঠিকই হচ্ছে এখানে। অণু মানে সূক্ষ্মতম বস্তু। নামই তো সেই পরম বস্তু, কারণ নাম আর নামী যে অভিন্ন। সেই অণুর স্থানই তো এখানে নামপ্রাপ্ত ভক্তের হৃদয়ে তৈরী হয়ে যাচ্ছে। এই তো আসল অনুষ্ঠান। আর কানে মন্ত্র দেবার কথা বলছেন ? মন্ত্র জপ হয় প্রাণে, মন্ত্র প্রায়ও প্রাণে।"

নূতন নামপ্রাপ্ত এক ভক্ত সে-বার বলেন, "ঠাকুর, কৃপা করে আপনি নাম দিয়েছেন, তা জপও করছি। কিন্তু তেমন ভালো লাগছে না, আনন্দ পাচ্ছিনে।"

"তবুও নাম করে যাবেন। দ্যাখেন নি, শুকনো হাড়গুলো নিয়ে

কুকুর কেমন কামড়াতে থাকে ? প্রথমটায় কষ্টই হয়। মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে। তবুও সে ক্ষান্ত হয় না। যখন হাড়ে ভাঙন শুরু হয়, তখন পায় রস—আনন্দ। নামের ভেতর রয়েছে অক্ষয় সুধা, কষ্ট করেই তাকে বার করতে হবে।”

নামের তাৎপর্য্য এক চিঠিতে তিনি বুঝাইয়াছেন,—“ভগবানের সেবা-পরিচর্য্যাই ধৈর্য্য ধরিয়া নামের নিকট সর্ব্বদা থাকা। যেই নাম সেই ভগবান। যদি নামই ভগবান হইল, তবে যেখানে নাম হয় সেইখানকেই বৃন্দাবন বলিতে হয়। ব্রজবাসীর কোন কর্ম্মে বেদবিধির প্রয়োজন হয় না। ভ্রমবশতঃ কর্ত্তা হইয়া, ভগবানকে ছাড়িয়া অপূর্ণ কামের দ্বারা আবৃত হইয়া নানা উপাধির সৃষ্টি করিয়া শান্তি ও অশান্তির যোগে পড়িয়া সুখী দুঃখী হয়। অতএব সর্ব্বদা নামের আশ্রয় নিয়া সকল কার্য্য যথাসম্ভব করিয়া যাইবেন, মন স্থির হউক আর চঞ্চল হউক। সুখী না হইলেও নাম করিতে ভুলিবেন না।”

নাম ও প্রাণতত্ত্বের অপূর্ব্ব সমাহার সাধন করিয়া ঠাকুর তাঁহার আর এক পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, “প্রাণ, অর্থাৎ, যাহা শ্বাস-প্রশ্বাস চলিয়া থাকে, ইহাই ভগবান। ইহাকেই স্থির করিয়া যতটুকু সময় রাখা যায়, ততটুকু সময়ে ভগবানের নাম করা হয় এবং ইহা স্থির অবস্থায় নিবার জন্য মনের যে বেগ, তাহারই নাম মন্ত্র। যখন এই প্রাণেতে স্থিরবুদ্ধি অর্থাৎ প্রাণ স্থির বোধ হইবে, তাহাকে স্থির আত্মা বলিয়া জানিবেন। অতএব যত সময় পারেন, ঐ প্রাণের স্থির করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন, এই অনুষ্ঠানের নামই নাম করা, অর্থাৎ এই স্থিরের অধীন থাকার নামকে ‘নাম’ বলে। এই স্থির অবস্থায় ভগবান (অভাবশূন্য) জ্ঞান জানিবেন।”

ভক্তদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্ম্মনিষ্ঠায় চাটগাঁর কৈবল্যধাম, ডিঙামাণিক ও অন্যান্য স্থানের আশ্রমসমূহ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। কিন্তু রামঠাকুর এইসব আশ্রমে কখনো স্থির হইয়া অবস্থান করেন

নাই। শেষ জীবনের ছয় বৎসর প্রধানতঃ তিনি চৌমহনীতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, শুধু মাঝে মাঝে ভক্তদের অন্তরের আহ্বানে কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন শহরে তাঁহাকে আসিতে দেখা যাইত।

তিরোধানের কিছুকাল আগে হইতেই মহাশক্তিধর ঠাকুরের অধ্যাত্মজীবনে ফুটিয়া উঠে এক করুণাঘন রূপ। ঐশী কৃপার পূর্ণ কুম্ভটি যেন ভক্ত নরনারীর শিরে এবার উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেন। এ সময়ে লক্ষাধিক নরনারী তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নাম লাভ করিয়া ধন্য হয়।

লীলা সম্বরণের পূর্ব্ব দিন চৌমহনীর বাংলোতে ঠাকুর বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরেই শয়ন করিতে যাইবেন। এসময়ে, কি জানি কেন, একনিষ্ঠ সেবকভক্ত উপেন্দ্রকুমার ও নরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, "কাল শেষ রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখলাম। চন্দ্রলোক থেকে একটা রথ ধীরে ধীরে নেমে এলো, আর আমি তাতে উঠে বসলাম।"

অতঃপর ভক্তদ্বয়ের শিরে হাত রাখিয়া জানাইলেন আশীর্ব্বাদ। সস্নেহে চিবুক ধরিয়া বারবার আদরও করিলেন। এমন কৃপা ও স্নেহের প্রকাশ মাঝে মাঝেই দেখা যায়, তাই আজিকার এই আচরণকে কেহ অস্বাভাবিক মনে করিলেন না। যথাসময়ে ঠাকুর শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন ভোরবেলায় উদ্‌ঘাটিত হইল এক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য। ঠাকুর নিজ শয্যার উপর উলঙ্গ অবস্থায় শায়িত। কৌপীন, বহির্ব্বাস ও আঙ্‌রাখা ভূমিতলে পড়িয়া আছে। গলার কণ্ঠিমালাটি ছিন্ন হইয়া লুটাইতেছে ধূলির উপর। মহামুক্ত পুরুষ এবার মরদেহরূপ আবরণটি ত্যাগ করার জন্য প্রতীক্ষমাণ, বিদায়ের আগে তাই দেহের সামান্যতম আবরণটুকুও আর ধরিয়া রাখিতে চাহেন নাই।

সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া বেলা ১-৩০ মিনিটে ঠাকুর চিরতরে নয়ন নিমীলিত করিলেন। মহা ব্রহ্মজ্ঞ সাধক মিশিয়া গেলেন ব্রহ্মজ্যোতির নিস্তরঙ্গ মহাপারাবারে।

১৩৫৬ সন,—(ইং ১৯৪৯) ১৮ই বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়ার এই তিথিটির স্মৃতি আজো অগণিত ভক্তের নয়ন ছাপাইয়া অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দেয়।